প্রকাশক—
যোগিরাজ পাবলিকেশন
'উষালোক'
২৬/এ/১, শশীভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন
কলিকাতা - ৭০০০৩৬

দ্বিতীয় সংস্করণ—১লা জানুয়ারী, ১৯৬০

মুদ্রাকর—
রয়েল হাফটোন কোং
৪. সরকার বাই লেন
কলিকাতা—৭০০ ০০৭

তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

॥ যোগিরাজ বন্দনা ॥

তুমি নির্লিপ্ত নিরঞ্জন অব্যক্ত কারণ
সত্য জ্ঞানঘন যোগানন্দময়।
তুমি চন্দ্রশেখর বিষ্ণু গদাধর
ব্রহ্ম সনাতন ত্রিভুবনময় ॥
তুমি শ্যামাচরণ পতিত পাবন
ক্রিয়াযোগী কুলগুরু করুণাময়।
সদাই বিষয় স্ফূর্তি না ভাবি তোমার মূর্তি
তবু আমা প্রতি হইলে সদয় ॥
আমা সম গৃহিজনে বৈরাগ্য বিবেক হীনে
তুমি দেব, নিজগুণে করিলে যোগিন্।
তব কৃপা দৃষ্টিপাতে সর্বদায় প্রভাতে
যোগানন্দে মগ্ন করে রাখো নিশিদিন ॥
তুমিই মঙ্গলকামী তুমিই অন্তর্যামী
ক্রিয়াবান কুলগুরু করুণাময়।
তুমি নির্লিপ্ত নিরঞ্জন অব্যক্ত কারণ
সত্য জ্ঞানঘন যোগানন্দময় ॥

শ্যামাচরণ ক্রিয়াযোগ ও অদ্বৈতবাদ

ক্রিয়াব দ্বারায় চক্ষু উন্মিলন হয়—তাহাতেই বলিয়াছে—

চক্ষু উন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১ ॥

প্রত্যেক মানব দেহে যে দুটি চোখ আছে সেই চোখের দ্বারায জাগতিক সবকিছু দেখা যায় অর্থাৎ স্থূল জগতের সবকিছু পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই স্থূল জগতের অতীতে যে সূক্ষ্ম জগৎ বা অধ্যাত্ম জগৎ বর্তমান তা দেখা যায় না। কারণ এই দুই চোখও ইন্দ্রিয়। গীতাতে ভগবান্ বলেছেন কোন ইন্দ্রিয়ের সাধ্য নেই আমার কাছে পৌঁছতে পারে। চোখ, কান, নাক, মুখ ইত্যাদি এরা সবাই ইন্দ্রিয়। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যা কিছু দেখা শোনা বলা সবই ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান। তাই চক্ষুরূপী ইন্দ্রিয় সেই স্থির মহাকাশরূপ ব্রহ্মস্বরূপে পৌঁছাতে পারে না। যোগিরাজ বলেছেন ক্রিয়ার দ্বারা চক্ষু উন্মীলন হয়। তা এটা কোন চোখ? চোখ ত সকলেরই আছে এবং সে চোখ সকলের খোলাও আছে, সকলে দেখতেও পায়। অতএব এই দুই চোখেব কথা যোগিরাজ নিশ্চয়ই বলেননি। এই দুই চোখের অতীতে আরও এক চোখ আছে যাকে জ্ঞানচক্ষু, তৃতীয় নয়ন বা কূটস্থ বলে। সেই জ্ঞানচক্ষুরূপী কূটস্থ যাতে উন্মীলন হয় তার কথাই যোগিরাজ বলেছেন। এই কূটস্থরূপী চক্ষু সব মানবদেহেই আছে কিন্তু যোগী ব্যতীত অপরে এর সন্ধান জানে না। তাই তাদেব জ্ঞান চক্ষু থেকেও নেই বলা চলে। সদ্‌গুরু বা যোগীগুরুর আজ্ঞামতে প্রাণকর্মরূপ আত্মসাধনে রত হলে মানুষের সেই জ্ঞানচক্ষুর প্রকাশ হয়, তখন ইন্দ্রিয়-রূপী চক্ষুদ্বয় অর্ধনিমীলিত অবস্থায় থাকায় বাইরের কোন কিছুই দেখে না। বাইরের সবকিছুর থেকে মন অন্তর্হিত হয়ে এক অদ্বিতীয় জ্ঞানচক্ষুতে নিবদ্ধ থাকায় অন্তরতম প্রদেশের বা অধ্যাত্ম জগতের সবকিছু দেখা যায় অর্থাৎ ক্রিয়া করলে কূটস্থরূপী চক্ষুর উন্মিলন হয়। যে সদ্‌গুরু এই কূটস্থরূপী চক্ষুর হদিস দেন তেমন গুরুকেই নমস্কার।

এই দুই চোখের দ্বারা জগতের বস্তুকে দেখা যায়। এই দুই চোখ ইন্দ্রিয়, বস্তু, গুণ এবং অণুর অন্তর্গত হওয়ায় জগতের ~~বস্তু~~ দেখা যায়। কারণ জগতের বস্তুও গুণ, বস্তু এবং অণুর অন্তর্গত। যখন চোখের অণু বস্তুর অণুর সন্নিকর্ষ হয় তখনই দেখা যায়। সন্নিকর্ষ হওয়ায় সাথে সাথে সেই বস্তুর রূপ গুণ ইত্যাদি বিষয় চক্ষুরূপী ইন্দ্রিয়গোচর

হয়। কিন্তু ব্রহ্ম বস্তু, গুণ এবং অণু না হওয়ায় চক্ষুইন্দ্রিয়ের গোচর হয় না অর্থাৎ দেখা যায় না। চোখ ছাড়া যখন কিছুই দেখা যায় না, তখন ব্রহ্মও দেখা যাবে না। আবার এই চোখের দ্বারা যখন দেখা সম্ভব নয় তখন সেটা কোন চোখ? এই চোখ হল একচোখ, জ্ঞানচোখ, ত্রিনয়ন, কূটস্থ ইত্যাদি। এই কূটস্থ সব দেহে থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মদর্শন হয় না কেন? কারণ কূটস্থে স্থিতির অভাব। জীব যখন কূটস্থে স্থিতি লাভ করে তখন অবশ্যই ব্রহ্ম দর্শন হয়। জীব কূটস্থে স্থিতিলাভ করা মাত্রই সে তখন বস্তু, গুণ ও অণুর অতীতে অবস্থান করায় বস্তু গুণ ও অণুর অতীতে যে ব্রহ্ম তার সন্নিকর্ষ হয় এবং তখনই ব্রহ্ম দর্শন হয়। একারণে সকলের উচিত সদ্‌গুরু-পদিষ্ট আত্মসাধনের মাধ্যমে কূটস্থে স্থায়ী স্থিতিলাভ করা। তাই যোগিরাজ বলেছেন ক্রিয়ার দ্বারায় এই কূটস্থরূপী চক্ষুর উন্মীলন হয় অর্থাৎ ক্রিয়া সাধন করলে এই কূটস্থরূপী জ্ঞান চক্ষুর প্রকাশ হয়। যখন যোগী এই জ্ঞানচক্ষে স্থিতিলাভে সমর্থ হন তখন তিনি যেমন ব্রহ্ম দর্শনে সমর্থ হন, তেমনি ওই জ্ঞান চক্ষুর মাধ্যমে জগতের সকল বস্তু তা সে যত ক্ষুদ্রই হোক বা যত দূরেরই হোক সবকিছু দেখতে সমর্থ হন। তার আর অদেখা কিছু থাকে না। তাই কূটস্থই হল অনাদি চোখ।

"ভুলোনা ভুলোনা তারে সে ঘন সৃষ্টি সংহারে, সর্ব্বদা আছে সন্মুখে
দেখোনা দেখোনা তারে। সদা স্মরণ কর ওঁকারের তারে" ॥ ২ ॥

সেই কূটস্থরূপী চোখ সকল দেহে থাকা সত্ত্বেও যোগী ব্যতীত কয়জন তার খবর রাখে? কয়জনই বা এই জ্ঞানচক্ষুর মাধ্যমে সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম জগতকে জানতে চায়? বরং এর বিপরীতই দেখা যায়। যোগিরাজ সকল মানুষকে বিনয়ের সঙ্গে বলছেন সেই কূটস্থ যিনি সৃষ্টি হতে সংহার পর্যন্ত সকল অবস্থাতেই ঘনকৃষ্ণবর্ণরূপে বর্তমান তাঁকে কখনো ভুলো না। সেই কূটস্থ সর্বদা সকলের সম্মুখে আছেন, তাঁকে নয়নভরে দেখো এবং দেখতে দেখতে কূটস্থরূপী চৈতন্যে একীভূত হও এবং ওঁকার ক্রিয়ার মাধ্যমে সর্বদা তাঁতেই লেগে থাক। তাহলে এই দৃশ্যমান জগতের অতীতে এবং দেহবোধের অতীতে পৌঁছে গিয়ে স্থির মহাকাশরূপ অত্যন্ত চৈতন্যে স্থিতিলাভ করতে পারবে। তাই পুনরায় যোগিরাজ বলছেন—"এই শরীরে যে কূটস্থ আছেন তাঁহাকে যে গুরুর উপদেশে না দেখে সে অন্ধ।"

'খেচরী করনে সে ইন্দ্রিয় দমন হোতা হ্যায়' ॥ ৩ ॥

খেচর অর্থে আকাশ। আকাশে গমন করলে অর্থাৎ আকাশে অবস্থান করলে নিরালম্বে স্থিতি হয়। তখন নিরালম্বে অবস্থান করায় স্থূল ইন্দ্রিয়সঙ্গ রহিত হয়। কিন্তু শাস্ত্র বলেছেন—কপাল কুহরে জিহ্বা প্রবিষ্টা বিপরীতগা

ভ্রুবো অন্তর্গতা দৃষ্টি মুদ্রাভবতি খেচরী।

—ঘেরণ্ড সংহিতা ২৭ এবং 'কাশীখণ্ড'।

অর্থাৎ মুখের ভেতরে জিহ্বা বর্তমানে যে অবস্থায় আছে তাকে বিপরীত গতি করে অর্থাৎ ঊর্ধ্বে গমন করিয়ে কপাল কুহরে রেখে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে কূটস্থে দৃষ্টি স্থির করলে তাকেই খেচরী মুদ্রা বলে। যোগিরাজ বলছেন এই প্রকারে খেচরীমুদ্রা করলে ইন্দ্রিয়দমন হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দের কর্ম থেমে যায়, আর স্থূল বস্তুর দিকে না গিয়ে, এটা চাই ওটা চাইরূপ গতি রহিত হয়। অর্থাৎ প্রকারান্তরে ইন্দ্রিয়রহিত হওয়ায় মহাশূন্যে স্থিতি হয়। এই অবস্থাকেই খেচরিসিদ্ধি বলে।

ইন্দ্রিয়গণ কতক্ষণ কর্মরত থাকে? যতক্ষণ শ্বাসের গতি বহির্মুখী। প্রাণ চঞ্চল বলেই শ্বাসের গতি বহির্মুখী। যতক্ষণ প্রাণ চঞ্চল থাকবে ততক্ষণ মনও চঞ্চল থাকবে। যতক্ষণ মন চঞ্চল থাকবে ততক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, চিত্ত, অহংকার, বুদ্ধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, আলস্য, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, চিন্তা-ভাবনা, আসক্তি, প্রেম, ভালবাসা; অহংভাব, পরশ্রীকাতরতা, দেহবোধ ইত্যাদি সবই থাকবে। কিন্তু এই প্রকারে জিহ্বাকে তালুকুহরে রাখতে পারলে শ্বাসের গতি বহুলাংশে কমে যায়। তারপর যতটুকু গতি থাকে প্রাণকর্মের দ্বারা তাও রহিত হয়। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ কর্মহীন হওয়ায় যোগীর মহাশূন্যে স্থিতিলাভ হয়। জন্মগ্রহণের সাথে সাথে জিভের বিচ্যুতি ঘটে, প্রাণ চঞ্চল হয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস চালু হয়। যতক্ষণ প্রাণ চঞ্চল থাকবে ততক্ষণ শ্বাসপ্রশ্বাসও চালু থাকবে জীবও জীবিত থাকবে এবং যতক্ষণ শ্বাসপ্রশ্বাস চালু থাকবে ততক্ষণ উপরিউক্ত ইন্দ্রিয়গুলিও কর্মক্ষম থাকবে। আবার জিহ্বা তালুকুহরে রেখে যতই প্রাণকর্ম করবে ততই প্রাণ স্থিরত্বের দিকে অগ্রসর হবে। এইভাবে যতই স্থিরত্বের দিকে অগ্রসর হবে ততই ইন্দ্রিয়গুলি কর্মহীন হবে। শেষে যখন প্রাণ সম্পূর্ণরূপে স্থির হবে অর্থাৎ স্পন্দনরহিত হবে তখন ইন্দ্রিয়গণও সম্পূর্ণ কর্মরহিত হবে। তখন ইন্দ্রিয়গণ থাকবে বটে কিন্তু তাদের কর্মরহিত হওয়ায় নিষ্কর্ম হবে। একেই বলা হয় ইন্দ্রিয়দের দমন অবস্থা। যোগী এইপ্রকারে ইন্দ্রিয়দের দমন করে অর্থাৎ কর্মহীন অবস্থায় রেখে নিজের অধীনে রাখেন এবং সব কর্ম করেন। তিনি কখনই ইন্দ্রিয়দের অধীনে থাকেন না। তবে

যোগী প্রয়োজন বোধে পুনরায় ইন্দ্রিয়দের কর্মক্ষম ও কর্মহীন উভয় অবস্থাতেই প্রয়োগ করতে সক্ষম হন। তাই যোগী ইন্দ্রিয়ভয়ে কোনো কিছু থেকে পলায়ন করেন না, কারণ ইন্দ্রিয় তাঁর অধীনে থাকে। প্রয়োজন বোধে ইন্দ্রিয়দের ব্যবহার করেন আবার করেন না। ইন্দ্রিয়দের ওপর যোগীর এমনই দক্ষতা জন্মায়। কারণ স্থির প্রাণে কোনো তরঙ্গ, বৃত্তি বা দেহবোধ থাকে না। চঞ্চলতার অবসানে পঞ্চভৌতিক এই দেহ তখনই প্রকৃত শুদ্ধ হয়। একেই ভূতশুদ্ধি বলে। তাই মৃতের কোনো জাত থাকে না অর্থাৎ মৃতদেহে কোনো প্রকার ইন্দ্রিয় কর্ম থাকে না। মন স্বয়ং ইন্দ্রিয়। প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা এ সবই মনোধর্ম। এ সবই নির্ভর করে দেহে প্রাণের চঞ্চল অবস্থার অস্তিত্বের ওপর। প্রাণহীন দেহে প্রেম ভালবাসা কিছুই নেই। এই প্রকারে প্রাণকর্ম করতে থাকলে সকল প্রকার ইন্দ্রিয় দমন হয়ে আসক্তিশূন্য অবস্থা আসবে, তখন বিষয়, কামিনী, কাঞ্চন এবং সংসার সবই থাকবে অথচ কিছুই বাধাস্বরূপ হবে না। শাস্ত্র আরও বলেছেন—

ভ্রুবোরন্তর্গতাং দৃষ্টিং বিধায় সুদৃঢ়াং সুধীঃ।
উপবিশ্যাসনে বজ্রে নানোপদ্রব বর্জ্জিতঃ॥
লম্বিকোর্দ্ধস্থিতে গর্ত্তে রসানাং বিপরীতগাম্।
সংযোজয়েৎ প্রযত্নেন সুধাকূপে বিচক্ষণঃ॥
মুদ্রৈষা খেচরী প্রোক্তা ভক্তানামনুরোধতঃ।
সিদ্ধীনাং জননী হ্যেষা মম প্রাণাধিকাধিকে॥
নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ পীযূষং প্রত্যহং পিবেৎ।
তেন বিগ্রহসিদ্ধিং স্যাৎ মৃত্যুমাতঙ্গ কেশরী॥—শিবসংহিতা ৫১—৫৪

যোগী উপদ্রবহীন জায়গায় বজ্রাসনে বসে ভ্রুবোরন্তর্গতে (কূটস্থে) দৃঢ়রূপে দৃষ্টি স্থাপন করে রসনা (জিহ্বা) বিপরীতগামী করে আলজিহ্বার উপরিস্থ গর্ত্তে পরিচালন করে সযত্নে কূটস্থরূপী অমৃতকূপে সংযোজিত করবে। এই খেচরীমুদ্রা সিদ্ধিলাভের পক্ষে জননীস্বরূপা। ভক্তগণের অনুরোধে প্রকাশ করলাম। শিব আরও বলেছেন—হে প্রাণবল্লভে; এই খেচরীমুদ্রা মহতী সিদ্ধির কারণ। খেচরীমুদ্রা নিরন্তর অভ্যাস করলে প্রতিদিন সুধাপান করতে সমর্থ হয় এবং শরীর সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় অর্থাৎ জরা মৃত্যু রহিত হয়। এই মুদ্রা মৃত্যুরূপ যে মাতঙ্গ তাহার পক্ষে কেশরীস্বরূপ। এই খেচরীমুদ্রার ফল বলতে গিয়ে শিবসংহিতা আরও বলেছেন—

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
খেচরী যস্য শুদ্ধা তু স শুদ্ধো নাত্র সংশয়ঃ॥—শিবসংহিতা—৫৫

অর্থাৎ যোগী পবিত্র অথবা অপবিত্র যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, খেচরীমুদ্রা সাধন করলে সর্ব-অবস্থাতেই শুদ্ধ থাকবেন এতে কোন সংশয় নেই। পবিত্র-অপবিত্র মনের ধর্ম। মন চঞ্চল বলেই পবিত্র-অপবিত্র বোধ হয়। কিন্তু খেচরী অবস্থায় থেকে অধিক এবং উত্তমপ্রকারে প্রাণকর্ম করতে থাকলে আপনা হতেই যখন প্রাণ স্থির হয়ে যায় তখন স্বতঃই শূন্যে স্থিতি হয়। এই প্রকারে শূন্যে মনের স্থিতি হলে মন নিরুদ্ধ হয় ও মনশূন্য অবস্থা হয়। এই মনশূন্য অবস্থায় মনের চাঞ্চল্য না থাকায় আর মনের কর্ম থাকে না, মনের দৌড় ঝাঁপ চলে যায়। তাই শাস্ত্র বলেছেন—

করোতি রসনাং যোগী প্রবিষ্টাং বিপরীতগাম্।
লোম্বিকোর্দ্ধেষু গর্ত্তেষু কৃত্বা ধ্যানং ভয়াপহম্॥—শিবসংহিতা। ১৫৩

অর্থাৎ যে যোগী জিহ্বা বিপরীতগামী করে আল্‌জিহ্বা ঊর্ধ্বস্থিত রন্ধ্রে প্রবেশ করেন এবং সেই অবস্থায় জিহ্বা স্থির রেখে কূটস্থে ধ্যান করতে থাকেন তিনি জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি সমস্ত ভয় হতে পরিত্রাণ পান। যোগিরাজ এই খেচরীমুদ্রার উপকারিতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আরো পরিষ্কার ভাবে বলেছেন—"জিহ্বা উঠনেসে ইন্দ্রিয় দমন হোতা হয়।" এই বিষয়ে শাস্ত্রও বলেছেন—

গুরূপদেশতো মুদ্রাং যো বেত্তি খেচরীমিমাম্।
নানাপাপরতো ধীমান স যাতি পরমাং গতিম্॥—শিবসংহিতা। ৫৮

অর্থাৎ যে সাধক গুরুপদেশে এই খেচরীমুদ্রা জ্ঞাত হয়েছেন, তিনি যদিও মহাপাপে পাপী হন, তথাপি শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করতে পারেন। অতএব গুরুর কর্তব্য শিষ্যকে এই বিদ্যা অবশ্যই দান করা এবং শিষ্যেরও কর্তব্য গুরুর নিকট হতে এই বিদ্যা লাভ করা। অধ্যাত্মমার্গে প্রবেশ করিতে হলে খেচরীমুদ্রা সাধন অবশ্য কর্তব্য। এই খেচরীমুদ্রা সাধনকে বলা হয় জিহ্বাগ্রন্থি ভেদ বা ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ যা ক্রিয়াযোগের প্রথম ক্রিয়াতেই বলা হয়েছে। অতএব গুরুগণ যদি সাধককে এই বিদ্যার পথ না দেখান এবং সাধকও যদি গুরুর নিকট হতে কেমন করে খেচরীমুদ্রা সাধন করতে হয় তা যদি জ্ঞাত না হন তবে তাতে না হয় গুরুর উপকার, না হয় শিষ্যের উপকার ; কারণ এই বিদ্যা ব্যতিরেকে শিষ্য কখনই আত্মরাজ্যে সঠিকভাবে প্রবেশলাভ করতে পারে না। তাই এই বিদ্যালাভ সকল সাধকের অবশ্য কর্তব্য। খেচরীমুদ্রার মাধ্যমে অমৃতকূপ স্পর্শ করতে হলে জিহ্বা সুদীর্ঘ হওয়া আবশ্যক। এ কারণে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সাধক স্বীয় জিহ্বার নিম্নস্থিত শিরা কেটে ফেলেন। পরে ঘি বা মাখন দিয়ে জিহ্বা দোহন করেন এবং মাঝে মাঝে চিমটা বা সাঁড়াশি দ্বারা টেনে জিহ্বাকে লম্বা করার চেষ্টা করেন। যোগিরাজের মতে এই প্রকারে জিহ্বাকে লম্বা করা সম্পূর্ণরূপে অনুচিত। কারণ কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কেটে

ফেললে বা বলপ্রয়োগ করলে তার স্বাভাবিক ক্ষমতা নষ্ট হয়। তাই তিনি এক বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে যাতে সকল সাধক সহজেই খেচরী-মুদ্রা লাভ করতে পারেন তার উপায় দেখিয়েছেন। প্রকৃতির বিরুদ্ধে না গিয়ে সহজেই সকল সাধক যাতে খেচরীমুদ্রা লাভ করতে পারেন তার উপায় যোগিরাজ ব্যতীত আর কেউ দেখাতে পেরেছেন বলে জানা যায় না। এই খেচরীমুদ্রার মহান্ উপকারিতা সম্বন্ধে আরো বিশদভাবে হঠপ্রদীপিকা এবং ঘেরণ্ড সংহিতায় বিস্তারিত ভাবে বলা আছে। এই সকল যোগশাস্ত্রে বলা আছে খেচরীমুদ্রার প্রভাব এত অধিক যে, যদি যুবতী নারীও আলিঙ্গন করে, তথাপি খেচরীমুদ্রাসিদ্ধ সাধকের বিন্দুমাত্র রেতঃপাত হয় না। গো শব্দে জিহ্বা; তালুকুহরে জিহ্বাকে প্রবেশ করানোই গো মাংস ভক্ষণ। এই প্রকারে যিনি গো মাংস ভক্ষণ করেন অর্থাৎ জিহ্বাকে নিশ্চল অবস্থায় যিনি তালুকুহরে রেখে কূটস্থে ধ্যানে রত থাকেন সেই সাধকই অমৃত পান করেন। কারণ সহস্রার হতে ক্ষরিত যে অমৃত সুধা তা তিনিই পান করতে সমর্থ হন। এ বিষয়ে যোগিরাজ বলেছেন "গলেমে মিঠা রস উপরসে নিচে গিরতা নাকসে লহুগি গলেকে ভিতর সে খোকিকে সাত—ইসিকা নাম অমৃত—ইসিকো পিনেসে অমর হোতা হয়।"—জিহ্বা ওপরে উঠিয়ে, তালুরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়ে, ওই অবস্থায় জিহ্বাকে নিশ্চলভাবে রেখে প্রাণকর্ম করতে থাকলে গলমধ্যে যে মিষ্টরস অনুভব হয় অর্থাৎ সহস্রার থেকে যে অমৃতধারা নীচে নেমে আসে, যা গলা ও নাকের মধ্যদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাকেই অমৃত বলে। এই অমৃত সকলেরই ক্ষরিত হয় এবং এই অমৃত দ্বারাই সকলের দেহে পুষ্টিসাধন হয়। কিন্তু এই অমৃতের হদিস সাধারণ মানুষ জানে না। জিহ্বা তালুরন্ধ্রে প্রবেশ করে কূটস্থের কাছাকাছি অবস্থান করে যে সাধকের তিনিই এই অমৃতপানে সক্ষম হন। এই অমৃত পান করলে অমর হয়। অমর অর্থে চিরকাল জীবিত থাকা নয়। অমর অর্থে জন্ম-মৃত্যুরূপ প্রবাহের অতীতে চলে যাওয়া, যে অবস্থায় গেলে আর জন্ম হয় না অতএব জন্ম না হলে মৃত্যুও হয় না। যোগী তখন সমস্ত প্রকার চঞ্চলতার উর্ধ্বে অবস্থান করায় 'নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্চতে' এই অবস্থায় অবস্থান করতে সক্ষম হন। এরই নাম অমরত্ব প্রাপ্তি। দেবতাগণ সমুদ্র-মন্থনে এই অমৃতই পান করেছিলেন। দেবতাগণ অর্থে যে যোগী মহাশূন্যে স্থায়ী স্থিতিলাভ করেন তিনিই দেবতা। সমুদ্রমন্থন অর্থে ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীরের একদিকে সংসার বাসনারূপ গরল, যা যোগীকে আত্মানন্দে অবস্থান করতে দেয় না। প্রাণকর্মরূপ মন্থন ক্রিয়ার মাধ্যমে চঞ্চলতারূপ সংসার প্রবাহের এই গতিকে অতিক্রম করে স্থিরব্রহ্মে মহাশূন্যে অবস্থান করে সহস্রার হতে ক্ষরিত অমৃত পান। ক্রিয়াবান-গণই দেবতা কারণ ক্রিয়াবানই খেচরীসাধনের মাধ্যমে উত্তমক্রিয়া করে এই অমৃত

পান করে অমরত্ব লাভ করতে পারেন। এই অবস্থার কথা বলতে গিয়ে যোগিরাজ বলেছেন—"ভগবত স্নানে ভগকে মাফিক অর্থাৎ যব জিভ নাককে ভিতর তালুমূলমে যায়"—ভগবৎ যোগীর একটী অবস্থা মাত্র। ভগ শব্দের অর্থ যোনি। জিহ্বা যে তালুগর্তে প্রবেশ করে সেই তালুগর্তের আকৃতি যোনিসদৃশ। তাই যোগিরাজ বলছেন জিভ যখন নাসিকার উর্ধ্বে তালুমূলে ভগসম গর্তে প্রবেশ করিয়ে স্থায়ী স্থিতিলাভ করতে পারলে যে মহানন্দরূপী অবস্থার উদয় হয় সেই অবস্থাই ভগবৎ, যা ক্রিয়াবানেরা একটু চেষ্টা করলেই লাভ করতে পারেন। জিভ ওপরে উঠলেই কি এই অবস্থালাভ করা যায়? তা কখনই নয়। জিভকে আরো অধিক ওপরে ওঠাতে হবে। এ বিষয়ে বলতে গিয়ে যোগিরাজ আরো বলেছেন—"জিভ ডহিনে নাককে ছেদ মে ঘুষা ফির বাএ ছেদকে ভিতর এক অঙ্গুল—আব খিচনেসেভি সি এয়সা শব্দ আতা হয় আউর ফেকনেসে ভি।" —জিভ ওপরে উঠে ভেতরে ডানদিকের নাকের গর্তে প্রবেশ করল, পুনরায় বামদিকের নাকের গর্তে এক আঙুল প্রবেশ করল। এই অবস্থার প্রাণায়াম টানবার সময় ও ফেলবার সময় উভয় সময়েই শিঁ শব্দ নির্গত হতে লাগল। উত্তম প্রাণায়ামে এই প্রকার শিঁ শিঁ শব্দ নির্গত হয়। কিন্তু জিভকে আরো ওপরে তুলতে হবে, ভগরূপী গর্তে নিশ্চলরূপে অবস্থান করাতে হবে। সেকথা বলতে গিয়ে যোগিরাজ আরো বলেছেন—"জিভ দোনো নাককে ছেদকে উপর চলা আউর যো শূন্য বাহর সোই ভিতর দেখলাই দেতা হয়।"—জিভ আরো ওপরে উঠে উভয় নাসাপুট অতিক্রম করে ভগরূপী গর্তে প্রবেশ করল। এই অবস্থায় উত্তম প্রাণকর্ম করতে করতে স্বচ্ছ মহাশূন্য উদয় হল। এই মহাশূন্যই ব্রহ্ম। তখন এই মহাশূন্য বাইরে এবং ভিতরে সর্বত্রই একইভাবে দেখা গেল। অতএব যদি কোনো সাধক মনে করে যে জিভ উঠলেই সবকিছু হয়ে গেল তা ঠিক নয়। সেই সাধককে চেষ্টা করতে হবে জিভ যাতে আরো অধিক ওপরে ওঠে এবং ভগরূপী গর্তে প্রবেশ করে। যতক্ষণ এই ভগরূপী গর্তে জিভের অবস্থান না হয় ততক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। যাঁদের জিভ আলজিভ অতিক্রম করে অন্তত কিছুটা চলে গেছে তাদের পক্ষে এই অবস্থালাভ সুগম হয়। কিন্তু যাদের জিভ ওঠেনি তারা যদি গুরুপ্রদত্ত সহজ কৌশল অবলম্বন ক'রে আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালায় এবং যদি প্রকৃতি বিরুদ্ধ চেষ্টা না করে তবে তারাও যে অচিরে এই অবস্থা লাভ করতে পারবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এরজন্য চাই আন্তরিক চেষ্টা ও পুরুষকারের প্রয়োগ। যিনি এই প্রকারে খেচরীসিদ্ধ অবস্থালাভ করতে সক্ষম হন তিনিই প্রকৃতপক্ষে কামকে জয় করতে পারেন। কামই হোলো সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বলশালী। সাধারণ উপায়ে অন্যান্য ইন্দ্রিয়দের যদিও বা জয় করা যায়, কামকে জয় করা ততো সুলভ নয়। আবার এই কামকে

জয় করতে না পারলে আত্মরাজ্যে স্থায়ী স্থিতিলাভ করা যায় না। তাই সাধককে আত্মরাজ্যে স্থায়ী স্থিতিলাভ করতে হলে কামকে যে অবশ্যই জয় করা প্রয়োজন সে কথা বলতে গিয়ে যোগিরাজ বলেছেন—"জিসনে কামকো জিতা উসনে সব কুছ কিয়া।"—যিনি সবচেয়ে বলশালী ইন্দ্রিয় কামকে জয় করতে পেরেছেন, তিনি অনায়াসে আর সকল ইন্দ্রিয়দের জয় করেছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। জিভকে ভগরূপী গর্তে প্রবেশ করিয়ে উত্তম প্রাণকর্ম করলে শ্বাসের গতি আপনা হতেই স্থির হবে এবং কামসহ সকল প্রকার ইন্দ্রিয় ও কামনা বাসনা সবই আপনা হতে জয় হবে। এই অবস্থা লাভের পূর্বে যদি কেউ বলেন যে তিনি কামকে জয় করেছেন তবে তা বাতুলতা মাত্র। তাই যোগিরাজ আরো বলেছেন—"গলেমে মিঠা মালুম হুয়া আউর ভিতর ভিতর চলা আউর বড়া নেসা মালুম হুয়া এযসা হমেসা চাহিযে"—জিভ আরো ওপরে উঠে তালুকুহরে ভগরূপী গর্তে প্রবেশ করায় সহস্রার থেকে নির্গত অমৃতধারার মিষ্টস্বাদ পেলাম। এই অবস্থায় শ্বাসের গতি ভেতরে ভেতরে চলায় যে গাঢ় নেশার উদয় হল, এই প্রকার নেশা সবসময় প্রয়োজন। যোগী যখন খেচরী সিদ্ধি অবস্থা লাভ করেন তখন এই প্রকার নেশার উদয় আপনা হতেই হয় এবং সেই নেশায় যোগী বুঁদ হয়ে থাকায় কাম বিবর্জিত অবস্থা লাভ করেন। তাই যোগিরাজ আদেশ দিয়েছেন যাঁর এই প্রকার খেচরী সিদ্ধি অবস্থা লাভ হয়েছে, যিনি ওঁকার ক্রিয়ায় ব্রত, তিনি গুরু অনুমতি সাপেক্ষে ক্রিয়াদান করতে পারেন। কিন্তু কখনই গুরু অনুমতি ব্যতিরেকে ক্রিয়াদান করা অনুচিত ও নিষিদ্ধ, কারণ এই অবস্থা লাভের পর গুরু তাঁকে উপযুক্ত অধিকারী মনে করেন এবং লোকহিতার্থে ক্রিয়াদানের অনুমতি দেন।

কেবল রেচক ও পুরক আউর বঢ়াও এ সিদ্ধি দে—লাগে আউর
সমাধ—রেচক পুরক বিনা জয়সে বন্ধাকুপ, প্রাণবায়ুকো বল লে
আওএ মন নিশ্চল হোয় জায়—আয়ুর বঢ়াওএ—রোগ ন রহে—
পাপ জলাওএ নির্ম্মল করে—জ্ঞান হোয় তিমিব নাশে ॥ ৪ ॥

প্রচলিত সাধারণ প্রাণায়ামে পূরক, রেচক ও কুম্ভক এই তিনটি কর্ম আছে। কিন্তু যোগিগণ ব্রহ্ম-সাধনের জন্য যে প্রাণায়াম করেন তাতে চেষ্টা করে কুম্ভকের প্রয়োজন নেই। যোগিগণ অন্তর্মুখীভাবে কেবল রেচক ও পূরক এই দুটি কর্ম করেন এবং তাতে তাঁদের কুম্ভক আপনা হতেই হয়। গীতাতে ভগবান্ সেই কথাই বলেছেন—

আপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়নাঃ। (গীতা ৪।২৯)

অর্থাৎ প্রাণবায়ুকে অপানবায়ুতে এবং অপানবায়ুকে প্রাণবায়ুতে হোম কর। এইরূপ আত্মকর্ম করতে করতে প্রাণ এবং অপান বায়ুর গতি রুদ্ধ হয়ে 'কেবল' নামক কুম্ভক আপনা হতেই প্রাপ্ত হবে; এই অবস্থাকেই প্রাণায়ামপরায়ণ বলা হয়। যোগিরাজও তাই বলছেন এই রেচক পূরকরূপ কর্ম আরও বাড়াও, তাহলেই সিদ্ধি ও সমাধি অবস্থা আপনা হতেই লাভ করবে। তিনি আরও বলছেন এই অন্তর্মুখী রেচক পূরক ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রাণায়াম তা জলহীন কূপের ন্যায় বিফল। প্রাণবায়ুকে বলপূর্বক টানা ও ফেলা এই কর্ম করলেই মন আপনা হতেই নিশ্চল হয়ে যাবে, স্থির হয়ে যাবে। কারণ মন স্থির না হলে সাধনই হয় না, এই প্রাণকর্মই মন স্থিরের প্রধান উপায়।

এই অন্তর্মুখীন প্রাণকর্ম আরও বাড়াও অর্থাৎ রেচক পূরকরূপ কর্ম আরও অধিক কর, তাহলে রোগ থাকবে না, জন্ম জন্মান্তরের পাপরাশী জলে যাবে অর্থাৎ জন্ম জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত পাপরাশীর ধ্বংস হবে, জ্ঞান হবে এবং অজ্ঞানের নাশ আপনা হতেই হবে। রোগ এই দেহকে নষ্ট করে। যোগীর প্রথম কাজ শরীরকে সুস্থ রাখা। যোগকর্ম বীরের ধর্ম, পৃথিবীতে যত বীর আছে যোগীর মত বড় বীর কেউ নয়। কারণ সাধারণতঃ বীরের ধর্ম বাইরের শত্রুকে পরাভূত করা। যে যত অধিক ও বড় বড় শত্রুকে পরাভূত করতে পারে সে তত বড় বীর বলে গণ্য হয়। কিন্তু সেই মহান্ বীরগণও নিজের ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুদের পরাভূত করতে পারে না। এই ইন্দ্রিয়গণই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু, যারা মানুষকে ঈশ্বরপথে চলতে দেয় না। এরা সবসময়েই প্রবৃত্তির দিকে টেনে রাখে। তাই ইন্দ্রিয়দের যাঁরা দমন করতে পারেন সেই যোগীগণকে শ্রেষ্ঠ বীর বলা যায়। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়রূপী শত্রুদের দমন করতে হলে যে কঠোর যোগসাধনার প্রয়োজন এবং অধিক অধ্যাবসায়ের প্রয়োজন তার জন্য যোগীর সুস্থ ও নিরোগ শরীর চাই। রোগগ্রস্থ দেহে যোগসাধন সম্ভব নয়। তাই যোগিরাজ বলছেন এই অন্তর্মুখী রেচক পূরকরূপ প্রাণকর্ম অধিক পরিমাণে করলে নিরোগ শরীর লাভ করবে এবং সেই নিরোগ শরীরের দ্বারা আরো অধিক প্রাণকর্ম করতে থাকলে জন্ম জন্মান্তরের পাপরাশী জলে পুড়ে যাবে। আগুনের ধর্ম যে কোন বস্তুকে জ্বালিয়ে দেওয়া। অধিক পরিমাণে প্রাণকর্ম করলে তীব্র আত্মজ্যোতির সংস্পর্শে সমস্ত পাপরাশি জলে যায়। অতীত অতীত জন্মের কুকর্মের সমষ্টির ফলকে পাপ বলে এবং সুকর্মের সমষ্টির ফলকে পুণ্য বলে। এই পাপ-পুণ্যের সমষ্টি ফলেই এই দেহ অর্থাৎ কর্মফলের অনুবন্ধতেই এই দেহ। অতএব পাপ-পুণ্যহীন মানুষ নেই। ক্রিয়ার পরাবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয় এমনকি মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার সবই থেমে যায়, দেহবোধ চলে যায়, সমস্ত কিছু দেখাশুনা, জানাজানির

অতীতে পৌঁছে যায় তখন আর কোনো কর্ম থাকে না। এই নিষ্কর্ম অবস্থায় কোনো প্রকার পাপ থাকা সম্ভব নয়, পুণ্য থাকাও সম্ভব নয়। কারণ পাপপুণ্য উভয়ই কর্মের ফল। ক্রিয়ার পরাবস্থায় যখন কোনো প্রকার কর্ম নেই তখন পাপপুণ্যও নেই। এই অবস্থায় পৌঁছে যোগিরাজ বলেছেন জন্মজন্মান্তরের পাপরাশি জলে যাবে এবং নির্মল অবস্থা প্রাপ্ত হবে। কর্মফলই ময়লা, যখন কর্মফল থাকে না তখন শুদ্ধ, সত্ত্ব, নির্মল আত্মা বর্তমান। এই নির্মল আত্মদর্শনে সমস্ত প্রকার অজ্ঞান দূরীভূত হয়ে যোগী জ্ঞানাবস্থা লাভ করেন। তাই ভগবান্ বলেছেন—"অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা।" (গীতা ১৫।৩)। অর্থাৎ সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয়সঙ্গ রহিত এই যে প্রাণকর্ম তা দৃঢ়তার সহিত অনুশীলন করলে সকল ইন্দ্রিয়দের ছেদনপূর্বক নাশ হয়। অতএব হে অর্জুন (অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে সমস্ত মানুষকে বলছেন) কর্মের ক্ষেত্র এই মানবশরীর লাভ করে কখনো প্রাণকর্মে অবহেলা কোরো না। ভগবান্ আরো বলেছেন—"তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।" (গীতা ২।৩৭)। অর্থাৎ হে কৌন্তেয়, প্রবৃত্তিপক্ষীয় ইন্দ্রিয়দের নাশ করবার জন্য যুদ্ধার্থে কৃতনিশ্চয় হয়ে ওঠো এবং প্রাণকর্মরূপ সাধনসমর কর। কারণ "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" (গীতা ২।৪০)—অর্থাৎ এই যে নিষ্কাম কর্মযোগ (প্রাণকর্ম) তা অল্প সল্প করলেও মহান্ ভয় হতে ত্রাণ পাবে। জীবের মৃত্যু ভয়ই প্রধান, সেই মৃত্যু হতেও ত্রাণ পাবে। অর্থাৎ এই প্রাণকর্মের এমনই মহিমা যে কেউ যদি সাধ্যমত অল্পস্বল্প করতে পারে তা হলেও জন্মমৃত্যুরূপ প্রবাহের অতীতে যেতে পারবে।

নাক বা মুখ দিয়ে বাইরের বায়ু টেনে নিয়ে বা ফেলে দিয়ে এই প্রাণায়াম করা হয় না। এটা অন্তর্মুখী প্রাণায়াম। ভগবান্ বলেছেন প্রাণবায়ুকে অপান বায়ুতে এবং অপানবায়ুকে প্রাণবায়ুতে স্থাপন কর, এই কর্ম করতে থাকলে প্রাণ-অপানের গতি রুদ্ধ হয়ে আপনা হতেই প্রাণায়ামপরায়ণ অবস্থা লাভ করবে। এই প্রাণ ও অপান বায়ু শরীরের ভেতরে অবস্থিত, এ দুটো বাইরের বায়ু নয়। অতএব বাইরের বায়ুকে টানা ফেলার মাধ্যমে প্রাণায়াম করতে ভগবান্ বলেননি। বাইরের বায়ু হতে টানা ফেলার মাধ্যমে যদি প্রাণায়াম করা হয় তাহলে বাহ্য কর্মেই রত থাকা হয় এবং ইড়া পিঙ্গলার অধীনে থাকতে বাধ্য হয়; অন্তর প্রদেশে প্রবেশ করা যায় না। জীব ভূমিষ্ঠ হবার পর ইড়া পিঙ্গলায় গতি হয় এবং সেই গতিতে থাকায় জীব বাহ্য বিষয়ে আকৃষ্ট হয়। যতক্ষণ জীব বহির্গতি সম্পন্ন এই ইড়া পিঙ্গলায় অবস্থান করে ততক্ষণই সে জীবিত এবং বাহ্য বিষয়ে আকৃষ্ট। তাই ইড়া পিঙ্গলার যে বাহ্য গতি তাকে ধরে যদি প্রাণায়াম করা হয় তবে জীব কিছুতেই অন্তরপ্রদেশে প্রবেশ করতে পারবে না এবং প্রাণের অনন্ত গতিকে থামিয়ে স্থির হতে পারবে না। তাই বহির্গতি-

সম্পন্ন এবং জগতের দিকে আকৃষ্টকারী এই ইড়া-পিঙ্গলাকে বাদ দিয়ে দেহের অভ্যন্তরে নাভির নীচে যে অপানবায়ু এবং নাভির ঊর্ধ্বে যে প্রাণবায়ু এই দুই বায়ুকে নিয়ে প্রাণায়াম করবার বিধি ভগবান্ গীতায় বলেছেন। তিনি কখনই শ্বাস-প্রশ্বাসের বহির্গতিকে ধরে, নাক টিপে অথবা মুখ দিয়ে প্রাণায়াম করবার কথা বলেননি। যোগিরাজও গীতোক্ত এই অভ্যন্তর গতিসম্পন্ন প্রাণায়ামই সকলকে করতে উপদেশ দিয়েছেন।

যোগিরাজ বলেছেন এই প্রকার অন্তর্মুখী প্রাণায়াম করলে শরীর নিরোগ থাকে, ব্যাধি হয় না। ব্যাধি হোলো মানুষের পরম শত্রু। ব্যাধি হতে পরিত্রাণ লাভের জন্য সারা পৃথিবীর মানুষ সচেষ্ট কিন্তু কেউই ব্যাধিমুক্ত হতে পারে না। একমাত্র যোগীদের পক্ষেই ব্যাধিমুক্ত হওয়া সম্ভব। কারণ তাঁরা ব্যাধির যে উৎসস্থল তাকেই রুদ্ধ করে রাখেন, যা যোগীর পক্ষেই সম্ভব। শরীরাভ্যন্তরে বায়ুর বিকারেই ব্যাধি উৎপন্ন হয় অর্থাৎ বায়ুর অসাম্যতাই ব্যাধির কারণ। প্রাণ চঞ্চল থাকায় শরীরাভ্যন্তরে ঊনপঞ্চাশ বায়ু চালু থাকে। এই ঊনপঞ্চাশ বায়ুর কোনো না কোনো বায়ুর অসাম্যতা ঘটলে ব্যাধি হয়। যোগী অন্তর্মুখী এই প্রাণায়ামের মাধ্যমে ঊনপঞ্চাশ বায়ুকে থামিয়ে মুখ্য প্রাণবায়ুতে রাখতে সমর্থ হন। এ অবস্থায় ঊনপঞ্চাশ বায়ু কর্মহীন হওয়ায় অর্থাৎ চাঞ্চল্য রহিত হওয়ায় অসাম্যতা দূরীভূত হয়। তখন ঊনপঞ্চাশ বায়ু মুখ্য প্রাণবায়ুতে অবস্থান করায় পুরোপুরি সাম্যতা বজায় থাকে। এ অবস্থায় কোনো প্রকার রোগ থাকা সম্ভব নয়। যদি কোন কারণে স্থিরাবস্থা রহিত হয় তখন আবার ব্যাধি দেখা দেয়। মানুষের বৃদ্ধ বয়সে সাধারণতঃ কয়েকটি জীবননাশক রোগ প্রায় সকলেরই হতে দেখা যায়, যেমন রক্তের চাপজনিত ব্যাধি (Blood Pressure), বহুমূত্র ব্যাধি (Diabetes), হৃদরোগ (Heart-trouble) ইত্যাদি। যদি অল্প বয়স থেকে মানুষ, ঈশ্বরলাভের বা আত্মজ্ঞানের ইচ্ছা থাক বা না থাক, তথাপি এই অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করে তাহলে এসব রোগ কখনই হবে না একথা যোগীরা নিশ্চিতরূপে বলেন। যোগীরা বলেন এই দেহের মধ্যেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু আছে। এই দেহ ক্ষণভঙ্গুর হলেও অত্যন্ত জটিল ও সূক্ষ্ম। কাজেই যোগী ব্যতীত এই দেহের সূক্ষ্ম জটিল ও প্রতিটি অণু পরমাণু বিষয়ে জানা সম্ভব নয়। তাই যোগিগণই একমাত্র জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ইত্যাদি অবস্থাগুলিকে অতিক্রম করতে পারেন। কারণ এই অবস্থাগুলি সবই প্রাণের চঞ্চল অবস্থা হতে জাত। কিন্তু যখন প্রাণ স্থির তখন এরা কেউ নেই। ব্যাধিমুক্ত হতে সকলেই চায় কিন্তু তার উপায় কারো জানা নেই। ব্যাধিমুক্ত হবার জন্য মানুষ নতুন নতুন চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটায়, কতো তাদের গবেষণা। তবুও দেখা যায় কিছুতেই

মানুষ ব্যাধিমুক্ত হতে পারে না। ব্যাধিমুক্ত হতে গেলে যে বায়ুর সাম্যতা বা স্থিতাবস্থা প্রয়োজন এদিকে কারো লক্ষ্য নেই। বায়ুর এই স্থিরাবস্থা ঘটানোর জন্য কোনো ওষুধ বা শল্য চিকিৎসার প্রয়োজন করে না। এর জন্য চাই অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম। সকল মানুষ হয়ত ঈশ্বরকে পেতে চায় না কিন্তু ব্যাধিমুক্ত সকলেই হতে চায়। যোগিরাজ বলেছেন 'বায়ুই ভগবান্'। তাঁর কথা অনুসারে বাইরের প্রবহমান এই বায়ু ভগবান্ নয়, এমনকি দেহাভ্যন্তরে চঞ্চল ঊনপঞ্চাশ বায়ুও ভগবান্ নয়। তাঁর বলার উদ্দেশ্য হোলো অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করতে করতে যখন ঊনপঞ্চাশ বায়ু থেমে গিয়ে মুখ্য এক প্রাণবায়ুতে রূপান্তরিত হবে, যখন কেবল একমাত্র স্থির প্রাণবায়ুই অবশিষ্ট থাকবে সেটাই ভগবান্। যোগী যখন এই অবস্থায় উপনীত হন তখন তিনি নিজেই ভগবান্ হন, তখন তাঁকে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি কেউই স্পর্শ করতে পারে না।

প্রাণের চঞ্চল দিকটাই অজ্ঞান এবং স্থির দিকটাই জ্ঞান। জীব প্রাণের চঞ্চল দিকেই থাকে, এটাই তার বর্তমান অস্তিত্ব। তাই সে কিছুতেই স্থিরত্বের হদিস পায় না। আবার স্থিরত্বের হদিস না পাওয়ায় জ্ঞানলাভ করতে পারে না। চঞ্চল দিকে থাকায় জীব সর্বদায় দোলায়মাণ, তাই সে নানাত্ব দেখে, যেমন জলে অনেক চাঁদ দেখা। কিন্তু জল যখন স্থির তখন এক চাঁদ। জন্ম জন্মান্তর ধরে প্রাণের এই যে চঞ্চল প্রবাহ এটাই তিমির বা অন্ধকারের দিক। এই দিকটাকে নিবৃত্ত না করা পর্যন্ত জ্ঞান হয় না। আবার যতটুকু নিবৃত্ত করা যায় ততটুকুই জ্ঞান হয়, এর কম-বেশী হবার উপায় নেই। আত্মজ্ঞানই জ্ঞান, আর সবই অজ্ঞান; স্থিরত্ব ব্যতীত আত্মজ্ঞান সম্ভব নয়। অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করতে থাকলে যতই ঊনপঞ্চাশ বায়ু স্থিরত্বের দিকে এগিয়ে যাবে ততই জীবনের অন্ধকারের দিক ঘুচে যাবে; শেষে যখন সম্পূর্ণ স্থির হবে তখন নিশ্চল ব্রহ্মে মিশে যাবে। এমন অবস্থাপন্ন যোগীকেই পূর্ণজ্ঞানী বলা হয়। অতএব এই অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম এমনই একটা কর্ম যা করতে থাকলে সব পাওয়া যায়। তাই যোগিরাজ বলতেন 'ক্রিয়া করলে সব পাবে।'

"শ্বাসা একদম সে বন্দ হুয়া, বড়া মজা।
আবকী মজাকি বাত কুছ কহা নজায়" ॥ ৫ ॥

যোগিরাজ বলেছেন এই সুষুম্নান্তর্গত অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম উত্তম প্রকারে করতে থাকলে আগম নিগমরূপ শ্বাস-প্রশ্বাসের বহির্মুখী গতি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়. আপনা হতে থেমে যায় অর্থাৎ কেবল-কুম্ভক অবস্থা লাভ করা যায়। এই কেবল-কুম্ভক

অবস্থায় যে মহানন্দ তা মুখে বলা যায় না, কারণ বলবার উপায় নেই। এই আনন্দ নিজ বোধগম্য। এই কেবল-কুম্ভক অবস্থা পেতে হলে কেবল-কর্ম করতে হবে। এই কেবল-কর্ম সম্বন্ধে ভগবান্ বলেছেন, "শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্"। (গীতা ৪/২১)—অর্থাৎ এই শরীরের দ্বারায় যিনি এই 'কেবল' নামক কর্ম করেন তিনি নিষ্কাম যতচিত্তাত্মা ও ত্যাক্তসর্বপরিগ্রহ হওয়ায় পাপ প্রাপ্ত হন না। এই কেবল-কর্মকেই প্রকৃত কর্মযোগ বলে। ভগবান্ এই কর্মকে অপর জায়গায় 'সহজকর্ম' বলেছেন। অতএব যা কেবলকর্ম তাঁই সহজকর্ম এবং উহাই কর্মযোগ। ভগবান্ বলেছেন—"সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ"। (গীতা ১৮/৪৮)। 'সহজ' অর্থে easy নয়, সহজ অর্থাৎ যা জন্মের সাথে সাথে পাওয়া গেছে, যাকে পাবার জন্য কোনো প্রকার চেষ্টা করতে হয়নি। জীব ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে ইড়া ও পিঙ্গলা নামক দুই নাসিকায় শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি চালু হয়। এই গতিই জীবন। যতক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস চালু থাকে ততক্ষণই জীব জীবিত থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাস নেই তো দেহও নেই। তাই চলতি কথায় বলা হয় 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ'। অর্থাৎ যতক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস চালু আছে ততক্ষণই জীবনের আশা ও ভরসা। এই শ্বাস-প্রশ্বাসই প্রকৃত পক্ষে সারা জীবনের সাথী। এই সাথীকেই লক্ষ্য করে মীরাবাঈ বলেছেন—"মেরে জনম মরণকে সাথী, তুঁহে না বিশরো দিনরাতি।" জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সারা জীবনের সাথী এই যে শ্বাস-প্রশ্বাস, যাকে ছাড়া ক্ষণকালও জীব জীবিত থাকতে পারে না তাকে কখনো বিস্মরণ হোযো না। এই শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ সহজকর্ম অর্থাৎ প্রাণকর্ম, আত্মকর্ম বা প্রাণায়াম তা অবশ্যই কর, কখনো ত্যাগ কোরো না। এই সহজকর্মই বা এই কেবলকর্মই জন্ম-মৃত্যুরূপ প্রবাহের পরপারে পৌঁছে দিতে পারে। অবশ্য এই সহজকর্ম অনভ্যাসের দরুন প্রথম প্রথম ঠিকমত হবে না। তাই বলে এই কর্মের দোষারোপ করে একে ত্যাগ করা কখনও উচিত নয়। কিছুদিন অভ্যাস করতে থাকলে নিশ্চয় ঠিক হয়ে যাবে। এই কর্মকেই স্বধর্ম বলে। এ বিষয়ে ভগবান্ বলেছেন—"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥" (গীতা ৩।৩৫) অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ধর্মই পরধর্ম। (অপরের ধর্ম পরধর্ম নয়। যেমন হিন্দুর কাছে ইসলাম বা খ্রীষ্ট ধর্ম প্রভৃতি পরধর্ম নয়; আবার ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে হিন্দু বা খ্রীষ্ট ধর্ম পরধর্ম নয়, তেমনি খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের কাছে হিন্দু বা ইসলাম ধর্ম পরধর্ম নয়। এই প্রকার অন্যান্য সকল ধর্মও অপরের কাছে পরধর্ম নয়। এই ধর্মগুলি কোনো না কোনো মহাপুরুষ দ্বারায় জাত। অতএব এদের যখন উৎপত্তিকাল আছে তখন এদের সনাতন বলা যায় না। যেহেতু এগুলির উৎপত্তিকাল বিদ্যমান, সনাতন নয়, তখন এদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তুই

এই প্রকার ধর্মগুলিকে একে অপরের কাছে পরধর্ম বলে গণ্য হতে পারে না। অতএব ইন্দ্রিয়রূপী পরধর্ম যা জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানবদেহে বিদ্যমান, যারা মানুষকে নির্বত্তি পথে চলতে দেয় না তাকেই প্রকৃতপক্ষে পরধর্ম বলা হয়। এই ইন্দ্রিয়গণ দেহের মধ্যে বাস করে সদাসর্বদা শত্রুতাচারণ করে। তাই এদের মত শত্রু আর নেই। এই ইন্দ্রিয়রূপী পরধর্মকেই ভগবান্ ভয়াবহ বলেছেন।) সুন্দররূপে বা ভালবেসে অনুষ্ঠিত পরধর্মাপেক্ষা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ধর্মাপেক্ষা প্রথম প্রথম অনভ্যাস বশতঃ দোষযুক্ত এই আত্মধর্ম অর্থাৎ স্বধর্ম শ্রেষ্ঠ। এই সহজকর্মরূপ আত্মধর্ম বা স্বধর্ম বা প্রাণকর্ম করতে করতে যদি নিধনও হয় অর্থাৎ দেহপাত হয় তাহলেও এই কর্ম করা উচিত। কোনো প্রকারেই পরধর্মরূপ ইন্দ্রিয়ধর্মে রত থাকা উচিত নয়। এই পরধর্মরূপ ইন্দ্রিয়ধর্ম সর্বদাই ভয়াবহ। কারণ এই পরধর্মে রত থাকলে প্রাণের চঞ্চল গতি বাড়ে এবং ভগবৎ সান্নিধ্য হতে দূরে থাকে। তাই পরধর্মে রত থাকলে জন্ম-মৃত্যু অনিবার্য্য।

যোগিরাজ বলছেন প্রাণকর্ম করতে করতে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি তাঁর একেবারে থেমে গেল এবং এই গতি থেমে যাওয়ায় যে পরমানন্দ লাভ হল তা মুখে ব্যক্ত করা যায় না। মহাযোগীর এই কথায় এটা বোঝা গেল যে উত্তম প্রকারে প্রাণকর্ম করতে থাকলে তবেই এই শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিরুদ্ধ করা যায়। অতএব প্রকারান্তরে তিনি সকলকে এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে বিনা প্রাণকর্মে এই স্থিরাবস্থা লাভ হবে না এবং এই প্রকার মহানন্দও পাওয়া যাবে না। অতএব এই প্রাণকর্ম প্রতিটি মানুষের করা উচিত বা একান্ত কর্তব্য বলে তিনি চিহ্নিত করেছেন। এই প্রাণকর্ম সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেছেন—"প্রাণায়ামো মহাধর্ম বেদানামপ্য গোচর" ইত্যাদি। অর্থাৎ এই অন্তর্মুখী প্রাণায়ামের ফল বা গুণের কথা বেদও বলতে পারে না অর্থাৎ এই প্রাণায়ামের মহিমাকীর্ত্তন করা সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বেদ তার পক্ষেও সম্ভব নয়। তবে এই কর্ম কেবল মাত্র যোগীগণই অবগত আছেন, কারণ এই কর্ম নিজে করে বুঝতে হবে, অতএব শাস্ত্র পড়ে এ কর্মকে বোঝা যাবে না। পুরাকালে ঋষিগণ এবং পরবর্তীকালে বহু মহাযোগীগণ নিজেরা এই কর্ম করে মহানন্দ লাভ করেছেন এবং কর্মের অতীতাবস্থায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছেন। গীতাতেও ভগবান্ এই প্রাণকর্মকেই প্রকৃত নিষ্কাম কর্মযোগ আখ্যা দিয়ে অর্জুনের মাধ্যমে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষকে এই নিষ্কাম কর্মযোগ করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং যোগী হতে বলেছেন। কারণ এই নিষ্কাম কর্ম একমাত্র যোগিগণই করে থাকেন। ভগবান্ গীতায় বলেছেন যোগীর কর্মই প্রধান। কিন্তু সে কোন্ কর্ম? মানুষ জাগতিক ভাবে যত প্রকার কর্ম করে তা কখনই নিষ্কাম হতে পারে না, কোনো না কোনো প্রকার

কামনা বাসনা অবশ্যই তার সঙ্গে জড়িত থাকে। জাগতিক কর্ম কখনই নিষ্কাম হতে পারে না। ভগবান্ অপর জায়গায় বলেছেন সাধারণ মানুষের কাছে যা কর্ম যোগিদের কাছে তা অকর্ম এবং যোগিদের কাছে যা কর্ম সাধারণ মানুষের কাছে তা অকর্ম। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে সাধারণ মানুষ যে অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করে না সেই প্রাণকর্মই যোগিদের কাছে কর্ম বলে গণ্য এবং সাধারণ মানুষ জাগতিক ভাবে যত প্রকার কর্ম করে থাকে অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যেগুলিকে কর্ম ব'লে সেগুলি যোগিদের কাছে অকর্ম। যোগিদের কাছে একমাত্র আত্মকর্মই কর্ম এবং এটাই স্বধর্ম, অন্য সকলপ্রকার কর্ম অকর্ম বলে গণ্য। তাই যোগিরাজ সকলকে দ্বিধাহীন চিত্তে, নিঃসঙ্কভাবে এই প্রাণকর্মরূপ স্বধর্মই উত্তমভাবে বারবার করবার উপদেশ দিয়েছেন। এই প্রাণকর্মই একমাত্র কর্ম যা আত্মসমীপে পৌঁছে দিতে সক্ষম। তাই যোগিরাজ উদাত্তকণ্ঠে, দ্বিধাহীন চিত্তে মর্তলোকবাসীদের শোনালেন 'ক্রিয়া সত্য, আর সব মিথ্যা'। ক্রিয়া অর্থে কর্ম, কর্ম অর্থে নিষ্কাম কর্ম অর্থাৎ প্রাণকর্ম। কিন্তু ভগবান্ বলেছেন দ্বন্দ্বাতীত, গুণাতীত এবং কর্মাতীত হতে হবে। এই প্রাণকর্ম যতক্ষণ করা যায় অর্থাৎ প্রাণকর্ম করবার মত অবস্থা যতক্ষণ যোগীর থাকে অর্থাৎ যোগী যতক্ষণ প্রাণকর্মে রত ততক্ষণ যোগীকে দ্বন্দ্বাতীত, গুণাতীত এবং কর্মাতীত বলা যায় না। কিন্তু যোগীর মূল লক্ষ্য যেহেতু স্থির ব্রহ্ম তাই তিনি আরও অধিক পরিমাণে এই প্রাণকর্ম করতে করতে সমস্ত প্রকার অতীত অবস্থায় পৌঁছে যান। এই প্রকার নিশ্চল অবস্থায় পৌঁছে যোগী অবস্থান করায় তিনি তখন সকল প্রকার দ্বন্দ্বাতীত, গুণাতীত এবং কর্মাতীত অবস্থা লাভ করেন। যোগীর এই প্রকার অবস্থালাভকেই ত্রিগুণাতীত অবস্থা বলা হয়। তাই ভগবান্ অর্জুনের মাধ্যমে সকল মানুষকে বললেন—ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ কর। (ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্য ভবার্জ্জুন ইত্যাদি।) এই প্রকার ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করা বা ত্রিগুণাতীত অবস্থায় পৌঁছান যোগী ব্যতীত অপরের পক্ষে সম্ভব নয়। ভগবান্ বলছেন—

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্ম-নির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥ (গীতা ২/৭২)

ভগবান্ গীতায় এই শ্লোকের আগের শ্লোকগুলিতে যে যে প্রকার মহানন্দ, শান্তি বা ব্রাহ্মীস্থিতির বর্ণনা করেছেন তার উপসংহার করতে গিয়ে এই শ্লোকে বলছেন—কর্মের অতীতাবস্থায় যে স্থিতি-প্রাপ্তিরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠা বা ব্রাহ্মীস্থিতি তা এই প্রকার। যখন প্রাণকর্ম করতে করতে প্রাণাপানের গতিরুদ্ধাবস্থা লাভ হয় সেই অবস্থাকেই কর্মের অতীতাবস্থায় স্থিতি-প্রাপ্তিরূপ ব্রাহ্মীস্থিতি বলা হয়। প্রাণের আগম-নিগমরূপ কর্মের অতীতাবস্থাই অর্থাৎ [illegible] ব্রহ্মপদবাচ্য, কারণ আত্মার যে বৃহৎ অবস্থা

বা মহান্ অবস্থা সেই অবস্থাকেই ব্রহ্ম বলা হয়। আত্মার এই মহান্ অবস্থা অপেক্ষা আর কিছুই মহান্ নেই। এই মহান্ অবস্থা যাঁর ক্ষণকালের জন্যও প্রত্যক্ষ হয়েছে, কেবল তিনিই উহা অবগত আছেন ; এই অবস্থা নিজবোধগম্য এবং অব্যক্ত। শাস্ত্র পড়ে বা কারো মুখে শুনে এই অব্যক্তরূপী মহানন্দাবস্থাকে জানা যায় না। যা মুখে বলা যায় বা শুনে জানা যায় তা কখনই ব্রহ্ম হতে পারে না। যেমন 'কর্মের অতীতাবস্থা' এই কথা বলাতে বা শোনাতে সঠিক অবস্থার কথা বলা, প্রকাশ করা বা শোনা হালো না। কর্ম একটা অবস্থা মাত্র বা যা কিছু করা যায় তাকেই কর্ম বলে। কর্মের মধ্যে অকর্ম এবং কর্ম দুইই আছে। সাধারণ মানুষ জাগতিক ভাবে যত প্রকার কর্ম করে সেগুলির সঙ্গে ফলাকাঙ্খা মিশ্রিত থাকায় সবই অকর্ম। দান, ধ্যান, সৎকর্ম, পূজা, সেবা, দয়া, তীর্থভ্রমণ ইত্যাদি যেসব কর্মগুলিকে আমরা ঈশ্বর প্রাপক কর্ম বলে থাকি আসলে যোগীর কাছে এগুলিও অকর্ম। কিন্তু সাধারণ মানুষ যা জানে না, যা করে না, যা কেবল মাত্র গুরুবক্ত্রগম্য সেই নিষ্কাম অন্তর্মুখী প্রাণকর্মই যোগীদের প্রকৃত বা একমাত্র কর্ম। কারণ জাগতিক সকল কর্মই মন, বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যেহেতু অনুষ্ঠিত হয় তাই সেসব কর্ম অকর্ম। এই প্রাণকর্মের অস্তিত্বেই সকল প্রকার গুণাদিসম্পন্ন দেবদেবীগণের ও ইন্দ্রিয়গণের অস্তিত্ব এবং এই প্রাণকর্ম বহির্মুখীভাবে সকল জীবদেহে অজপারূপে অবস্থিত। জীব যখন এই অন্তর্মুখী প্রাণকর্মের তত্ত্ব বা রহস্য বুঝতে পারবে, তখন আপনা হতেই জীবের মন, বুদ্ধি সবকিছু সত্ত্বাদি গুণের ও ইন্দ্রিয়াদি গুণের সেবা ছেড়ে দিয়ে প্রাণের সেবারূপ নিষ্কাম আত্মকর্মে নিযুক্ত হবে এবং এই প্রাণকর্ম করে কর্মের অতীতাবস্থায় আত্মার মহান্ অবস্থা বা প্রাণের স্থিরাবস্থা উপলব্ধি করবে। এই মহান্ অবস্থার কথা যা কিছু বলা যায় বা শোনা যায় তা সবই আভাষমাত্র। যেমন লোকে 'মৃত্যু' এই শব্দটা বলে থাকে, কিন্তু মৃত্যুরূপ অবস্থাটা যে কি তা কেউ বলতে পারে না ; যিনি মরেছেন তিনিও বলতে পারেন না এবং যিনি জীবিত, তিনি ত ঐ অবস্থার কথা জানেনই না। কিন্তু যিনি জীবন্মৃত বা জীবনমুক্ত অবস্থা লাভ করেছেন অর্থাৎ মৃত্যুরূপ অবস্থাটা যে কি, তা যিনি সাধন দ্বারা মরবার আগে জেনেছেন, তিনি ঐ তত্ত্ব বা রহস্য কেবল মাত্র নিজেই জ্ঞাত আছেন। মৃত্যুরূপ এই স্থিরাবস্থা দেহাবসানের পূর্বেই জ্ঞাত হওয়ায় এই প্রকার যোগী মৃত্যুভয়ে কখনই ভীত হন না। কিন্তু যিনি যোগী নন তাঁর দেহাবসানের পূর্বে এই প্রকার স্থিরাবস্থার জ্ঞানলাভ না হওয়ায় তিনি মৃত্যুভয়ে ভীত হন ; কারণ মৃত্যুরূপ স্থিরাবস্থা যে কি তা তিনি জানেন না, তাই তিনি ভীত হন। তবে এটা ঠিক যে মৃত্যুরূপ একটা অবস্থা নিশ্চয় আছে এবং তা কারো অভিপ্রেত নয়। বর্তমান পিশাচী চঞ্চল মন ও বুদ্ধি এই ভাবে সকলকে ভয়ে ভীত করছে তাই জীব সর্বদা মৃত্যু

ভয়ে ভীত। মন ঐ পিশাচী বুদ্ধির ছলনায় অজপারূপ প্রাণকর্মে লক্ষ্য করতে দিচ্ছে না। এই প্রাণকর্মের অভ্যাস গুরুপদেশে লাভ করে নিষ্ঠা সহকারে করতে থাকলে যখন কর্মের অতীতাবস্থায় স্থিতিলাভ হবে, তখন জীব আপনাহতেই সেই অনির্বচনীয় আনন্দের অবস্থা বুঝতে পারবে এবং তখন স্বসংজ্ঞাকে জানতে পারায় ভয়ের লেশমাত্র থাকবে না। এই অবস্থা তখন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হওয়ায় মৃত্যুভয় রহিত হয়। [illegible]তেই মৃত্যু যে কি, এইভাবে তা অবগত হলে জনম-মরণ দুইই তখন সমান অবস্থায় পরিণত হয়; একেই জীবন্মৃত অবস্থা বলে। বর্তমান অবস্থাটা সম্পূর্ণ না হলেও অন্তত আংশিক জানা থাকায় এই অবস্থার প্রতি কারো ভয় থাকে না, কিন্তু মৃত্যুরূপ অবস্থাটা সম্পূর্ণ অজানা থাকায় যত ভয়। তাহলে বোঝা গেল যে এই দুই অবস্থার বিষয়ে ভয় ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ অজানা, কিন্তু যখন জানা হোলো তখন নির্ভয়। এ এক অনির্বচনীয় আনন্দের অবস্থা এবং এই অবস্থা প্রাপ্তির জন্যই যত কিছু সাধন-ভজন করা। এই অবস্থা পেলে যোগীর আর সংসার-মোহ থাকে না, মৃত্যুকালেও যোগী এই প্রকার চৈতন্য অবস্থা থেকে কর্মের অতীতাবস্থায় অর্থাৎ স্থিরাবস্থায় ব্রহ্মেতেই লয় প্রাপ্ত হন। এই অবস্থাকেই ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ অবস্থা বলে। নির্ব্বাণ অর্থাৎ নাই বাণ। বাণ অর্থে শর বা শ্বাস অর্থাৎ শ্বাসের আগম-নিগমরূপ গতিরুদ্ধাবস্থা। তাই যোগিরাজ বলেছেন এই অবস্থায় যে ব্রহ্মানন্দ তা কখনও মুখে বলা যায় না। যে যোগী এই প্রকার নির্বাণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রাণের বর্তমান চঞ্চল অবস্থাটাকে যেমন পুরোপুরি জানেন তেমনি মৃত্যুর পর অবস্থাটাও পুরোপুরি জানেন। সাধারণ মানুষ আগামীকাল কি ঘটতে পারে এটা হয়ত অনেক সময় জানে না কিন্তু যোগী উভয় অবস্থাকে জানতে পারেন।

———

"এই শরীরে যে কূটস্থ আছেন তাঁহাকে যে
গুরুর উপদেশে না দেখে সে অন্ধ" ॥ ৬ ॥

যোগিরাজের সাধনার প্রাথমিক লক্ষ্যস্থলই হোলো কূটস্থ। এই কথাটির দ্বারায় যোগিরাজ বলতে চেয়েছেন যে কূটস্থ ব্যতিরেকে আত্মসাধন সম্ভব নয়। যোগিগণের কাছে কূটস্থই আত্মসাধনার পীঠস্থান। আত্মসাধনার পীঠস্থানরূপ এই কূটস্থকে জানাই জ্ঞান এবং কূটস্থের ঊর্দ্ধে যে অব্যক্ত অবস্থা তাকে জানাই বিজ্ঞান। কূটস্থ হল উভয় অবস্থার অর্থাৎ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রান্তসীমা। আত্মসাধনার পীঠস্থানরূপ প্রান্তসীমারূপী এই কূটস্থের নীচের দিকে ব্যক্তাবস্থা এবং ঊর্দ্ধে অব্যক্তাবস্থা। কপালের মধ্যভাগে দুই ভ্রুর মাঝে নাসাগ্রে অপরিবর্তনশীল ও অবিনাশী এই সাধনার

পীঠভূমি পর্য্যন্তই যোগিদের কর্ম। অর্থাৎ কর্মের দ্বারা—প্রাণকর্মের দ্বারা এই কূটস্থ পর্য্যন্তই যোগিদের যাতায়াত। এই পৃথিবীতে যেমন তিন ভাগ জল ও একভাগ স্থল তেমনি ব্রহ্মেরও তিনভাগ নিশ্চল ও একভাগ চঞ্চল। ব্রহ্মের এই একভাগ চঞ্চলতায় কূটস্থের প্রকাশ অর্থাৎ এই একাংশ থেকেই নিখিল জগতের প্রকাশ। কূটস্থের ঊর্ধ্বে যে বাকি তিনভাগ ব্রহ্মের নিশ্চল অবস্থা তা অব্যক্ত। যিনি কূটস্থের নীচে এবং ঊর্ধ্বের উভয়ভাব জ্ঞাত হয়েছেন তিনিই জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা তৃপ্তাত্মা এবং এইরূপে কূটস্থকে বিদিত হওয়ারূপ জ্ঞানলাভ করে যিনি জীতেন্দ্রিয় হয়েছেন তাঁর সর্বত্রে সমদৃষ্টি হওয়ায় তিনি যুক্ততম যোগী। তাই যোগিরাজ বলছেন সাধনার পীঠভূমি এই অবিনাশী কূটস্থকে অবশ্যই জানা চাই। তবে এই কূটস্থকে জানতে হলে অবশ্যই গুরুপদেশের প্রয়োজন। যিনি এই পীঠভূমিরূপী কূটস্থকে জেনেছেন তিনিই গুরু এবং এইপ্রকার গুরুর কাছ থেকে উপদেশ না পাওয়ায় যিনি কূটস্থকে জানতে সক্ষম হন নি তিনি অন্ধ। সাধারণ মানুষ এই দুই চক্ষুর দ্বারায় জগতকে দেখে থাকে, কিন্তু এই দুই চক্ষুর অতীতে কূটস্থরূপী সাধনার পীঠভূমি যে তৃতীয় চক্ষু আছে তার হদিস জানে না। ফলে মায়াময় এই জগতের অতীতে যে অব্যক্তরূপী পরমাত্মভাব আছে তার দর্শন হয় না। চক্ষুর ধর্মই হল দেখা। যোগিগণ কূটস্থরূপী একচক্ষুর মাধ্যমে সেই পরমাত্মভাব দর্শনে তন্ময়প্রাপ্ত হয়ে সেখানেই অবস্থান করেন এবং ক্রমে পরমানন্দভাবের অতীতে অব্যক্তে লীন হয়ে যান। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কূটস্থরূপী চক্ষুর মাধ্যমে সেই অনির্বচনীয় মহানন্দভাবের দর্শন হয় ততক্ষণও দ্বৈতাবস্থা, কিন্তু কূটস্থের ঊর্ধ্বে যে মহাশূন্যরূপী অব্যক্ত অবস্থা তাতে লয় প্রাপ্ত হলে অদ্বৈতাবস্থা। অর্থাৎ কূটস্থের নীচে ব্যক্তাবস্থা হওয়ায় দ্বৈতাবস্থা এবং কূটস্থের ঊর্ধ্বে মহাশূন্যরূপী অব্যক্তাবস্থায় অদ্বৈতাবস্থা।

"সূন্যকে ভিতর যো সূন্য হয় সো অলখ হয়—সোই বিন্দি সোই সূর্য্য। সূন্যকে ভিতর যো সূন্য হয় উল্কা আদি নহি। লেকন উহ সূন্যসে ইহ সূন্যকা ভেদ হয়। সবুজ সূন্য অনন্ত ওহি ব্রহ্ম। সূরজ উসিমে লয় হো জাতা হয়। অব বড়া মজা ভিতর সে উঠতা হয় ভিতর জাতা হয়। অব অগম স্থানমে গএ য়ানে স্থির। অভি বহুত দূর গগন পন্থমে জানা হয়। আঁখ বন্দ করকে বাহরকা চিজ মালুম হোতা হয়" ॥ ৭ ॥

যোগিরাজ বলছেন এই যে বর্তমান আকাশ তাকেও শূন্য বলে। শূন্য অর্থে বাধাহীন অসীম এক অবস্থা। এই অবস্থাকে গগণ, অন্তরীক্ষ, ব্যোমও বলে।

অপরদিকে শূন্য অর্থে কিছুই নয়। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম এই পঞ্চভূতের শেষ মহাভূত হল ব্যোম। এই ব্যোমতত্ত্ব অনুভূতিগম্য, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নয়। কিন্তু এই শূন্য পঞ্চভূতের শেষ তত্ত্ব হওয়ায় তত্ত্বাতীত নয়, গুণাতীতও নয়। এই শূন্যের একটা আবরণ আছে, দূর-নিকট সম্পর্ক আছে। যদিও এই শূন্য সর্বত্র সমভাবে বিরাজমান তবুও তত্ত্বাতীত, গুণাতীত এবং আবরণহীন না হওয়ায় ব্রহ্ম নয়। এই শূন্য তত্ত্ব সম্বন্ধে ভগবান্ গীতায় বলেছেন—কেউ একে কোনো অস্ত্রের দ্বারা ছেদন করতে পারে না, অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করতে পারে না, জল দ্বারা আর্দ্র করতে পারে না বা বায়ুর দ্বারা শুষ্ক করতে পারে না। ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য; ইনি নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থিরভাব, সদা একরূপ এবং অনাদি। আপাত দৃষ্টিতে পঞ্চভূতের শেষভূত এই যে বর্তমান শূন্য তাও অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য; এই শূন্য নিত্য সর্বব্যাপী, স্থিরভাব, সদা একরূপ এবং অনাদি বলা যায়। ভগবানের এই কথা অনুসারে এই বর্তমান শূন্যকে ব্রহ্ম বলা যেতে পারত কারণ উপরোক্ত অবস্থাগুলি প্রায় সবই আছে বলে মনে হয়। কিন্তু এই শূন্যকেও ব্রহ্ম বলা যায় না কারণ তা আবরণহীন নয়, দূর নিকট সম্পর্ক বিহীন নয় গুণাতীতও নয়। তাহলে সেই শূন্য কোন্ শূন্য? যোগিরাজ বলছেন এই বর্তমান শূন্যের ভেতর অর্থাৎ অভ্যন্তরে যে শূন্য তা অলখ অর্থাৎ দৃষ্টির অগোচর। এই বর্তমান শূন্যের অস্তিত্ব বুদ্ধির দ্বারা অনুভবগম্য। যেমন দূরে কোনো বস্তু দৃষ্টিপথে আসামাত্র এই শূন্যের বাধাপ্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু বর্তনান এই শূন্যের অভ্যন্তরে যে অলখশূন্য তা বাধাহীন, আবরণহীন অনুভূতীর অতীত এবং গুণাতীত। সেই অলখশূন্য হতেই আত্মসূর্য্যের প্রকাশ এবং সেই আত্মসূর্য্যই যখন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে প্রথম প্রকাশিত তাকেই বিন্দু বলে। যোগিরাজ পুনরায় বলছেন এই বর্তমান শূন্যের ভিতরে যে অলখমহাশূন্য তার কোনো আদি নেই, আবার যেহেতু আদি নেই অতএব অন্তও নেই। যেহেতু এই অলখশূন্যের উৎপত্তি নেই অতএব তা অনাদি ও অবিনাশী। আবার যেহেতু উৎপত্তিহীন অতএব বিনাশহীন। যোগিরাজ পুনরায় বলছেন সেই যে অলখশূন্য তা এই বর্তমান শূন্য থেকে আলাদা অর্থাৎ এই বর্তমান শূন্যের ভেতর যে অলখশূন্য তারই অস্তিত্বে বর্তমান শূন্যের অস্তিত্ব। যোগিরাজ আবার বলেছেন সেই অলখ স্বচ্ছ মহাশূন্য সবুজ ও অনন্ত, সেই শূন্যের আদি অন্ত না থাকায় উহাই ব্রহ্ম। আত্মসূর্য্যও সেই অলখশূন্য হতে প্রকাশিত, তাই তিনি বলছেন যেহেতু আত্মসূর্য্যও সেই অলখশূন্য হতে প্রকাশিত তাই পুনরায় অলখশূন্যতেই লয় হয়ে গেল। আত্মসূর্যও সেই অলখমহাশূন্যে লয় হয়ে যায় কারণ সবকিছুরই উৎপত্তিস্থল ও লয়স্থল সেই অনন্ত নির্বিকার অজর অমর মহাশূন্য। এই প্রকার মহাশূন্যে অবস্থান করে তিনি আরও বলছেন এই অবস্থায় বড়ই

আনন্দ এবং সেই আনন্দ তাঁর ভেতর হতেই উঠছে এবং ভেতরেই যাচ্ছে। কারণ তখন তিনি নিজেই নিজেতে অবস্থান করায় এক ব্রহ্মানন্দে অবস্থিত। এই অবস্থায় কেবলমাত্র যোগিগণ ছাড়া আর কেউই যেতে পারেন না তাই এটা অগম্য স্থান। এমন যে অগম্যস্থান যেখানে অবস্থান করে যোগিরাজ আরও বলছেন যে এই অগম্যস্থান মহাস্থির ও চিরস্থির। তিনি আরও বলছেন যে এই স্বচ্ছ অলখ মহাশূন্যপথে তাঁকে আরো বহুদূর যেতে হবে অর্থাৎ এই মহাশূন্যে লয়প্রাপ্ত হতে হবে। এখন তিনি নিজসত্তার বিলুপ্তি ঘটিয়ে ব্রহ্মরূপী মহাশূন্যে লয় হতে চান অর্থাৎ স্বয়ং ব্রহ্ম হওয়াই এখন তাঁর একমাত্র কাজ। এই লয় হওয়াকেই লয়যোগ বলে। লয়প্রাপ্তির পূর্বে এই যে অবস্থায় তিনি এসে পৌঁছেছেন এখন এই দুই চোখ বন্ধ অবস্থায় বাইরের সব কিছু তিনি দেখতে ও জানতে পারছেন। যোগী যখন সাধনার পীঠভূমি কূটস্থে অবস্থান করে স্বচ্ছ মহাশূন্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন তখন তিনি ওই কূটস্থের মাধ্যমেই সবকিছু দেখতে ও জানতে পারেন। কারণ স্বচ্ছ মহাশূন্যে কোনোপ্রকার গুণ বা আবরণ না থাকায় কূটস্থরূপী দর্পণ পথে সবই দেখা যায়। এই স্বচ্ছ অলখ মহাশূন্যই ব্রহ্ম এবং এই মহাশূন্যই সবকিছুর উৎপত্তি, অবস্থান ও লয়স্থল।

"শ্বাসকে সর্ব্বদা নাড়িলে চাড়িলে শ্বাসের নির্ব্বাণ হয় অর্থাৎ স্থির হয়, স্থিরত্বের নাম যোগ। জীব মাত্রেই চঞ্চল অতএব স্থির পদ ব্যতীত গতি নাই—প্রাণায়ামে স্থির হয়। পাখা টানাতে চলে, মন করিলে টানা জায় মন না চলিলে টানিতে ইচ্ছা করে না, মন স্থির হইলে অনাবশ্যক ইচ্ছা করে না, অনাবশ্যক কার্য্য না করার নাম ইচ্ছা রহিত" ॥ ৮ ॥

ইড়া পিঙ্গলারূপে যে শ্বাস-প্রশ্বাস সর্বদা জীব শরীরে চলছে সেটাই জীবের আয়ু। জীব কত বছর জীবিত থাকল তাকে সঠিক জীবিতকাল বলা যায় না, বরং জীব কতখানি শ্বাসের পুঁজি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে সেটাই সঠিক আয়ুষ্কাল। এই শ্বাসের পুঁজি যখন শেষ হয় জীব তখন দেহত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এই দেহত্যাগের উপলক্ষ্য জন্য নানাপ্রকার কারণ হতে পারে—যেমন জরা, ব্যাধি, দুর্ঘটনা ইত্যাদি। কিন্তু আত্মা যিনি সর্বশক্তিমান তাঁকে বাধা দেবার সাধ্য কারও নেই। তিনি যখন প্রাণসত্তাকে স্থির করে এই দেহের পতন ঘটানোর সিদ্ধান্ত করেন তখন তিনি একটা উপলক্ষ্য তৈরী করেন সত্য, কিন্তু তাঁকে নিবৃত্ত করার কেউ নেই। জীবিতাবস্থাই প্রাণের চঞ্চল অবস্থা এবং এটাই আত্মার কর্ম। জীবের দেহত্যাগ করা অর্থে আত্মার

কর্মহীন অবস্থা। আত্মা অনিচ্ছার ইচ্ছায় কর্ম করেন যাকে জীবের জীবিতাবস্থা বা জাগ্রতাবস্থা বলে। আবার এই আত্মাই যখন অনিচ্ছার ইচ্ছায় কর্মত্যাগ করেন অর্থাৎ স্থির হন, তাকেই জীবের মৃত্যু বলে। এটাই জীবের অব্যক্ত অবস্থা। আত্মার কোন ইচ্ছা নেই কিন্তু তিনি অনিচ্ছার ইচ্ছায় চঞ্চলতা প্রাপ্ত হন এবং সব কর্ম করে থাকেন। আবার ওই একই অনিচ্ছার ইচ্ছায় স্থিরত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ কর্মত্যাগ করেন এবং অব্যক্ত অবস্থায় ফিরে যান। এটাই এই জগতে জীবের আসা যাওয়া। এই প্রকার আসা যাওয়ায় জীবের কর্ম সংস্কার বর্তমান থাকে এবং সেই কর্ম সংস্কারই তাকে পুনরায় চঞ্চলতার দিকে টেনে আনে, তাই জীব পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, অর্থাৎ ব্যক্তাবস্থায় ফিরে আসে। একেই জীবের জন্ম মৃত্যু বলে। "অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত··· " (গীতা ২/২৮)। কিন্তু জন্ম মৃত্যুর অতীতে যেতে গেলে যে স্থিরত্বের প্রয়োজন তা বিনা সাধনায় হবার নয়। যোগ সাধন দ্বারা যে স্থিরত্ব লাভ করা যায় তা কর্ম সংস্কারহীন হয় এবং সেই প্রকার কর্ম সংস্কারহীন স্থিরত্ব লাভ করতে পারলে আর জন্মমৃত্যু হয় না—তখন জন্মমৃত্যুরূপ প্রবাহ রহিত হওয়ায় আর পুনর্জন্ম হয় না। যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়, অন্য কোনো বস্তু দ্বারা তোলা যায় না, তেমনি শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ চঞ্চল কর্মের দ্বারা স্থিরত্ব লাভ করতে হবে। জীবের শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ গতিই যেহেতু জীবের জীবন, তাই যোগিরাজ বলছেন এই শ্বাসকে অন্তর্মুখী ভাবে নাড়াচাড়া করলে অর্থাৎ প্রাণায়াম করলে শ্বাসের নির্বাণ হয়। বাণ অর্থে শর বা শ্বাস এবং নির্বাণ অর্থে নাই শ্বাস অর্থাৎ শ্বাসের নিবৃত্ত অবস্থা। শ্বাসের এই প্রকার গতিহীন অবস্থার নামই যোগ। যোগ অর্থে মিলন, শ্বাস গতিহীন হলে অর্থাৎ স্থির হলে প্রাণ আত্মায় এবং আত্মা পরমাত্মায় মিলিত হন। তখন শ্বাস গতিহীন হওয়ায় যোগী নির্বাণ লাভ করেন। তখন কর্মসংস্কার রহিত হওয়ায় ও গতি রহিত হওয়ায় আর পুনর্জন্ম হয় না। তাই যোগিরাজ বলছেন জীব মাত্রই চঞ্চল অতএব স্থিরপদ ব্যতীত উপায় নেই। কেমন করে মানুষ সেই স্থিরপদকে লাভ করতে পারে তার উপায় স্বরূপ বলছেন—অন্তর্মুখী প্রাণায়ামে স্থির হয়। এই অন্তর্মুখী প্রাণায়াম গুরুবক্ত্রগম্য, কোনো বই পড়ে এই অন্তর্মুখী প্রাণায়ামকে জানা যায় না, এটাই সাধনার প্রধান অঙ্গ। জীব কর্মসংস্কারহীন হতে পারে না বলে গতি প্রাপ্ত হয় এবং বারবার জন্ম মৃত্যু গ্রহণ করে। কিন্তু অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম দ্বারা গতিহীন অবস্থা লাভ করতে পারলে জন্ম-মৃত্যুরূপ প্রবাহের অতীতে যাওয়া যায়। এই গতিরূপ অবস্থা এবং গতিবিহীন অবস্থা এই দুই অবস্থার কথা বোঝাতে গিয়ে উপমাস্বরূপ যোগিরাজ বলছেন টানা পাখা টানলে চলে, কিন্তু না টানলে থেমে যায়। এই টানা পাখা টানে কে? মন টানে। মন যদি টানা পাখা টানতে চায় তবেই টানা যায়। আর যদি মন

ওই টানাপাখা টানতে না চায় তবে টানা যায় না। পাখা টানা এবং না টানা উভয়ই মনের ইচ্ছা,—এই ইচ্ছা যতক্ষণ বর্তমান ততক্ষণ মন স্থির নয়। অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করতে থাকলে এই উভয়বিধ ইচ্ছাই আর মনে উদয় হয় না। তখন মন স্থির হওয়ায় অনাবশ্যক ইচ্ছা থাকে না। তাই যোগীর অনাবশ্যক ইচ্ছা না থাকায় অনাবশ্যক কর্মও হয় না, তখন অনাবশ্যক কর্ম না করায় যোগী ইচ্ছারহিত হন। এই প্রকারে যখন প্রাণের চঞ্চলতা চলে যায় অর্থাৎ কর্মের অতীতাবস্থা লাভ হয়, তখন বর্তমান মন প্রাণে লয় হয়, প্রাণ আত্মায় লয় হয় এবং আত্মা পরমাত্মায় লয় হওয়ায় সবই ব্রহ্ম হয়ে যায়। তখন মন, বুদ্ধি, জ্ঞান কিছুই না থাকায় ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ হয়। এই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি অদ্বৈত পরব্রহ্মে লীন হযে নিজেই ব্রহ্ম হয়ে যান। তখন তিনি জ্ঞানীও নন, অজ্ঞানীও নন। মোক্ষ হয়েছে কিনা তাও তিনি জানেন না কারণ যে জানবে সেই মন, বুদ্ধি আর তখন থাকে না। তিনি তখন 'ভোঁ' হয়ে যান। কারণ যত কিছু জানা সবই না জানার মধ্যে। মন-বুদ্ধিই সবকিছু জানে। জীব যা কিছু জানতে চায় সবই মনবুদ্ধির দ্বারা। জীব যদি ঈশ্বরকেও জানতে চায় তবে তার মনবুদ্ধির অস্তিত্ব প্রমাণ করে অর্থাৎ ইচ্ছা তার বর্তমান থাকে। কিন্তু শ্বাসপ্রশ্বাসের নির্বাণ অবস্থায় অর্থাৎ স্থির অবস্থায় মন বুদ্ধি না থাকায় ইচ্ছাও থাকে না, তখন কে কাকে জানবে? তাই যোগিরাজ বলছেন এই প্রকার ইচ্ছাতীত হওয়াটাই পুরুষার্থ এবং না হওয়াটাই অপুরুষার্থ। এই প্রকার পুরুষার্থে পৌঁছালে আর দুইতে পুনরাবর্তন হয় না। এই প্রকার বিশেষ স্থিতি প্রাপ্তি হলে প্রাণ ও মনের চাঞ্চল্য চলে যায় ও শান্ত হয়ে যোগী আত্মাতে নিমগ্ন হন। তখন যোগী কর্মের অতীতাবস্থায় বা ক্রিয়ার পরাবস্থায় শূন্য ব্রহ্মে অবস্থান করায় অজ হন। তখন তাঁর বন্ধনও নেই মোক্ষও নেই, কারণ মোক্ষ বোলবার কেউ নেই। সেখানে দুই না থাকায় ভয় নেই, তাই অভয়পদ।

———

"অব বড়া মজাসে বেকাম হয় সোই কাম হুয়া—যানে
কুছ নহি করনা এহি কাম হুয়া—বড়া আশ্চর্য্য কি
বাতেঁ ইসিমে হমেসা গরক রহনা চাহিএ" ॥ ৯ ॥

প্রকৃত কর্ম কাকে বলে এ বিষয়ে নানা মতভেদ আছে। কর্ম এবং অকর্ম এ বিষয়ে বহু পণ্ডিত বহু কথা বলেছেন। কিন্তু সবার ওপরে শাস্ত্র রচয়িতা মহাযোগিগণ যা বলেছেন তাকেই সাধারণ মানুষ অভ্রান্ত বলে মনে করে। পণ্ডিতগণ বিচার বুদ্ধি দ্বারায় অনেক কিছুই বলে থাকেন কিন্তু যোগিগণ যা বলেন তা তাঁদের প্রত্যক্ষ

অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান। এখানে যোগিরাজ বলছেন বড় আনন্দের সঙ্গে তিনি কর্মহীন হলেন এবং এই প্রকার কর্মহীন অবস্থায় থাকাই এখন তাঁর একমাত্র কাজ অর্থাৎ কর্মহীন অবস্থায় কিছু না করাই এখন তাঁর একমাত্র কাজ। তাহলে কর্মের তিনটে বিভাগ দেখা যায়—(১) কর্ম, (২) অকর্ম ও (৩) কর্মহীন বা বিকর্ম অর্থাৎ কর্মত্যাগরূপ অবস্থা অর্থাৎ নৈষ্কর্ম। কর্ম কাকে বলে? যা করা হয় তাই কর্ম অর্থাৎ জাগতিকভাবে যত প্রকার কাজ করা হয় তাকেই কর্ম বলে। অর্থ উপার্জনরূপ কর্ম, সংসার পালনরূপ কর্ম, অন্নসংস্থানরূপ, জীবনযাত্রা নির্বাহরূপ কর্ম এগুলিও কর্ম পদবাচ্য, আবার জপ, ব্রত, উপবাস, সংকীর্তন, সৎকর্ম, তীর্থভ্রমণ, পরোপকার, অতিথিসেবা, জীবে দয়া, এগুলিও কর্ম পদবাচ্য। এসব কর্ম সকলেই কিছু না কিছু করে থাকে কিন্তু তাদের আত্মসাক্ষাৎকার হয় না কেন? অথচ আত্মলাভই জীবের পরম লাভ। শ্রীভগবান্ বলেছেন "গহনা কর্মণো গতিঃ" (গীতা ৪।১৭)—কর্মের গতি দুর্জ্ঞেয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রকৃত কর্ম কি যা করলে আত্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায় তা বোঝা খুবই কঠিন। তাই শ্রীভগবান্ পুনরায় বলেছেন—

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তৎ তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ৪/১৬

অর্থাৎ কি কর্ম, কি অকর্ম এ বিষয়ে বিবেকীগণও মোহিত হন; অতএব যা জানলে তুমি অশুভ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কর্মে আসক্তি থেকে মুক্ত হবে সে কর্ম তোমাকে বলব।

এই জগৎ কর্মের ওপর নির্ভরশীল। সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী থেকে শুরু করে একটি ধূলিকণা পর্যন্ত সবাই কর্মে রত। প্রতিটি জীবও সদা কর্মে রত। কর্মহীন অবস্থায় এ জগৎ থাকে না, তখন অব্যক্তে লীন হয়ে যায়। আবার কর্মের আরম্ভে জগৎ সৃষ্টি হয়। তাই ভগবান্ বলেছেন ক্ষণকালের জন্যও যদি তিনি কর্ম ত্যাগ করেন তবে কিছুই থাকবে না। 'নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্চতে' অর্থাৎ নিশ্চল অবস্থাই ব্রহ্ম। অনিচ্ছায় ইচ্ছায় সেই অব্যক্ত ব্রহ্ম স্পন্দিত হলেই ব্যক্তাবস্থা, এই ব্যক্তাবস্থায় জগৎ সৃষ্টি। অতএব কর্মই জগতের নিয়ম। তাহলে সেটা কোন কর্ম? অতএব প্রথমে প্রকৃত কর্ম কি এবং অকর্মই বা কাকে বলে তা জানতে হবে। এই কর্ম এবং অকর্মের বিভাগকে জেনে যা সঠিক কর্ম তা যদি করা যায় তাহলে মানব জীবনের যা পরম কাম্য সেই আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করা সম্ভব। অতএব প্রথমে অকর্ম কাকে বলে তা দেখা যাক। যে কর্মের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার হয় না তাই অকর্ম এবং যে কর্মের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার হয় তাই প্রকৃত কর্ম। জগতে যত প্রকার কর্ম প্রচলিত আছে এবং যত প্রকার কর্ম সাধারণ মানুষ করে থাকে এবং তাতে যখন তাদের আত্মসাক্ষাৎকার হয় না তখন নিশ্চয়ই সেগুলি অকর্ম বলে গণ্য। অতএব প্রকৃত কর্ম কি এ বিষয়ে

যোগিরাজ বলছেন—"প্রাণায়ামে ব্রহ্মজ্ঞান হয়"। অতএব যোগিরাজের মতে প্রাণায়ামই একমাত্র কর্ম যার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। এটাই বিকর্ম অর্থাৎ বিশেষরূপ কর্ম। সকল প্রকার কর্ম ত্যাগ করলেও শ্বাস প্রশ্বাসরূপ কর্ম জীবের পক্ষে ত্যাগ করা অসম্ভব। জীব শরীরে এই শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ কর্ম যতক্ষণ চালু আছে ততক্ষণ তাকে কর্মহীন বলা যায় না। কিন্তু অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করতে থাকলে যখন শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিরুদ্ধ অবস্থা লাভ হয় তখনই বেকাম অর্থাৎ প্রকৃত কর্মহীন অবস্থা আসে। কারণ যখন শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিও রুদ্ধ হয় তখন কোনোপ্রকার কর্ম থাকা সম্ভব নয়। এই অবস্থায় হৃদস্পন্দনও স্তব্ধ হয়ে যায়। যোগিরাজ এই প্রকার বেকাম অর্থাৎ কর্মত্যাগরূপ অবস্থায় পৌঁছে বলছেন যে এই অবস্থায় থাকাই এখন তাঁর একমাত্র কাজ অর্থাৎ কিছু করা এবং না করা উভয়হীন অবস্থায় থাকাই এখন তাঁর একমাত্র কাজ। এই অবস্থাকেই ক্রিয়ার পরাবস্থা বা কর্মের অতীতাবস্থা বলে। এই প্রকার কর্মহীন অবস্থায় পৌঁছে যোগিরাজ আরো বলছেন যে এই অবস্থা এক বড় আশ্চর্য্যরকম অবস্থা, যে অবস্থায় সব সময় থাকা প্রয়োজন অর্থাৎ প্রাণকর্মরূপ কর্ম করে সকল প্রকার কর্মের অতীতে পৌঁছে অর্থাৎ—কর্মত্যাগ রূপ অবস্থায় পৌঁছে যে নিশ্চল অবস্থা সেই অবস্থায় সর্বদা থাকতে হবে। সাধারণ মানুষ এই প্রকার ক্রিয়ার পরাবস্থা বা কর্মের অতীতাবস্থা অর্থাৎ নিশ্চল অবস্থা কি তা জানে না, তাই এই প্রকার স্থিরাবস্থা তাদের নিকট অকর্ম; কিন্তু যোগীর কাছে এই অবস্থায় থাকাই প্রকৃত কর্ম। অতএব সাধারণ মানুষ জাগতিক যে সকল কর্মকে কর্ম মনে করে যোগিগণ তাকেই অকর্ম মনে করেন এবং সাধারণ মানুষ অজ্ঞতার দরুন যাকে অকম মনে করে সেই স্থিরাবস্থায় থাকাকেই যোগিগণ কর্ম মনে করেন। এ বিষয়ে শ্রীভগবান্ বলেছেন—

"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ গীতা ৪/১৮

অর্থাৎ যিনি কর্মের মধ্যে অকর্ম এবং অকর্মের মধ্যে কর্ম দেখেন, জনগণের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান্ এবং সকল প্রকার কর্মকারী হয়েও তিনি ব্রহ্মে সংলগ্ন থাকেন। কর্মের মধ্যে অকর্ম অর্থাৎ ফলাকাঙ্খাযুক্ত যত প্রকার জাগতিক কর্ম, যার দ্বারায় আত্মসাক্ষাৎকার সম্ভব নয় সেই সমস্ত কর্মকে যিনি অকর্ম বলে দেখেন এবং ফলাকাঙ্খারহিত নিষ্কাম যে প্রাণকর্ম, যা বাহ্যদৃষ্টিতে সাধারণের নিকট অকর্ম বলে মনে হয় অর্থাৎ যে কর্মের মাধ্যমে কর্মত্যাগরূপ অবস্থায় নিশ্চল ব্রহ্মে অবস্থান করা যায়, সেই অকর্মরূপ নিষ্কাম প্রাণকর্মকে যিনি কর্ম বলে দেখেন অর্থাৎ প্রাণকর্মই একমাত্র কর্ম এবং অপর সবই অকর্ম এই প্রকার যিনি জানেন তিনি মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্।

এই প্রকার বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জাগতিক সকল প্রকার কর্ম করেও ওই নিষ্কাম প্রাণ-কর্মের অতীতাবস্থায় স্থির ব্রহ্মে সদাযুক্ত হয়ে থাকেন এবং তখন তিনি অনাসক্তভাবে সকল কর্ম করে থাকেন। তাহলে কর্মত্যাগরূপ অবস্থা কখন লাভ হয়? অন্তর্মুখী প্রাণায়াম করতে করতে যখন নাসা পথে প্রাণের আগম-নিগমরূপ কর্মের স্থিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে যখন কর্মের অতীতাবস্থায় প্রাণের স্থিতি হয় তখনই প্রকৃত কর্মত্যাগরূপ অবস্থা হয়।

আত্মা চঞ্চল হলে প্রাণ। সেই স্থির প্রাণ চঞ্চল হয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসরূপে গতি প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে মুখ্য প্রাণ বায়ু চঞ্চল থাকায় ঊনপঞ্চাশ বায়ু দেহাভ্যন্তরে স্ব স্ব কার্যরূপে রত থাকে। যেমন কর্ণের বায়ু চালু থাকায় কর্ণস্থ যন্ত্র শ্রবণের কাজ করে, চক্ষুস্থ বায়ু চালু থাকায় চক্ষুস্থ যন্ত্র দর্শনরূপ কাজ করে। এই প্রকারে ঊনপঞ্চাশ বায়ু দেহাভ্যন্তরে আপন আপন কার্যে রত। কিন্তু এই ঊনপঞ্চাশ বায়ুর শাসক মুখ্য প্রাণবায়ু। অভ্যন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করতে থাকলে ক্রমে ক্রমে ঊনপঞ্চাশ বায়ু স্থির হয়ে মুখ্য প্রাণবায়ুতে মিলিত হয়। এই প্রকারে যখন একে একে স্থির হতে থাকে তখন স্পর্শ, ঘ্রাণ, শব্দ, দর্শন ইত্যাদিরূপ ইন্দ্রিয়গুলি স্থির হতে হতে সকলেই কার্যরহিত হয় এবং মুখ্য প্রাণবায়ুতে মিলিত হয়। যখন আটচল্লিশ বায়ু কার্যরহিত হয়ে মুখ্য প্রাণবায়ুতে মিলিত হয় তখন মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার ইত্যাদি সকলেই স্ব স্ব কার্যরহিত হওয়ায় প্রকৃত বেকাম অর্থাৎ কর্মত্যাগরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থাকেই প্রকৃত কর্মসন্ন্যাস বলে এবং একেই গীতার পরিভাষায় কর্ম-সন্ন্যাস যোগ বলে। এই প্রকার কর্মত্যাগ যাঁর হয় তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী অর্থাৎ ত্যাগী। কেউ যদি কোনোপ্রকার কর্ম করব না, সকল কর্ম পরিত্যাগ করলাম, এই ভেবে বসে থাকে, তাহলেও কর্মত্যাগ হয় না, কারণ সকল প্রকার বাহ্যকর্ম এই অবস্থায় ত্যাগ করলেও দেহাভ্যন্তরস্থ চিন্তা ইত্যাদি সকল কর্মই চালু থাকে। কিন্তু অভ্যন্তরমুখী প্রাণকর্ম দ্বারা আটচল্লিশ বায়ুকে স্থির করে মুখ্য প্রাণবায়ুতে যুক্ত করতে পারলে বাহ্য এবং অভ্যন্তর সকল কর্মই নিরুদ্ধ হয়ে মুখ্য প্রাণবায়ুতে মিলিত হয়। এটাই প্রকৃত কর্মসন্ন্যাসরূপ বা ত্যাগরূপ অবস্থা। তাই যোগিরাজ পুনরায় বলেছেন—"বিলকুল বাহরকা শ্বাসা বন্ধ হোতা হয়—ধন্য ভাগ উসকা জিসকে ইহ হোয়।" অর্থাৎ বাইরের আগম নিগমরূপ শ্বাসপ্রশ্বাস যা নাসাপথে সর্বদা চলছে তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। এমন অবস্থা যার হয় তার ধন্যভাগ্য অর্থাৎ এই প্রকার স্থায়ী 'কেবল কুম্ভক' অবস্থায় সর্বদার জন্য থাকা চাই। বহু সৌভাগ্যে এই অবস্থা লাভ করা যায়। এই প্রকার কেবল কুম্ভকরূপ অবস্থায় পৌঁছে অর্থাৎ সকল কর্মের অতীতে পৌঁছে পুনরায় লিখেছেন—"আজ অভয় সব কর্মমে—অকর্ম যো সোই মেরা কর্ম হয়"—এখন কোনো

কর্মেই আর তাঁর ভয় নেই, সকল কর্মে এখন তাঁর অভয় অবস্থা এবং কর্মের অতীতাবস্থা বা ক্রিয়ার পরাবস্থায় যে কর্মত্যাগরূপ অবস্থা, যা যোগী ব্যতীত অপরের কাছে অকর্ম বলে গণ্য সেই অবস্থায় থাকাই এখন তাঁর একমাত্র কাজ। এই অবস্থায় জাগতিক সকল কর্ম করেও এখন তাঁর অভয় অবস্থা। জাগতিক সকল কর্ম ফল উৎপাদন করে, এই অবস্থায় ভয় বর্তমান থাকে। কিন্তু কর্মের অতীতাবস্থায় অবস্থান করে যদি জাগতিক সকল কর্ম করা যায় তখন কর্ম আর ফল উৎপাদন করতে পারে না; তাই তখন সকল কর্মে নিস্পৃহ হওয়ায় আর কোন কর্মে ভয় থাকে না। যেমন পদ্মপাতা জলকে ধরে রাখারূপ কর্ম করেও জল দ্বারা আশ্রিত হয় না, তেমনি যে যোগী কর্মের অতীতাবস্থায় অবস্থান করেন তিনি জাগতিক সকল কর্ম করলেও কর্মের ফল দ্বারা লিপ্ত হন না। যোগিরাজ এই প্রকার কর্মত্যাগরূপ অবস্থায় পৌঁছে বলছেন আজ কোনো কর্মেই তাঁর আর ভয় নেই এবং এই প্রকার যে অকর্মরূপ অবস্থা সেই অবস্থায় থাকাই এখন তাঁর কাজ। এ বিষয়ে যোগিরাজ আরো বলেছেন "তিন কোনা আউর ৪ লকির—তিন কোনা য়ানে তিনো নাড়ি ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না—চার লকির য়ানে ক্ষিতি অপ তেজ মরুত—ইহ সবকো ছোড়কে শূন্যমে ধ্যান লগানা—এহি আসল কাম হয়—আজ তো বিলকুল খাসা গয়া—বড়া ভারি নেসা হুয়া"—তিন কোনা এবং চার লকির অর্থাৎ তিন কোনা অর্থে—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন নাড়ী এবং চার লকির অর্থে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুত। এই তিন নাড়ী এবং চার মহাভূত তত্ত্বসকলকে অতিক্রম করে পঞ্চম মহাভূতরূপী মহাশূন্যে অর্থাৎ শূন্যের ভেতর যে শূন্য তাতে ধ্যান করা অর্থাৎ সেই মহাশূন্যে যুক্ত হয়ে থাকা, যেখানে যুক্ত হয়ে থাকলে আর কোনো কর্ম নেই সেই অবস্থায় থাকাই আসল কাজ। প্রাণকর্ম করতে করতে আজ বাহ্য শ্বাসের গতি সম্পূর্ণরূপে থেমে গিয়ে যখন এই প্রকার কেবল কুম্ভক অবস্থা প্রাপ্ত হলাম তখন এক প্রকার গাঢ় নেশা হল। এই প্রকার নেশায় যখন যোগী থাকেন তখন তাঁর সকল প্রকার কর্মভ্রম চলে যায়।

"পুরা সাসমে পিয়া আপনা খোঁজ করে ভাই।
জন্ম জন্মকা সংসার ভুমহারা সবে ছুট জাই"॥ ১০ ॥

এক গেলাস জল পান করলে তা যেমন পেটের ভেতর চলে যাওয়ায় আর বাইরে দেখা যায় না, তেমনি এই যে আগম-নিগমরূপ শ্বাস-প্রশ্বাস যা সর্বদা জীব শরীরে বহির্মুখী ভাবে নাসা পথে চলছে তাকে সম্পূর্ণরূপে পান করতে হবে অর্থাৎ প্রাণ-কর্মের দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসের বহির্মুখী গতিকে সম্পূর্ণরূপে থামিয়ে ফেলতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বহির্মুখী থাকায় জীব বাহ্য জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং এই শ্বাস-প্রশ্বাস বহির্মুখী কর্ম করায় বলে জীবও বাহ্য কর্মে রত থাকতে বাধ্য হয়। এই বহির্মুখী শ্বাস-প্রশ্বাসই জীবকে জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে রেখেছে, তাই জীব জগতের বস্তুতে আকৃষ্ট হয়। এই আকর্ষণই জীবকে মায়া, মোহ, লোভ ইত্যাদিতে বন্ধন করায়। তাই জীব বন্ধনমুক্ত হতে পারে না বলেই এই সংসারে বারবার যাতায়াত করে। শ্বাস-প্রশ্বাসের বহির্মুখী গতি থাকে বলে জাগতিক বস্তুতে আকৃষ্ট হয় এবং পুনরায় দেহ লাভের সঙ্গে সঙ্গে পুনঃ গতি প্রাপ্ত হয়। কিছুতেই সে গতিকে অতিক্রম করতে পারে না। গতিই জীবন। এই গতি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ জীবের সংসারে আসা যাওয়ারূপ কর্ম থাকবেই। অতএব এই ভবসংসারে আসা যাওয়া যদি বন্ধ করতে হয় তবে প্রথমে গতিকে থামাতে হবে, গতিরুদ্ধাবস্থা লাভ করতে হবে। এই ভব সংসারে আসা যাওয়া যতদিন আছে ততদিন সংসারও আছে, সুখ দুঃখও আছে। তাই যোগিরাজ বলছেন সর্বাগ্রে প্রাণকর্মের দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসের এই বহির্মুখী গতিকে পান কর অর্থাৎ গতিরুদ্ধ অবস্থা লাভ কর এবং ওই অবস্থায় অন্তরদেবতাকে পাবে। অধিক পরিমাণে উত্তম প্রাণকর্ম করতে থাকলে এই প্রকার গতিরুদ্ধাবস্থা অবশ্যই লাভ করা যায় এবং যখন এই অবস্থা লাভ করবে তখন আর কোন প্রকার গতি না থাকায় এই ভবসংসারে আর আসতেও হবে না যেতেও হবে না। কারণ এই এই ভবসংসারে আসা যাওয়াটাও গতি। যখন আর গতি (motion বা vibration) নেই তখন এই ভবসংসারে আর কে আসবে? কেই বা যাবে? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই গতির ওপর নির্ভরশীল, গতি আছে বলেই সবকিছুর উৎপত্তি। যখন গতি নেই, তখন কিছুই নেই। সেই গতিহীন নিশ্চল অবস্থাই ব্রহ্ম। সকল গতি সেই ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন, কিন্তু ব্রহ্ম সম্পূর্ণ গতিহীন। গতিই কর্ম, আবার ওলটালে গতিহীন অবস্থায় কর্ম নেই এবং কর্ম ও গতি না থাকায় পুনরায় ভব সংসারে আসা যাওয়া নেই। গতিই দ্বৈত এবং গতিহীন অবস্থাই অদ্বৈত। তাই যোগিরাজ বলছেন প্রাণ-কর্মের মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাসের বহির্মুখী গতিকে সম্পূর্ণরূপে পান কর, তাহলেই জন্ম

জন্মান্তরের সংসার বাসনা ঘুচে যাবে এবং বার বার এই ভবসংসারে আসা যাওয়ারূপ গতি বা প্রবাহ থেমে যাবে। এই গতিকেই লক্ষ্য করে যোগিরাজ পুনরায় বলেছেন—"বেদমমে যো দম হয় সোই অসল দম হয়"। বেদম অর্থাৎ দমবিহীন অবস্থা। একটা কলের পুতুলকে দম দিয়ে ছেড়ে দিলে যতক্ষণ তাতে দম থাকে ততক্ষণ চলতে থাকে। যখন দম শেষ হয়ে যায় তখন থেমে যায়। তেমনি জীব শরীরে যতক্ষণ শ্বাসপ্রশ্বাস চালু আছে ততক্ষণই জীব জীবিত থাকে এবং যখন শ্বাসের পুঁজি শেষ হয়ে যায় তখন জীব মরে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসকে স্বেচ্ছাকৃত ভাবে আটকিয়ে না রেখে অন্তর্মুখী প্রাণ-কর্ম করতে থাকলে আপনা হতে যখন কেবল কুম্ভক অবস্থা লাভ হয় অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিহীন অবস্থা হয় তাই বেদম; তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের বহির্মুখী গতি সম্পূর্ণরূপে নিরোধ হয়ে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের এই নিরোধ বা গতিহীন অবস্থাই ক্রিয়ার পরাবস্থা বা কর্মের অতীতাবস্থা। এই অবস্থা লাভ প্রাণকর্ম সাপেক্ষ। সেই বেদমই অর্থাৎ দমবিহীন অবস্থাই বা শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিহীন অবস্থাই আসল দম। এই প্রকার যে ক্রিয়ার পরাবস্থা শাস্ত্রীয় মতে তাকে নির্বিকল্প সমাধি বলা হয়। তখন যোগী সকল প্রকার কল্পনার অতীতে গমন করায় সদা স্থির ব্রহ্মে যুক্ত থাকেন, যাকে অদ্বৈত অবস্থা বলে। যোগী পুনরায় যখন সেই অবস্থা থেকে প্রথম ব্যুত্থিত হন তখন কূটস্থে স্থির বিন্দুরূপ ধ্রুবতারায় সংবিত্তি হওয়ায় পুনরায় কল্পনা জেগে ওঠে, তাই তাকে সবিকল্প সমাধি বলে। এই অবস্থায় দেখাদেখি থাকায় দ্বৈত, কিন্তু পূর্বোক্ত অবস্থা অদ্বৈত। সেই অদ্বৈত অবস্থার কথা বলতে গিয়ে যোগিরাজ পুনরায় বলেছেন—"দম পর দম অল্লা—দমকে পরে যো দম হয় সো অল্লা মানে স্থির ঘর।" বহির্মুখী শ্বাস-প্রশ্বাসের অতীতে যে বেদম তাই, আল্লা অর্থাৎ জাগতিক গতিসম্পন্ন যে শ্বাস-প্রশ্বাস তার অতীতে ক্রিয়ার পরাবস্থায় যে স্থির দম তাই আল্লা। এ বিষয়ে তিনি আরও বলেছেন—"খোদা মানে খোদ—আ জব আপনে সে আতা হয়। অল্লা—আলা বড়া যো সবসে বড়া।"—যিনি খোদ বা মূল তিনিই খোদা অর্থাৎ প্রাণকর্ম করতে করতে যে স্থিরাবস্থার উদয় হয় সেই স্থিরাবস্থাই সবকিছুর মূল বা উৎপত্তিস্থল তাই খোদা। সেই স্থিরাবস্থারূপ মহাকাশ সর্বব্যাপী এবং সবকিছুর উৎপত্তিস্থল হওয়ায় সর্ববৃহৎ, তিনিই আল্লা। সেই স্থির অবস্থার চেয়ে মহান্ আর কেউ নেই। প্রাণকর্ম করতে করতে সেই স্থিরাবস্থার উদয় আপনা থেকে হয়, সেই অবস্থাই আদিপুরুষ ব্রহ্ম, তিনিই খোদা বা স্বয়ং বা মূল। এই খোদা বা মূলে পৌঁছাতে গেলে অর্থাৎ গতিহীন অবস্থায় পৌঁছাতে গেলে গতিকে ধরেই যেতে হবে; গতিকে বাদ দিয়ে গতিহীন অবস্থায় পৌঁছান অসম্ভব। তাই যোগিরাজ বলেছেন—ক্রিয়াই একমাত্র কর্ম, অপর সবই অকর্ম। অর্থাৎ অন্তর্মুখী প্রাণকর্মই একমাত্র কর্ম, আর সবই অকর্ম।

অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম ব্যতীত মানুষ যত প্রকার কর্ম ক'রে থাকে সবই অকর্ম। অকর্ম বলেই আত্মসাক্ষাৎকার হয় না, ব্রহ্মে লীন হয় না বা উৎসস্থলে পৌঁছাতে পারে না। আবার যতক্ষণ উৎসস্থলে পৌঁছাতে না পারা যায় ততক্ষণ জন্ম-মৃত্যু অনিবার্য। তাই যোগপথ শিক্ষা দেয় কেমন করে গতিহীন হতে হয়। এই জন্যই যোগপথ বিজ্ঞান সম্মত এবং যোগপথ বিজ্ঞান সম্মত হওয়ায় কোন প্রকার কল্পনা বা ভাবাবেগের স্থান নেই। এই যোগপথ সর্বকালের, সর্বধর্মের, সর্বসম্প্রদায়ের ও সর্ববর্ণের মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই যোগী কখনও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে না, ঈশ্বরকে পিতা, মাতা, সখা, প্রভু, ভগবান্ ইত্যাদি বলে বা নাম ধরে ডাকে না। যোগী কখনও ঈশ্বরের জন্য কাঁদে না। যোগী হলেন আসল বীর। যোগী সেই নিশ্চল ব্রহ্মে অর্থাৎ উৎসস্থলে কর্মের মাধ্যমেই পৌঁছাতে চায়। কারণ যোগী জানেন তাঁর যে বর্তমান চঞ্চল অবস্থা এই অবস্থার নাশ করে স্থির হতে হবে, আর স্থির হলে তিনি নিজেই ব্রহ্ম হয়ে যাবেন। তাই যোগী ঈশ্বরকে পেতে চান না, নিজেই ব্রহ্ম হয়ে যান। ঈশ্বর অর্থাৎ ঈ=শক্তি, যা চক্ষুতে আছে। শ্বর=শ্বাস। অর্থাৎ শ্বাসরূপী বাণ চালনা করতে করতে অর্থাৎ প্রাণায়াম করতে করতে যে আত্মশক্তির প্রকাশ হয়, তিনিই ঈশ্বর। সেই ঈশ্বর সকল জীবে ও সকল বস্তুতে বর্তমান। অধিক এবং উত্তমরূপে প্রাণকর্ম করতে করতে যখন দেহস্থ ৪৯ বায়ু স্থির হয়ে মুখ্য প্রাণবায়ুতে মিলিত হয়, তখন কূটস্থে স্থিতি হওয়ায় যে বৃহৎ-কূটস্থ দর্শন হয় অর্থাৎ যে মহান্ আত্মসূর্য দর্শন হয়, তিনিই ঈশ্বর। সেই আত্মসূর্যই সর্বশক্তিমান, তাই জগতের সবকিছু সেখান হতেই উৎপত্তি হয় ও সেখানেই লয় হয় অর্থাৎ সেখানেই মিলে যায়। সমস্ত তরঙ্গও সেখান থেকেই আসে এবং সেখানেই মিলে যায়।

"চার বেদ ও ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ বিরাজমান
যোনিকে ভিতর দেখা।" ॥ ১১ ॥

ব্রহ্ম সদা নিশ্চল। সেই নিশ্চল ব্রহ্মের যে প্রথম চঞ্চলতা তাই আদিশক্তি অর্থাৎ সকল শক্তির উৎসস্থল এই প্রথম চঞ্চলতা। এখান থেকেই শুরু হল দ্বৈতাবস্থা। কিন্তু আবার যখন পরবর্তী সকল চঞ্চলতার অবসানে, এমনকি প্রথম প্রকাশরূপ যে আদি চঞ্চলতা তাও যখন নেই, সব যখন পুনরায় নিশ্চল ব্রহ্মে মিশে গেল তখন অদ্বৈত। যোগী যখন প্রাণকর্ম করতে করতে কূটস্থে স্থায়ী স্থিতিলাভ করেন তখন তিনি এক ত্রিকোণ দর্শন করেন। কূটস্থের অন্তর্গত সেই ত্রিকোণই মহদ্ব্রহ্মরূপী মাতৃযোনিরূপা আদ্যাশক্তি মহামায়া। তাই যোগিরাজ

বলেছেন—'যোনিরূপা আদ্যাশক্তি দেখা'। এই যোনি হতেই চঞ্চলতার তারতম্যে সবকিছুর উৎপত্তি হয়। ত্রিকোণাকৃতি এই ব্রহ্ম যোনি ভয়ঙ্কর তেজপূর্ণা। তাই যোগিরাজ কখনও বলেছেন—'জ্যোতির্ম্ময় যোনি দেখা।' আবার কখনও বলেছেন—'ত্রিকোণ তেজ রূপকি বলিহারি জাই।' এই ব্রহ্মযোনি সম্বন্ধে গীতায় (১৪/৩-৪) শ্রীভগবান্ বলেছেন হে ভারত, আমার যে মহান্ সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ ব্যাপক প্রকৃতিরূপ অবস্থা আছে, সেই মহদ্ব্রহ্মরূপী প্রকৃতি অবস্থাই আমার যোনিস্বরূপ, কারণ ওই অবস্থা হতেই সব কিছুর উৎপত্তি হয়। জগতবিস্তারের হেতু স্বরূপ চিদাভাস ওতেই আমি প্রথম ক্ষেপণ করি, কারণ ওই অবস্থাই আমার প্রথম চঞ্চলতা এবং ওই স্থান হতেই চঞ্চলা গতি প্রাপ্ত হয়ে নানা মূর্তির ব্যক্তভাব হয়। কূটস্থের অন্তর্গত ওই স্থান হতেই অজপার গতি বিস্তার হয়। প্রাণরূপী আত্মা ওই গর্ভাধান স্থানে অর্থাৎ ওই ত্রিকোণ মধ্যে অণুস্বরূপে বা বিন্দুরূপে অবস্থিত হয়ে পরে ওই বিন্দুর ক্রমবিস্তাররূপে অবয়ব বিশিষ্ট হন। এইরূপে ওই মহদ্ব্রহ্মরূপী যোনি হতে সকল ভূতের উৎপত্তি হয় এবং আরো অধিক চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ায় নানা যোনি উৎপন্ন হয় এবং সেই সব যোনি হতে নানা মূর্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু সকল উৎপত্তির মূল ওই মহদ্ব্রহ্মরূপী যোনি, তাতেই তিনি কর্তারূপে বিদ্যমান। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এই সব নানা যোনি হতে যা কিছু উৎপন্ন হয় তা সবই বিভক্ত, কারণ ওই নানা যোনি বিভক্ত। কিন্তু অবিভক্তরূপ ব্রহ্মই মহদ্যোনি, তাই তিনিই মাতৃস্থানীয়া। আবার আমিই পিতা, কারণ ওই ত্রিকোণ মধ্যে সূক্ষ্মরূপে অনুস্বরূপে আমিই উপস্থিত থাকি, তাই সবকিছুর মধ্যে আমিই থাকায় আমিই পিতা। এই প্রকারে আমিই আপনাতে আপনি থাকি। আবার ওই বিন্দুর বিস্তাররূপে অর্থাৎ অধিক চঞ্চলতার মাধ্যমে আমারই বিস্তাররূপে কূটস্থের রূপান্তরে আমিই নানামূর্তি প্রকাশ করি। এই প্রকারে পিতাও আমি, মাতাও আমি আবার আমিই পুত্ররূপে উৎপন্ন হই অর্থাৎ পিতা মাতা পুত্র সবই আমি। এ সবই আমার চঞ্চলতার প্রকারভেদ মাত্র, সবার ভেতর এই প্রকারে স্থিররূপে আমিই অবস্থিত।

অতএব যতকিছু রূপ দেখা যায় সবই আমার ওই মহদ্ব্রহ্মরূপী মাতৃযোনিরূপা আদিশক্তি হতে অর্থাৎ ওই প্রথম চঞ্চলতা হতে জাত, যা কূটস্থের অন্তর্গতে ত্রিকোণ মধ্যে অবস্থিত। তাই যোগিরাজ সেই আদি শক্তি ত্রিকোণ যোনির মধ্যে চার বেদ এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ বিরাজমান দেখতে পেলেন। কারণ বিভক্তরূপী চার বেদ এবং বিভক্তরূপী সকল দেবতা ওই মহদ্ব্রহ্মরূপী মাতৃযোনিরূপা আদ্যাশক্তি ত্রিকোণ হতেই উৎপন্ন হন। স্থির ব্রহ্মের এই যে প্রথম চঞ্চলতা, যাকে মাতৃযোনি বলা হয়, এখান হতেই সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাব হয় এবং তারপর ক্রমান্বয়ে অধিক চঞ্চলতায় রজ এবং

তমগুণের প্রাদুর্ভাব হয়। এই সত্ত্বগুণের আধিক্য হেতুই বিভক্ত বেদ অর্থাৎ বিভক্ত জ্ঞান এবং সেই সব বিভক্ত জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল দেখা যায়। বেদ অর্থে জ্ঞান। এই জ্ঞান বা বেদ মূলতঃ এক, সেখানে বিভাগ নেই। তাই যোগিরাজ বলেছেন—"আপনাহি স্বরূপ নারায়ণকা দেখা। এহি আপনা রূপ হয় ফির এহি নিরাকার ওঁকার হয়। ওহি ওঁকার আদি বেদ হয়"। আপনস্বরূপ নারায়ণকে দেখলাম অর্থাৎ নারায়ণ এবং আমি অভিন্ন। এই অভিন্নতাই আমার রূপ এবং এই অভিন্নতাই নিরাকার অনাদি ওঁকার। এই অভিন্ন ওঁকারই আদি বেদ, মূলবেদ বা মূলজ্ঞান। এই মূলজ্ঞান একের জ্ঞান এবং নিরাকারের জ্ঞান, তখন আর দুই বলার কেউ থাকে না। এই একের জ্ঞান চঞ্চলতা প্রযুক্ত যখন ভেদজ্ঞানে রূপান্তরিত হয় তখনই চারবেদ উৎপন্ন হয়। এই ভেদজ্ঞান গুণাতীত নয় কিন্তু একের জ্ঞান গুণাতীত। তাই বলা হয় মূলবেদ এক অর্থাৎ আত্মজ্ঞান এক। এই মূল আত্মজ্ঞান আদি হওয়ায় কখনও উৎপন্ন হন না, কিন্তু ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হয়। অতএব যা নিজস্বরূপ তাই মূল আত্মজ্ঞান, আদি বেদ, নিরাকার ওঁকার এবং নারায়ণ। এই নিরাকার একের জ্ঞানই জ্ঞান এবং সাকাররূপী দ্বৈতের জ্ঞানই অজ্ঞান।

যোগী যখন কূটস্থে মাতৃযোনিরূপা ত্রিকোণে অবস্থান করেন তখন তাঁর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ এই প্রধান তিনগুণের অন্তর্গত তিন দেবতা আপনা হতেই দর্শন হয়। এই মহদ্‌মাতৃযোনি হতেই তিনগুণ এবং বিভক্ত চার বেদ উৎপন্ন হয়। এই মহদ্‌মাতৃযোনিই সবকিছুর বিভাগকর্তা; তাই তিনিই ব্যাসদেব। দেব, দিব্ শব্দ হতে জাত। দিব্ শব্দে আকাশ। এই মহদ্‌মাতৃযোনি আকাশস্বরূপা, তাই এই মহদাকাশে অবস্থিত যে প্রধান তিনগুণ সেই তিনগুণের অধিষ্ঠাত্রী শক্তিই তিন দেবতা। তাই যোগী যখন মহদাকাশরূপ সবকিছুর উৎপত্তিস্থলভূতা ত্রিকোণ মাতৃযোনিতে উপনীত হন তখন সেখান থেকে জাত যে বিভক্ত জ্ঞানরূপা চার বেদ এবং তিনগুণরূপী তিনদেবতা আপনা হতেই দর্শিত হয়। যতক্ষণ যোগী এই বিভক্ত দর্শন করেন ততক্ষণও তিনি একে উপনীত হতে পারেন নি। আরো অধিক আত্মকর্ম করতে করতে যখন যোগীর এই ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয় অর্থাৎ যখন আর তিন দেবতা ও চার বেদরূপ বিভেদজ্ঞান রহিত হয়ে এক নিরাকার ওঁকারে উপনীত হন তখনই তাঁর একের জ্ঞান হয়। এই একের জ্ঞানই প্রকৃত আত্মজ্ঞান এবং আপনস্বরূপ জ্ঞান। এই একের জ্ঞানই যোগীর কাম্য। তাই যোগিরাজ বলেছেন—'আপনরূপ আসল। তুম হি তুম হো তুম ছোড়ায় দুসরা নহি তব লয় স্পর্ষ'। তুমিই সেই আদি তুমি কিন্তু তুমি বর্তমানে নিজেকে ভুলে গেছ। সেই আদি তুমি ছাড়া দ্বিতীয় আর কিছু নেই, আত্মকর্ম করতে করতে যখন এই অবস্থা হয় তখনই লয় স্পর্শ হোলো। তাই তিনি

আরো বলেছেন 'ওঁকার আত্মারাম ওহি রাম হয়'। ওই নিরাকার ওঁকারই আত্মারাম এবং ওই আত্মারামই প্রকৃত রাম। এই রাম অযোধ্যাবাসী। অযোধ্যা— অপরাজেয়া অর্থাৎ যার প্রতিযোদ্ধা কেউ নেই। এই স্থির আত্মারাম অবস্থায় দুই না থাকায় অর্থাৎ দ্বৈতের অবসানে প্রতিযোদ্ধা কেউ থাকে না। এই অবস্থাই রাম পদবাচ্য। এই রামের রঙ নীল। আকাশের কোনো রঙ না থাকায় নীলবর্ণ দেখায়। এই আত্মারাম নিরাকার নিরবয়ব আকাশবৎ। এই রামের হাতে তীর ধনুক। শ্বাস তীর, দেহ ধনুক। এই দেহে অবস্থিত যে শ্বাসরূপী তীর তাকে যিনি পরিচালিত করেন অর্থাৎ যে মূল শক্তি বা আদিশক্তি, যেখান থেকে শ্বাসের উৎপত্তি, সেই নিরাকার আকাশবৎ অবস্থাই ধনুর্ধারী রাম। তাই যোগিরাজ বলেছেন—'এই শরীরই ওঁকার, এই শরীর হইতে সকল উৎপত্তি'। এই শরীররূপ ক্ষেত্রকে অন্তর্মুখী শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা কর্ষণ ক্রিয়া করতে থাকলে অর্থাৎ আত্মকর্ম করতে থাকলে যে স্থির নিরাকার আকাশবৎ অবস্থার উদয় হয় তিনিই রাম। এই রামজায়া জানকী, যিনি হালকর্ষণ করতে করতে ক্ষেত্র হতে উৎপন্না এবং ক্ষেত্রতেই পুনরায় লয় হলেন। অর্থাৎ যোগী এই দেহরূপ ক্ষেত্রে আত্মকর্ম করতে করতে যখন কূটস্থের অন্তর্গতে ত্রিকোণ মধ্যে মূল আদি শক্তিতে উপনীত হন, সেই শক্তিই জানকী। আবার পরিশেষে যখন ওই মূলাশক্তি একে মিশে যান তখন জানকী ওই ক্ষেত্রে লয়প্রাপ্ত হওয়ায় কেবল রামই বর্তমান থাকেন।

"রাতদিন জব রোধ শ্বাসা কা হোগা তব রাম নাম
কো পাওএগা, আউর সব সিদ্ধ হোগা" ॥ ১২ ॥

সাধারণ মানুষ নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে রামনাম বা সংকীর্তন করে থাকেন। এই সংকীর্তন দলবদ্ধভাবে অথবা একাকীও করা হয়। অথবা কেউ কেউ মালা, কর ইত্যাদির মাধ্যমে মনে মনে রামনাম অথবা কোনো ইষ্টমন্ত্র জপ করে থাকেন। ঈশ্বর সাধনার এই সকল বিধিগুলো বর্তমানে গুরুগণ দিয়ে থাকেন এবং সকলের ধারণা এতেই মোক্ষলাভ হবে। কিন্তু যোগিরাজের মতে এগুলি মন্দের ভাল অর্থাৎ কিছু না করার চেয়ে কিছু করা ভাল। যার মন একেবারেই ঈশ্বরমুখী নয় অথবা সামান্যতম ঈশ্বরমুখী হওয়ায় যারা ঈশ্বরের পরিবর্তে তাঁর ঐশ্বর্যকে পেতে চায় এবং ঐশ্বর্য পেলেই সব পাওয়া হোলো এই রকম যাদের ধারণা, যারা আত্মসাধন কি জানে না অথবা পেতেও চায় না, আত্মসাধন বিষয়ে যাদের সামান্যতমও আগ্রহ বা জ্ঞানও নেই এই ধরণের সাধারণ মানুষের পক্ষে এগুলি করণীয়। চিৎকার করে যে নামকীর্তন তা

গৌণকীর্তন। এই গৌণকীর্তনের সঙ্গে যদি সুর তাল বাদ্য ইত্যাদি না থাকত তা হলে কেউ করত না। চিৎকার করে নামকীর্তন করলে অথবা বাইরে খুঁজলে যে আত্মারামকে পাওয়া যায় না সে বিষয়ে মহাত্মা কবীর দৃঢ়ভাবে বলেছেন—

"কবির আখড়িয়া ঝাঁই পড়ি, পন্থ নিহারি নিহারি।
জিভড়ি আঁছালা পড়ে, রাম পুকারি পুকারি॥"

উপমা স্বরূপ কবীরদাস বলছেন নানাপ্রকার রাস্তা দেখতে দেখতে দিগ্ভ্রম হয়ে গেছে, আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না ; তেমনি উচ্চৈস্বরে রাম রাম বলে চিৎকার করতে করতে জিভে ফেনা পড়ল অর্থাৎ কাজের কাজ কিছুই হোলো না। তাই যোগিরাজ বলছেন চিৎকার করে রাম নাম করলে কি হবে? এই প্রকারের যে গৌণ সংকীর্তন তা করতে হলে জিহ্বা, ওষ্ঠ, মন ইত্যাদিব প্রযোজন। এগুলি সবই ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সমস্ত কর্ম করা হয় তা কখনই ইন্দ্রিয়াতীত বা গুণাতীত হতে পারে না, অথচ ঈশ্বর ত্রিগুণাতীত। তাই তিনি বলছেন যখন আত্মকর্ম করতে করতে দীর্ঘ সময়ের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসেব বহির্গতি রোধ হয়ে যাবে তখনই প্রকৃত রাম-নামকে পাবে অর্থাৎ বামনাম যে কি তখনই জানতে পাববে এবং সিদ্ধ ও মুক্ত অবস্থা লাভ করবে। জীব বাইরের শব্দকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শোনে কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলেব শব্দ শুনতে পায় না, কারণ সেই অন্তস্তলে ইন্দ্রিয়ের প্রবেশ করবার সাধ্য নেই। এই অন্তস্তলের শব্দ হোলো অনাহত বা ওঁকাব ধ্বনি যা জীবহৃদয়ে সর্বদাই হচ্ছে ; কিন্তু আশ্চর্যেব বিষয় সেই ধ্বনির দিকে কারোর লক্ষ্য নেই। এই বায়ুক্রিয়ারূপ আত্মকর্ম করতে করতে যখন আটচল্লিশ বায়ু স্থির হয়ে মুখ্য প্রাণ বায়ুতে মিলে যাবে এবং যখন সবকিছু স্থির হবে তখন সেই আত্মারামের নাম-প্রবাহ বা Sound current-কে ধরতে পারবে এবং শুনতে পাবে। তখনই প্রকৃত নামসংকীর্তন হবে এবং এটাই মুখ্য নাম-সংকীর্তন। যোগিরাজের মতে মুখে চিৎকার করবার প্রযোজন নেই। আত্মকর্ম করতে করতে দীর্ঘ সময়ের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের বহির্গতি রোধ হয়ে কেবল-কুম্ভক অবস্থা প্রাপ্ত হবে তখন আপনা হতেই রামনামকে পাবে অর্থাৎ আত্মারামকে পাবে এবং তখনই সিদ্ধ ও মুক্ত অবস্থা লাভ করবে। রাম অর্থে আত্মারাম। রা শব্দে বিশ্ব, ম শব্দে ঈশ্বর অর্থাৎ যে অবস্থায় সকলে আত্মাব সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে রমন করে বা আনন্দানুভব করে সেই অবস্থাই রাম অর্থাৎ সুষুম্নায় যে প্রাণবায়ু রমন করে তিনিই রাম। রাম শব্দ উপাধি মাত্র। রমার সহিত অর্থাৎ আদ্যাপ্রকৃতির সহিত অর্থাৎ চঞ্চলপ্রাণের সহিত যিনি সদা রমন করেন তিনিই রাম অর্থাৎ পুরুষ প্রধান স্থিরপ্রাণরূপ আত্মারাম। চঞ্চল প্রাণই আদ্যাপ্রকৃতি, এই চঞ্চল প্রাণের উৎসস্থল স্থিরপ্রাণরূপ আত্মারাম। চঞ্চল প্রাণই রমা বা লক্ষ্মী বা সীতা তাই এই চঞ্চল প্রাণরূপী সীতা স্থিরপ্রাণরূপ পুরুষ

প্রধান আত্মারামে অবস্থিত। ঈশ্বর, ঈ—শক্তি, যা চক্ষুতে আছে। শ্বর—শ্বাস। অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসকে চালনা করতে করতে অর্থাৎ প্রাণায়াম করতে করতে যে আত্মশক্তির উদয় হয় অর্থাৎ কূটস্থে সহস্রসূর্যসম যে মহান্ আত্মজ্যোতির দর্শন হয়, যিনি সকল শক্তির শক্তি, তিনিই ঈশ্বর অর্থাৎ স্থিরপ্রাণ। হরি অর্থাৎ যে অবস্থায় গেলে সবকিছু হরণ হয়, যেখানে কোনো প্রকার ইন্দ্রিয়সঙ্গ থাকে না সেই নিঃসঙ্গ অবস্থাই হরি। প্রাণ স্থির হলে অর্থাৎ প্রাণের আগম-নিগমরূপ চঞ্চল অবস্থার অবসানে সবকিছু হরণ হয়ে যায়, জীবের জীবভাব ঘুচে যায়, সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয়সঙ্গ বর্জিত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই স্থির অবস্থাই হরি।

দুস্তর মরুভূমি অতিক্রমকারী পথিক ক্লান্ত, অবসন্ন, পিপাসার্ত। পৃথিবীর কোন ধন দৌলতেই তার কোনো প্রয়োজন নেই, সে চায় কেবল একটু জল। তাই সে সামনে মরীচিকা দেখে জল পাবার আশায় ছুটে যায় এবং বিফল মনোরথ হয়ে আবার জলের সন্ধান করে। এইভাবে একটু জলের আশায় ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে প্রাণত্যাগ করে। এইরূপ সংসাররূপ মরুভূমিতে সকল মানুষই পিপাসার্ত। সকলেই পরিত্রাণ পেতে চায়, কিন্তু কেমন করে পাবে, কোথায় পাবে, কি প্রকারে সে সংসাররূপ মরুভূমি অতিক্রম করতে পারবে তার অন্বেষণ করতে করতে দিগ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক থেকে ওদিক ছুটে বেড়ায়। এটা পেলে ভাল হবে, ওটা পেলে ভাল হবে এইভাবে মরীচিকার পেছনে ছুটতে থাকে। অবশেষে সে যখন জানতে পারে যে ঈশ্বর লাভেই এই দুস্তর সংসাররূপ মরুভূমি অতিক্রম করা সম্ভব তখন সে ঈশ্[illegible] রত হয়। কিন্তু কি করে ঈশ্বরকে লাভ করতে হয় তা সে জানে না। তখন ঈশ্বরের প্রতিভূ সেজে যাঁরা বসে আছেন তাঁদের নিকট গমন করে। তাঁরা তখন জপ কর, পূজা কর, নাম কর ইত্যাদিরূপে উপদেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু আত্মলাভই যে শ্রেষ্ঠ লাভ এবং তাতেই যে এই সংসার মরুভূমি অতিক্রম করা যায়, এই জ্ঞান তাঁদের নিজেদের না থাকায় যেমন নিজেও অতিক্রম করতে পারেন না, শিষ্যকেও অতিক্রম করাতে পারেন না। ফলে কারোরই উপকার হয় না। এঁরা সকলেই মরীচিকার পেছনে ধাবিত হয়। মরীচিকার পরে যে জলাধার তার সন্ধান এঁরা জানেনা, তাই অপরকেও সন্ধান দিতে পারেনা অর্থাৎ আত্মসাধন সম্বন্ধে এঁদের নিজেদের জ্ঞান না থাকায় অপরকেও দিতে পারেনা। মরীচিকাদর্শনে যেমন পিপাসা দূরীভূত হয় না ; তেমনি জপ, পূজা, নাম করা ইত্যাদির দ্বারায় জন্ম জন্মান্তরের পিপাসা দূর করা সম্ভব নয়। এর জন্য চাই আত্মসাধন বা আত্মলাভ। তাই যোগিরাজ আক্ষেপ করে বলেছেন—"দর্পণকে ভিতর জো নদী উসসে পিয়াস নহি জাতা"। তোমরা যে যাই বলো, যে যাই সাধন করো, আমি নিশ্চয় করে বলছি দর্পণের মধ্য দিয়ে যে নদীকে দেখা যায় সেই নদী

দর্শনে যেমন পিপাসা দূরীভূত হওয়া সম্ভব নয়, তেমনি মরীচিকাবৎ পূজা, জপ, নাম করা ইত্যাদির মাধ্যমে আত্মলাভও সম্ভব নয়। পিপাসা দূর করার জন্য জল জল করে জলকে ডাকলে যেমন পিপাসা দূর হয় না, বরং পিপাসা বেড়েই চলে; তেমনি রাম, হরি বা কৃষ্ণ বলে ডাকলে তাঁদের সাড়া পাওয়া যায় না। মূল বস্তুত একই, তাকে তুমি রাম, হরি বা ঈশ্বর যাই বলো না কেন। যেমন গেলাসের ভেতর যে বস্তু তাকে তুমি জল, পানি বা water যে নামেই ডাকো না কেন পিপাসা দূর হয় না কারণ গেলাসের ভেতর যে বস্তু সে একই এবং সেই বস্তুকে পান করা প্রয়োজন, তাকে ডাকার প্রয়োজন নেই। তেমনি জল পান করারূপ আত্মকর্ম করা প্রয়োজন যা করলে আত্মসাক্ষাৎকার নিশ্চয় হবে। তাই যোগিরাজ বলতেন—"পিপাসার্ত ব্যক্তির নিকট জল যেমন প্রয়োজন, মুমুক্ষু ব্যক্তির নিকট ক্রিয়া তেমনি প্রয়োজন।" জপ করা, নাম করা, পূজা করা, কীর্তন করা ইত্যাদির যে সব বিধান আছে এবং যা সাধারণ মানুষ করে থাকে তাও সম্পূর্ণ নিষ্ফল নয়। এগুলি করতে থাকলে ক্রমে মন সাত্ত্বিক হয় এবং সাত্ত্বিক হতে হতে অবশেষে আত্মলাভের ইচ্ছা জাগে ও মন ক্রমশঃ অন্তর্মুখী হয়। শেষে আত্মকর্ম প্রাপ্ত হয়ে আত্মসাক্ষাৎকার করে মনুষ্য জীবন সার্থক করে অর্থাৎ তার উৎসস্থলে পৌঁছে যায়। কিন্তু যদি কেউ মনে করে সে ঐ সব বাহ্য কর্মের মাধ্যমে তার উৎসস্থলে পৌঁছে যাবে তা কখনই সম্ভব নয়। (এ বিষয়ে ৬৫ নম্বর শ্লোকে আরো বিশদ আলোচনা করা হয়েছে)।

"শ্বাস রহিত যানে কেবল কুম্ভক রাতদিন মন লেআওএ আন্তর
আপনেহিকো আপ দেখে—ইসিকা নাম ব্রহ্মজ্ঞান" ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মজ্ঞান কাকে বলে এ বিষয়ে নানা পণ্ডিত নানা কথা বলে থাকেন। কিন্তু যোগিগণ যা বলেন তা তাঁদের অপরোক্ষ জ্ঞান। ব্রহ্ম কাকে বলে এ বিষয়ে বলতে গিয়ে যোগিরাজ বলছেন—"ন শ্বাসা লেনা ন ফেকনা—বড়া সুখ—এহি ব্রহ্ম। সূর্য্য কো জ্যোতি নহি রহা।" নাসাপথে আগম-নিগমরূপ এই যে শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে, যার বলে বলীয়ান হয়ে সকলে বেঁচে থাকে এবং সব কিছু কর্ম করে, যাকে প্রাণের চঞ্চল গতি বলে, প্রাণকর্ম করতে করতে এই গতি যখন রহিত হয়, যখন সব কিছু নিশ্চল হয়ে যায়, এই অবস্থাই ব্রহ্ম। এই অবস্থায় বড়ই সুখ হয় অর্থাৎ দুঃখের নিবৃত্তি হয়। চঞ্চলতাই দুঃখ, স্থিরত্বই সুখ। তাই শাস্ত্র বলেছেন নিশ্চল অবস্থাই ব্রহ্ম। এই নিশ্চল অবস্থারূপ ব্রহ্মের পূর্বে যে আত্মসূর্য দেখা যায়, যে আত্মসূর্য হতে এই দুনিয়ার সবকিছুর উৎপত্তি তার জ্যোতিও যখন আর থাকে না, যখন স্বচ্ছ স্বয়ং

প্রকাশিত, যাকে আকাশের সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নি কেউই প্রকাশিত করতে পারে না, সকলেই যখন ম্লান হয়ে যায় এই অবস্থাই ব্রহ্ম এবং এই অবস্থাকে জানাই ব্রহ্মজ্ঞান।

প্রাণের দুটো অবস্থা। একটি স্থির অপরটি চঞ্চল। স্থির প্রাণই ব্রহ্ম যা সহস্রার থেকে কূটস্থ মধ্যে অবস্থিত। ওই কূটস্থ হতে অজপার গতি বিস্তার হয় এবং ক্রমে ক্রমে যতই নিম্নমুখী হতে থাকে ততই চঞ্চলতার স্রোত বাড়তে থাকে। জলপ্রপাত থেকে পতিত জলধারা যেমন মাটিতে পড়ে বহুধা বিভক্ত হয় তেমনি কূটস্থ থেকে প্রাণের চঞ্চল গতি মূলাধারে আছড়ে পড়ে নানা রিপু, ইন্দ্রিয়রূপে প্রকাশিত হয়। প্রাণের অবিরাম এই প্রকার চঞ্চল গতিই জীবের বর্তমান অবস্থা। তাই যোগিরাজ বলছেন প্রাণকর্মের দ্বারা শ্বাসের এই চঞ্চল গতিকে রুদ্ধ করে কেবল-কুম্ভক অবস্থা লাভ করতে হবে এবং এই প্রকার কেবল-কুম্ভক অবস্থায় মনকে সর্বদা কূটস্থ এবং তদূর্ধ্বে রাখতে পারলেই নিজেকে নিজে জানা যাবে। এই প্রকার নিজেকে নিজে জানাই ব্রহ্মজ্ঞান। প্রকৃত আমি যে কে, কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যেতে হবে, উৎপত্তিস্থল যে কোথায়, জীবের এ জ্ঞান থাকে না। কারণ জীব তার বর্তমান চঞ্চল অবস্থাকেই আপন স্বরূপ বলে জানে, যা মরীচিকাবৎ আদৌ সত্য নয়। জীব বর্তমান চঞ্চল অবস্থার ফেরে পড়ে এই অবস্থাকেই স্বীয় অবস্থা বলে মনে করে, তাই সে দেহসর্বস্ব হয় এবং দেহগত মন থাকায় স্বপ্নবৎ জগতকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করে। তাই সে মূলতঃ যে স্থির একথা ভুলে যায়। আবার কেউ সৌভাগ্য বলে যদি আত্মসাধন পায় এবং সেই সাধন করে মূল স্থির ঘরে যখন ফিরে যেতে পারে তখন সে নিজেই নিজেকে জানতে পারে অর্থাৎ সে যে কে, কোথায় গিয়েছিল এবং কোথায় বা পুনরায় ফিরে এল এই প্রকার জানাই ব্রহ্মজ্ঞান। স্থির শ্বাসই মূল অর্থাৎ আসল। সেই স্থির শ্বাসে ফিরে গেলেই নিজেকে জানা যায়, এই জানাই ব্রহ্মজ্ঞান। আবার ওই স্থির শ্বাস থেকে চঞ্চল শ্বাসে ফিরে আসলেই জগৎ দেখা, এটাই মায়া বা ভ্রম। এই সংশয় বা ভ্রম সম্বন্ধে যোগিরাজ বলেছেন —"হংস ওঁকার সো মন হোই—ফির শ্বাসা রহিত তো জাব তব মন স্থির হোয় অর্থাৎ ক্ষর অক্ষর ও নিঅক্ষরকা দুবধা জায়।" শ্বাসের বর্তমান চঞ্চল গতি থাকায় যে মনের উদয় হয় সেই চঞ্চল মনকেই জীব মন বলে জানে। কিন্তু প্রাণকর্ম করতে করতে যখন শ্বাসের গতি রহিত হয় তখন মনও স্থির হয়। এই স্থির মনই ব্রহ্ম, আবার চঞ্চল হলে মন। অর্থাৎ মন স্থির হলে ব্রহ্মে অবস্থান করায় ক্ষর, অক্ষর ও নিরক্ষর সকল বিষয়ে সংশয় চলে যায়। তখন মন স্থির হওয়ায় ইচ্ছারহিত হয় এবং মহাশূন্যরূপী ব্রহ্মে লয় হয়। তাই যোগিরাজ বলছেন—"জব ইচ্ছা রহিত হো জায় তব আপহি ব্রহ্ম হো যায়।" অর্থাৎ প্রাণকর্ম করতে করতে বায়ু স্থির অবস্থায় যখন

ইচ্ছারহিত বা ইচ্ছাতীত অবস্থা লাভ হয় অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভ হয় তখন স্বয়ংই ব্রহ্ম হয়ে যায়। তখন দ্বৈতও নেই অদ্বৈতও নেই, কারণ মন যেখানে নেই সেখানে দ্বৈত, অদ্বৈত বলবার কেউ থাকে না। তখন সবই মহাশূন্যরূপী ব্রহ্মে লয় হয়ে যায়। এই অবস্থার কথা বলতে গিয়ে তিনি আরো বলেছেন—"ব্রহ্মরূপ হমারা য়ানে জো শূন্য ভিতর, মন, সোই শূন্য বাহর—ফির মন দেখনে লগা বাহরকা কূটস্থ অক্ষর ফির উইভি গয়া—অব বহ গয়া খালি শান্তিপদ ইহ শূন্য জব ব্রহ্ম হুয়া য়ানে ইহ মম আউর কূটস্থ অক্ষর ব্রহ্ম হয় তব শূন্য মন ব্রহ্ম হুয়া।" —এই স্থির ব্রহ্মের যে রূপ তা আমারই রূপ। যোগী যখন স্থির ব্রহ্মে মিলে মিশে একাকার হন তখন তাঁর বর্তমান অস্তিত্বের অবলুপ্তি হওয়ায় যা ব্রহ্মের রূপ তা নিজের রূপে রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ একীভূত হয়। তাই তখন কূটস্থে যে স্থির মহাশূন্য, সেই স্থির শূন্যই আবার স্থির মন আবার সেই স্থির শূন্যই বাইরে সর্বত্র এটা অনুভব করেন অর্থাৎ ভেতর বাইরে সব এক হয়ে যায়। পুনবায় যখন মন বিন্দুমাত্র চঞ্চল হয় তখন সেই মন বাইরেও কূটস্থ অক্ষরকে দেখতে পায়। ক্ষর অর্থে বিনাশী এবং অক্ষর অর্থে অবিনাশী। মন বিন্দুমাত্র চঞ্চল হওয়ায় এই যে কূটস্থ অক্ষর দেখে এই দেখাদেখি অবস্থাও পুনরায় স্থির ব্রহ্মে মিশে যায় যখন চঞ্চলতার পূর্ণরূপে অবসান হয়। এই প্রকার নিঃশেষরূপে যখন চঞ্চলতার অবসান হয় তখন কি অবশিষ্ট থাকে? তখন একমাত্র শান্তিপদই অবশিষ্ট থাকে। যখন এই বর্তমান শূন্যও স্থির মহাশূন্যরূপী ব্রহ্মে মিশে যায় অর্থাৎ লয় হয় তখন জীবের বর্তমান আমিত্বসহ দেখাদেখিরূপ কূটস্থ অক্ষর, শূন্যমন সবই ব্রহ্ম হয়ে যায় অর্থাৎ উৎসস্থলে পৌঁছে যায়। এই অবস্থায় স্থির মহাশূন্যরূপী ব্রহ্মে অর্থাৎ উৎসস্থলে সবই মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়।

যদি তোমার কৃষ্ণ বা কালী দর্শন হয় তাহলে তোমার কৃষ্ণ বা কালীকে জানা হল, কিন্তু নিজেকে জানা হল না। নিজেকে জানাটাই ব্রহ্মজ্ঞান, কৃষ্ণ বা কালীজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান নয়, কারণ ব্রহ্ম এক, কৃষ্ণ বা কালী দুই, আবার অপরদিকে আমি এক। এই একের জ্ঞানই জ্ঞান, দুই এর জ্ঞান অজ্ঞান। অতএব নিজেকে জানার চেষ্টা কর, তুমিই সব।

"হামেসা কুম্ভক মহাদেবকা যোগ স্বরূপ ভয়া সির
হামেসা ভারি আঁখ উপর তানা হুয়া খিচনেসে জলদি
নহি টুটতা, নহি বোলনেসে বড়া ফয়দা" ॥ ১৪ ॥

দিব্ শব্দে আকাশ। আকাশ অর্থে মহাকাশ। মহাকাশ অর্থে এই আকাশের ভেতর যে আকাশ। সেই মহাকাশে যিনি সংলগ্ন অর্থাৎ অবস্থিত তিনিই দেবতা। মহাদেব অর্থে মহান্ আকাশ অর্থাৎ যিনি সর্বদার জন্য ওই মহান্ আকাশে সংলগ্ন বা যুক্ত তিনিই মহাদেব। তাই দেখা যায় দেবাদিদেব মহাদেব সর্বদা ধ্যানমগ্ন অর্থাৎ সর্বদার জন্য ব্রহ্মাকাশে যুক্ত। মহাদেব হল যোগীর একটি অবস্থা মাত্র। যে মহাযোগী সর্বদার জন্য স্বচ্ছ, নির্মল মহাশূন্যরূপী ব্রহ্মাকাশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, জাগতিক সবকিছু থেকে বিযুক্ত অবস্থায় ধ্যানমগ্ন তিনিই মহাদেব। মহাদেব অর্থে আর কিছুই নয়, যে যোগী সর্বদার জন্য এই রকম যুক্ততম অবস্থাপন্ন তিনিই মহাদেব। এই রকম মহাদেবস্বরূপ যোগযুক্ত অবস্থা যোগিরাজের হওয়ায় তিনি লিখেছেন হমেসা কুম্ভক অর্থাৎ সর্বদার জন্য তিনি কুম্ভক অবস্থায় থাকতে সমর্থ হলেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের আগম-নিগমরূপ গতি সর্বদার জন্য রহিত হওয়ায়, আর কোনো সময়েই শ্বাসের গতি নেই। এই অবস্থায় সম্পূর্ণ চঞ্চলতার ঊর্ধ্বে মহাস্থিরে পৌঁছে, যে অবস্থাকে মহাদেব অবস্থা বলা হয়, সেই অবস্থায় যোগযুক্ত হয়ে বলছেন যে এই অবস্থায় মাথা সর্বদার জন্য ভারী। কারণ এই অবস্থায় প্রাণবায়ু সর্বদার জন্য মস্তকে অবস্থান করায় এক গভীর নেশার উদয় হয় এবং মাথা আপনা হতে ভার হয়। তখন চক্ষুদ্বয় শিবনেত্র স্বরূপ ঊর্ধ্বগামী থাকায় টেনে নামালেও সহজে নামতে চায় না। এই দুই চোখের স্বাভাবিক ধর্মই হোলো চঞ্চলতা। কখনও স্থির থাকতে চায় না। যদিও কোনো প্রকারে স্থির করবার চেষ্টা করা হয় চোখের অভ্যন্তরে কম্পন বা স্পন্দন থাকবেই। কম্পন বা স্পন্দন রহিত কিছুতে হতে চায় না। কিন্তু অধিক পরিমাণে প্রাণকর্ম করতে থাকলে যখন শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি রহিত হয়ে কেবল কুম্ভক অবস্থালাভ হয় এবং প্রাণবায়ু মস্তকে স্থিতিলাভ করায় চক্ষুদ্বয় আপনা হতেই কম্পন বা স্পন্দন রহিত হয়ে এই প্রকার শিবনেত্র অবস্থা লাভ হয়। এই অবস্থাকেই শৈব-দর্শনে শাম্ভবী অবস্থা বলে। শৈবদর্শনমতে এই শাম্ভবী অবস্থা যোগীর এক উত্তুঙ্গ অবস্থা এবং মহাদেব অবস্থা। এই প্রকার অবস্থাপন্ন যোগীই প্রকৃত গুরুপদবাচ্য। তাই মহাদেবকে আদিগুরু বলা হয়। যোগিরাজেরও এখন এই প্রকার অবস্থা লাভ হওয়ায় আদিগুরু অবস্থা অর্থাৎ মহাদেব অবস্থা। তাই যোগিরাজ এই অবস্থায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগস্ট তাঁর গোপন দিন-

লিপিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে চুপি চুপি লিখে গেলেন—"আজ হম মহাপুরুষ হুয়ে"। —আজ আমি মহাপুরুষ হলাম। মহাপুরুষ—মহা—মহান্—ব্রহ্মাকাশ। পুরুষ অর্থে আত্মা বা জগতের আদিকারণ। অতএব জগতের আদিকারণরূপী ব্রহ্মাকাশে যিনি সর্বদা সংলগ্ন তিনিই মহাপুরুষ। ১৭ই আগষ্ট লিখেছেন—"মহাপুরুষ হম হয়—সূর্য্যমে এয়সা দেখা হমহি ব্রহ্ম হয়"—আমিই মহাপুরুষ, আত্মসূর্যের মধ্যে আমার এই অবস্থাকে দেখলাম এবং আরো দেখলাম যে আমিই ব্রহ্ম। পরের দিন ১৮ই আগস্ট লিখেছেন "হমারাই রূপসে জগত প্রকাশিত—অব বহু গাঢ়া প্রাণায়াম হুয়া। হমহি এক পুরুষ হয় আউর কোই নহি।" ব্রহ্ম নিরাকার, নিরবয়ব ও রূপাদিবিহীন। সেই ব্রহ্মের ঘনীভূত রূপ আমিই। আমিই যখন সেই ব্রহ্মের ঘনীভূত রূপ তখন জগতের সবকিছুই আমারই রূপ হতে প্রকাশিত। এই অবস্থায় ব্রহ্মের ঘনীভূত রূপ, জগত ও আমি সব মিলে মিশে একাকার। একটা দ্রুত গতিসম্পন্ন যানের ইঞ্জিনটাকে যদি হঠাৎ থামিয়ে দেওয়া যায় তাহলেও যেমন দীর্ঘসময় যানটি গতিসম্পন্ন থাকে, তেমনি দীর্ঘসময় উত্তম প্রাণ-কর্ম করতে থাকলে যখন আমিহারা অবস্থা লাভ হয় তখন প্রাণকর্ম করবার ইচ্ছা না থাকলেও যেমন অভ্যাসবশতঃ আপনা হতেই অভ্যন্তরমুখী প্রাণকর্ম চলতে থাকে সেইরকম যোগিরাজেরও এখন উত্তম গাঢ় প্রাণায়াম অভ্যন্তরমুখী চলছে। এই অবস্থায় দেহবোধ বা জগতবোধ না থাকলেও অভ্যন্তর অনুভূতি বর্তমান থাকে। এই প্রকার অনুভূতির মাধ্যমে যোগিরাজ জানতে পারলেন যে তিনিই একমাত্র পুরুষ অর্থাৎ জগতের আদিকারণ, সেই অবস্থায় তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। এই অবস্থা যোগীর এক উত্তুঙ্গ অবস্থা। যে কোন প্রকৃত যোগাভ্যাসী নিষ্ঠাপূর্বক এই আত্মকর্ম উত্তমরূপে সাধন করেন তাঁর এই অবস্থা লাভ আপনা হতে অবশ্যই হবে। এই অবস্থাই বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত—'অহং ব্রহ্মাস্মি।' পুনরায় ২২শে আগস্ট লিখেছেন —"হমহি আদি পুরুষ ভগবান।" আমিই আদিপুরুষ ভগবান্। আদিপুরুষ অর্থাৎ প্রথম পুরুষ। সেই প্রথম পুরুষ ভগবান্ আমিই। এখন আমি বুঝতে পারলাম যে জগতের সবকিছুই আমা হতেই উৎপত্তি, তাই আমিই ভগবান্। অর্থাৎ অহং ব্রহ্মাস্মি অবস্থা। ২৫শে আগস্ট লিখেছেন—"হমহি অক্ষর পুরুষ।" —আমিই অক্ষর পুরুষ। অক্ষর অর্থাৎ যার ক্ষয় নেই অর্থাৎ পরব্রহ্ম। এ অবস্থায় যোগিরাজ নিজেকে নির্গুণ ও পরমাত্মা হতে অভিন্ন জেনে তাঁতে বিলীন হয়েছেন, তাই তিনি নিজে অক্ষর পদবাচ্য অর্থাৎ অবিনাশী অবস্থা লাভ করেছেন। ২৪শে আগস্ট লিখেছেন—"হম হি কৃষ্ণ।" আমিই কৃষ্ণ। কৃষ্ণ—কৃ ধাতু কর্ষণ করা; ণ—নিবৃত্তি-বাচক। অর্থাৎ এই দেহরূপ-ক্ষেত্রকে প্রাণকর্ম দ্বারা কর্ষণ করতে করতে যে স্পন্দনরহিত নিবৃত্তিরূপ শাশ্বত

স্থিরত্বপদ লাভ হয় সেই অবস্থাই কৃষ্ণ। এই স্থিররূপা জীবনকৃষ্ণ অবিনাশী এবং সকল দেহেই বর্তমান। ক্রিয়ার পরাবস্থায় অর্থাৎ কর্মের অতীতাবস্থায় যখন শ্বাসের টানা ফেলার ইচ্ছা আর থাকে না, যখন শ্বাসের টানাফেলার নিবৃত্তিরূপ অবস্থা আপনা-হতেই উদয় হয় সেই অবস্থাই স্থিরপ্রাণরূপ জীবনকৃষ্ণ, এই অবস্থাই কৃষ্ণপদবাচ্য। যোগিরাজের এই অবস্থা লাভ হওয়ায় তিনি স্বয়ংই কৃষ্ণ। আরো অগ্রসর হয়ে ৩রা অক্টোবর লিখেছেন—"হম সূর্য্য হয়—মহাদেব।" আমিই আত্মসূর্য আবার আত্মসূর্য আমিই, অতএব আমিই মহাদেব। এই আত্মসূর্যই জগতের আদিকারণ এবং এই আত্মসূর্যই মহাশূন্য, ইনিই মহাদেব। এই আত্মসূর্য, মহাশূন্য, মহাদেব এবং আমি সবই যখন এক তখন আমিই মহাদেব। ১২ই নভেম্বর লিখেছেন--"হমহি মহাপুরুষ পুরুষোত্তম।" —আমিই মহাপুরুষ পুরুষোত্তম অর্থাৎ উত্তমপুরুষ। কারণ আমার আগেও কেউ নেই পরেও কেউ নেই, অনাদিমধ্যান্ত অজর অমর শাশ্বত পুরুষ আমিই।

যোগীর লক্ষ্যই হোলো মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়া। যখন যোগী যোগ কর্ম করতে করতে সম্পূর্ণরূপে দ্বৈতভাবের অবসানে, অদ্বৈতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যান তখন তিনি নিজেই ব্রহ্ম হন। যোগিরাজের এখন ঠিক এই অবস্থা। এই প্রকার মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়ার পূর্বে যে নানান দেবদেবী, আত্মজ্যোতি, আত্মসূর্য ইত্যাদি বহুবিধ দর্শন হয়ে থাকে তা সবই দ্বৈতের অন্তর্গত। কিন্তু এই সকলপ্রকার দর্শনের অতীতে, যখন আর নানা দেবদেবী, আত্মজ্যোতি, আত্মসূর্য ইত্যাদি কিছুই আর দর্শন হয় না, যখন সকল প্রকার দর্শনের উর্ধে মহাশূন্যরূপী ব্রহ্মে যোগী সতত যুক্ত হয়ে একীভূত হয়ে যান সেই অবস্থাই অদ্বৈত। সনাতন যোগধর্মের মধ্যে এই অদ্বৈতবাদই চূড়ান্ত অবস্থা। সকল জীব এবং এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সেই নির্গুণ ব্রহ্ম থেকেই জাত এবং সেখানেই পরিসমাপ্তি। অতএব জীব যতক্ষণ সেই নির্গুণ নিরবয়ব উৎসস্থলরূপী পরব্রহ্মে ফিরে যেতে না পারছে, তার সেই উৎসস্থলে মিলে মিশে একাকার হয়ে লয়প্রাপ্ত হতে না পারছে, ততক্ষণ তার বিশ্রাম নেই। এই হল সনাতন যোগশাস্ত্রের আদিকথা। এর পূর্বে যতই কৃষ্ণ বিষ্ণু দেখ, নানান দেবদেবী ঈশ্বর ভগবান্ দেখনা কেন পূর্ণ বিশ্রাম সম্ভব নয়। অতএব যোগিরাজের মতে এবং সনাতন যোগশাস্ত্রের মতে নিজেকে নির্গুণ পরব্রহ্মে লয় করে দেওয়া অর্থাৎ আমার আমিত্বের অবসানে নিজেকে ব্রহ্মে রূপান্তর ঘটানোই আদি বা মূল কথা। এই অবস্থায় যোগী নিজেই কৃষ্ণ বিষ্ণু মহাদেব ভগবান্ পরিশেষে ব্রহ্ম হন। যোগিরাজ এই অবস্থায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাই তিনি নিজেই কৃষ্ণ বিষ্ণু মহাদেব এবং পরিশেষে নিজেই

ব্রহ্ম হয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন—"যো পুরুষ আদিত্যমে সো ময় হুঁ—ব্রহ্মরূপ সূর্য্য কা হমারা হয়।" —আদিত্য অর্থাৎ কূটস্থে যে আত্মসূর্যমণ্ডল দেখা যায়, যা সহস্র সূর্যেরও অধিক কিরণ বিশিষ্ট, সেই সূর্যমণ্ডলস্থিত হিরন্ময় পুরুষ বিষ্ণু আমি। সহস্র সূর্যের কিরণ বিশিষ্ট ব্রহ্মরূপী এই যে আত্মসূর্য সেই রূপ আমারই। এই অবস্থাকেই লক্ষ্য করে নারায়ণের ধ্যানে বলা হয়েছে "ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান কনককুণ্ডলবান কিরীটীহারী হিরন্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥"

"হমহি আদি পুরুষ ভাগবান—কুচ পেটমে না তাকতসে দরদ হয—অব শ্বাস আউর ভিতর গয়া—অব চতুর্ভুজ হোনেকা লক্ষণ হুয়া—ইহ মালুম হোতা হয় কি ইহ দোনো হাত ছোড়ায় আউর ভ শক্তিময় নিরাকার দুই হাত ভিতরসে নিকলা" ॥ ১৫ ॥

সনাতন শাস্ত্র মতে যতপ্রকার দেবদেবী আছে সবই যোগীর যোগ সাধনার ক্রমবিকাশের এক একটি অবস্থা মাত্র। এইভাবে নানান দেবদেবী তত্ত্ব অতিক্রম করতে করতে যোগী পরিশেষে যখন ভগবানে রূপান্তরিত হন তখন তিনি নিজেই ব্রহ্ম হন। যোগিরাজ এই সমস্ত নানান দেব দেবী তত্ত্ব অতিক্রম করতে করতে এখন তিনি স্বয়ংই আদিপুরুষ ভগবানে রূপান্তরিত হয়েছেন। এখন তাঁর শ্বাসের গতি প্রায় স্থির অবস্থায় সুষুম্নায় চলছে। এই অবস্থায় তাঁর চতুর্ভূজ নারায়ণ হওয়ার লক্ষণ হোলো। এই চতুর্ভূজ নারায়ণ যোগীর ক্রমোন্নতির এক অবস্থা, এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর এই বর্তমান দুটি হাত ছাড়াও আরও অনন্ত শক্তিসম্পন্ন নিরাকার দুটি হাত ভেতর থেকে আবির্ভূত হল। হাত হল কর্মের প্রতীক। এখন যোগিরাজের এই যে নিরাকার দুটি হাত প্রকাশিত হল তা নির্গুণ ব্রহ্মে কি করে মিলে যাওয়া যায় তারই প্রতীক। অর্থাৎ বর্তমান দুই হাত জাগতিক কর্মের প্রতীক এবং নিরাকার দুই হাত যা অভ্যন্তর সত্তা থেকে প্রকাশিত হল তা নির্গুণ পরব্রহ্মে মিলে যাওয়ারূপ কর্মের প্রতীক। যোগী যখন জাগতিক সকল প্রকার কর্মের ঊর্ধ্বে অবস্থান করতে সক্ষম হন, যখন শ্বাস-প্রশ্বাসের বাহ্যগতিও আর থাকে না, তখন যোগীর একমাত্র কর্ম অবশিষ্ট থাকে তা হল ব্রহ্মের সঙ্গে মিলে যাওয়া। এই অবস্থায় যোগী যদিও শান্ত সমাহিত হন বটে, কিন্তু ব্রহ্মে মিলে যাওয়ার জন্য, লয় হওয়ার জন্য অভ্যন্তর চেষ্টা বর্তমান থাকে। এই নিরাকার অনন্ত শক্তিসম্পন্ন

দুই হাত সেই চেষ্টারই প্রতীক যার মাধ্যমে যোগী নিরাকারে মিলে যেতে সক্ষম হন। যোগীর এই অবস্থাই অর্থাৎ মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়ার যে চেষ্টা, সেই চেষ্টারই প্রতীক চতুর্ভূজ নারায়ণ বা বিষ্ণুমূর্তি। সর্বত্র যিনি পরিব্যাপ্ত তিনিই বিষ্ণু এবং সেই সর্বত্রের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাওয়ার প্রতীক বিষ্ণুমূর্তি। যোগিরাজ এখন ঠিক এই অবস্থা লাভ করেছেন। যোগীর এই অবস্থা পর্য্যন্ত সগুণ ব্রহ্মের স্থান, এর পরেই যোগী প্রবেশ করেন নির্গুণ ব্রহ্মে।

"কূটস্থ অক্ষর অমর ওহি সূর্য্য নারায়ণ হয়—এহি
হম হয় আউর এহি সূর্য্য হয়। কূটস্থ অক্ষর আদি
আউর হম হয়। সূর্য্যহি মালিক আউর মজা আউর
সাফ। অক্ষর সূর্য্য হয় ওহি হম হয়" ॥ ১৬॥

কূটস্থ, কূট শব্দের অর্থ নেহাই। কর্মকারগণ যে লৌহপিণ্ডের ওপর তপ্ত লোহাকে পেটাই করে তাকে নেহাই বলে। পেটাইয়ের মাধ্যমে তপ্ত লোহার পরিবর্তন হয় কিন্তু নেহাইয়ের কোন পরিবর্তন হয় না। তেমনি জীব শরীরে যে কূটস্থ বর্তমান তা অপরিবর্তনীয় ও অবিনাশী। জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগের মত এই দেহের পরিবর্তন হয়, কিন্তু কূটস্থ যা তাই থাকে। এই কূটস্থই সাধনার পীঠভূমি এবং এই কূটস্থের যে বৃহৎরূপ তাই আত্মসূর্য। দুই ভ্রূর মাঝে নাসিকাগ্রে কপালে এই কূটস্থ বর্তমান, যাকে ত্রিনয়ণ বলে। এই কূটস্থের রূপ ঠিক একটি চোখের মত। চোখ যেমন ত্রিবলয়াকৃতি, কূটস্থও তেমনি। বাইরের দিক্ হতে যে প্রথম বলয় তা স্বর্ণবর্ণ, উহা বলরামতত্ত্ব। দ্বিতীয় বলয় কৃষ্ণবর্ণ, উহাই কৃষ্ণতত্ত্ব এবং মধ্যে তৃতীয় বলয়রূপ যে স্বর্ণাভ উজ্জ্বল বিন্দু তাই সুভদ্রাতত্ত্ব। ইনিই আদ্যাপ্রকৃতি ও ব্রহ্মযোনি। ইনিই সবকিছুর উৎপত্তিস্থল তাই এই বিন্দুকে বেষ্টন করে আছেন বা রক্ষা করছেন অপর দুই তত্ত্ব। ইনিই আদিশক্তি মহামায়া। এরই প্রতীক পুরীর মন্দিরের বিগ্রহ। এই বিন্দু যখন ছোট দেখায় তখন তিনি ধ্রুবতারা বা তারকনাথ এবং যখন বৃহৎ তখন আত্মসূর্য। এই আত্মসূর্য অবিনাশী, অপরিবর্তনীয় ও অমর। এই কূটস্থই অক্ষর পুরুষ, ইনিই আত্মসূর্য, ইনিই নারায়ণ। কেবল যোগিগণই এঁকে দর্শন করতে সক্ষম এবং পরিশেষে যোগী এই আত্মসূর্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে যান। যোগিরাজ এখন নিজে ওই আত্মসূর্যে মিলিত হয়ে, লয় প্রাপ্ত হয়ে একই দেখছেন। কূটস্থ অক্ষর, আত্মসূর্য, নারায়ণ এবং নিজে সবই লয়প্রাপ্ত হয়ে এখন তিনি একে পরিণত হওয়ায় নিজেই

নারায়ণে রূপান্তরিত হয়েছেন অর্থাৎ নিজেই নারায়ণ হয়েছেন। অর্থাৎ যা কূটস্থ-অক্ষর তাই আত্মসূর্য, তাই আত্মনারায়ণ, তাই শ্যামাচরণ। এ অবস্থায় আর তুই বলার কেউ নেই, তুই বলার কেউ না থাকায় সবই ব্রহ্ম অতএব শ্যামাচরণও ব্রহ্ম। যোগীর এ একটা অবস্থা যা দ্বৈতের অবসানে অদ্বৈতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠালাভ। এই অবস্থায় পৌঁছে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট যোগিরাজ লিখেছেন—"হম জব সূর্য্য হয় তব জো হম কহে সো বেদ হয়—য়ানে নিশ্চয় জানে।"—আমিই যখন সেই বৃহৎ কূটস্থস্বরূপ আত্মসূর্য তখন আমি যা বলছি তাই বেদ অর্থাৎ অপৌরুষেয় এটা নিশ্চয় জেনো। এখানে যোগিরাজ নিশ্চয়সহকারে বলেছেন অর্থাৎ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, হে জগৎবাসী আমি তোমাদের কাছে যে জ্ঞানের কথা বা যে প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা তুলে ধরছি, যা কারো কাছ থেকে শোনা নয়, শাস্ত্র বা অপরের কাছ থেকে ধার করা বিদ্যা নয়, প্রত্যক্ষ অনুভূতির মাধ্যমে যা নিজে দেখে জেনে লব্ধ প্রাপ্ত হয়ে তোমাদের কাছে বলছি তাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান একথা তোমরা নিশ্চয় জেনো। বেদ অর্থে জ্ঞান। বেদ অর্থে কোনো গ্রন্থকে বোঝায় না বা কোনো গ্রন্থপাঠে এই জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। এই জ্ঞান যোগসাধন সাপেক্ষ, নিজ অনুভূতিগম্য এবং শাশ্বত। আত্মসাধনের মাধ্যমে যে যোগী নিজ সত্তার সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্তি ঘটিয়ে ব্রহ্মে রূপান্তর হতে পারেন এই বেদজ্ঞান তাঁর কাছে আপনা হতেই উদয় হয়। তাই এই বেদজ্ঞান অপৌরুষেয় ও চিরবিরাজমান। এই প্রকার যোগীকেই প্রকৃত জ্ঞানী বলা যায় এবং এই প্রকার জ্ঞানী পৃথিবীতে দুর্লভ। এমন ব্যক্তিকেই মহাশয় বলে। এই অবস্থায় যোগী নিজেই নারায়ণ হন অর্থাৎ নারায়ণ একটি অবস্থা মাত্র, এটা কোন শাস্ত্র মূর্তিবিশেষ নয়। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী যোগিরাজ লিখেছেন—"সূর্য্যাই ব্রহ্ম এহি স্থির ঘর পহুচাতা হয়—অব স্থির ঘরমে গয়ে, উসিকা নাম অমর ঘর হয়।"—অমরঘর অর্থাৎ যে অবস্থায় গেলে আর জন্ম মৃত্যু হয় না তাই অমর ঘর। জন্ম হলেই মৃত্যু অনিবার্য, আবার ওল্টালে মৃত্যু হলে জন্ম অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু জন্মমৃত্যুর অতীতে যে মহাস্থির ঘর তা অমর অবিনাশী ও অপরিবর্তনীয়। এটা জীবের একটা অবস্থা মাত্র। জীবের জন্মমৃত্যু হয় কেন? মহাস্থিরঘরই ব্রহ্ম। এই স্থির অবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ায় জীবভাবের উদয় হয়। তাই চঞ্চলতাই জীব এবং স্থিরত্বই শিব। জীব যতক্ষণ চঞ্চল অবস্থায় থাকে ততক্ষণ জন্মমৃত্যু অনিবার্য। এমনকি সাধনার মাধ্যমে জীব চঞ্চল অবস্থাকে প্রায় কাটিয়ে উঠেছে, কিন্তু সে অবস্থায়ও বিন্দুমাত্র চঞ্চলতা থাকায় জন্মমৃত্যুর প্রবাহ রহিত সম্ভব নয়। তবে এ অবস্থায় পুনর্জন্ম দীর্ঘসময় সাপেক্ষ। জীব যোগসাধনার মাধ্যমে জীবভাব কাটিয়ে পূর্ণ শিবভাব পাবার আশায় যতই স্থিরত্বের দিকে অগ্রসর হতে থাকে ততই

জন্মমৃত্যুর প্রবাহ থেকে দূরে চলে যায় অর্থাৎ এ অবস্থায় পুনর্জন্ম অনেক দেরীতে হয়। পরিণামে চঞ্চলতার সম্পূর্ণ অবসানে জীব যখন মহাস্থিরে স্থায়ী স্থিতিলাভ করে, সেই স্থিতিলাভ থেকে আর যখন তাকে বিচ্যুত হতে হয় না অর্থাৎ এককথায় আর যখন তাকে চঞ্চল অবস্থায় ফিরে আসতে হয় না, এই অবস্থায় যোগী জন্ম মৃত্যুর অতীতে চলে যাওয়ায় নিজেই নারায়ণ হন। এই অবস্থায় যোগীর নিজের তরফে অর্থাৎ পৃথিবীর আকর্ষণে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না বটে, কিন্তু লোক কল্যাণের জন্য বা মানুষকে অধ্যাত্ম পথে টেনে নেবার জন্য প্রয়োজনবোধে যুগে যুগে তিনি মানুষরূপে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন। যোগিরাজ এমনই একজন মহাপুরুষ। তিনি এই সহজ যোগসাধনকে চালু করে মানুষকে অধ্যাত্মপথে টেনে নিয়ে যাবার জন্যই এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর নিজের কোনো প্রযোজন ছিল না বটে কিন্তু কেবলমাত্র লোককল্যাণের জন্য তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। যোগিরাজের সাধনার উপলব্ধি এই কথাই স্পষ্টরূপে প্রমাণ করে। তাই তিনি বলছেন এই আত্মসূর্যই ব্রহ্ম এবং এই আত্মসূর্যই স্থির ব্রহ্মে পৌঁছে দিতে সক্ষম। তিনি নিজেও ওই আত্মসূর্যকে ধরেই স্থির ঘরে পৌঁছে গিয়ে বলছেন, এই স্থির ঘরই অমরঘর অর্থাৎ এই স্থির অবস্থাই অমর অর্থাৎ যে অবস্থার আর ক্ষয় নেই, যে অবস্থায় পৌঁছে গেলে আর ফেরত আসতে হয় না অর্থাৎ আর জীব অবস্থায় ফিরে আসতে হয় না, যে অবস্থা সদাই শিব অবস্থা, সেই অবস্থায় পৌঁছে গিয়ে তিনি নিজেই শিব হয়েছেন। এখন তিনি নিজেই শিব হয়ে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী লিখলেন—"অব স্থলোকা দিল চাহতা হয়—আউর খালি ব্রহ্মকো-দেখে যানে শূন্যকে ভিতর শূন্য—অব স্থির ঘরমে ময় গয়া অব মালুম হোতা হয় জয়সা শরীর উপকে হওয়াসে নিচেসে উঠতা হয় জযসা হুকা পিকে পানি ফেকদেনেসে নিচেসে ছেদ যঁহাসে পিয়া যাতা হয় ওহাঁসে ধুয়া নিকস জাতা হয় ওয়সাহি হোগা। অব অগম ঘর গএ—অব অজর ঘরসে অমর ঘর গএ—অব কুছ নহি খালি মালিক।" —শ্বাস-প্রশ্বাসের বাহ্যগতি আর নেই, সর্বদার জন্য কেবল-কুম্ভক অবস্থায় অবস্থান করায় সমস্ত প্রকার কর্মের অতীতে পৌঁছে নৈষ্কর্ম্য অবস্থায় নিজেই শিব হয়েছেন। এই অবস্থায় আর ইচ্ছা না থাকায় কর্ম নেই, তাই তিনি এখন চুপচাপ ব্রহ্মে সদাযুক্ত হয়ে শুয়ে আছেন; ঠিক যেমন কালীর পদতলে শিবের অবস্থান। জীব শিব হয়ে শব হলেন। এই বর্তমান শূন্যের ভেতর যে শূন্য তাই ব্রহ্ম। সেই শূন্য ব্রহ্মের সঙ্গে সদাযুক্ত হয়ে সতত যুক্তানাম অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে ওই স্থির ঘরে স্থায়ী স্থিতিলাভ করেছেন। ওই স্থির ঘরই অগম্য ঘর অর্থাৎ যে স্থিরাবস্থায় যোগী ব্যতীত আর কারও পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় সেই অগম্য অবস্থায় পৌঁছে বলছেন এই স্থিরাবস্থার আরো স্থিরাবস্থায় যে অমর ঘর সেই

অবস্থায় অনন্ত স্থিতিলাভ করায় আর কেউ নেই, এই অবস্থায় কেবলমাত্র মহাশূন্তরূপী মালিক ব্রহ্মই আছেন। গমনাগমন রহিত হওয়ায় অগম্য। চঞ্চলতাই গমনাগমনের মূল কারণ; কিন্তু যখন চঞ্চলতা রহিত তখন অগম্য অর্থাৎ এই অবস্থায় আর শিষ্য নেই গুরু নেই, ভক্ত নেই ভগবান্ নেই, জীব নেই শিব নেই, সবই একে রূপান্তরিত হওয়ায় মহাশূন্য ব্রহ্মই একমাত্র আছেন। এই অবস্থায় কিছুই নেই আবার কিছুই নেই বলারও কেউ নেই। তখন সবই মহাশূন্য।

যোগিরাজ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট জগৎবাসীকে নিশ্চিতভাবে জানালেন যে এই মহাশূন্য অবস্থা অর্থাৎ যেখানে কিছুই নেই সেই উৎসস্থলে কেমন করে পৌঁছনো যায়, তিনি তার পথটিও বলে দিয়ে গেলেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষ যাতে তাদের উৎসস্থলে পৌঁছতে পাবে দয়াপরবশ হয়ে, মানুষের দুঃখে কাতর হয়ে সেই গুহ্যতম রহস্যময় পথটিও তিনি বলে দিলেন—"অভয়পদ গুরু বিনা মিলতা নাহি—শূন্য ভবনমে স্থির রহনা, বিনা স্থিরমে ঘুসনেসে নহি হোগা।"—যোগসাধনার গুহ্যতম রহস্যদ্বার উন্মোচন করে জগৎকল্যাণে বললেন এই যে স্থির অভয়পদ তা সদগুরু ব্যতীত কখনও লাভ করা যায় না। যদি তেমন সদগুরু লাভ করতে পার তবে তিনি বলে দেন কেমন করে সেই স্থির অবস্থায় স্থায়ী স্থিতিলাভ করা যায়। প্রাণকর্মের দ্বারা স্থায়ী স্থিতিলাভ করতে না পারলে অর্থাৎ কূটস্থে সতত যুক্তানাম অবস্থা লাভ করতে না পারলে এই অভয়পদ লাভ করা সম্ভব হয় না। জীবের বর্তমান অবস্থা চঞ্চল। এই চঞ্চল অবস্থায় থাকার দরুন অভয়পদ যে কি তা জীব জানে না। জানলেই ত শিব হল। তাই জীবকে চেষ্টা করতে হবে স্থির হবার জন্য। মন বুদ্ধি বা বিচারের দ্বারা স্থির হওয়া সম্ভব নয়। এই প্রকারে যদিও বা সামান্য স্থিরত্ব আসে তা ক্ষণস্থায়ী হয়। আবার স্থিরত্বলাভ না করতে পারলে অধ্যাত্ম পথে প্রবেশও করা যায় না। জীবের যখন এই জ্ঞান হয় যে স্থিরত্বপদ ব্যতীত উপায় নেই, অথচ কেমন করে স্থির হতে হবে তাও সে জানে না, তখনই তার সদগুরু লাভের আকাঙ্খা জাগে। পরিণামে সদগুরুপ্রদত্ত পথে আত্মকর্ম করতে করতে স্থিরত্বলাভের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। যতই স্থিরত্বলাভের দিকে অগ্রসর হতে থাকে ততই অধ্যাত্মরাজ্যের এক একটি দ্বার উন্মোচন হতে থাকে এবং ক্রমে আত্মজ্যোতি দর্শনে তন্ময় হয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে নিজের ভেতর নিজেকে খুঁজতে থাকে। এই নিজেকে নিজে জানাই ব্রহ্মজ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ করার পর আরো অধিক নেশার চাপে যখন নিজেকে হারিয়ে ফেলে, যখন আর নিজেও থাকে না, কেবল একমাত্র স্থির, নিশ্চল, মহাশূন্যরূপী ব্রহ্মই বর্তমান থাকে সেই অবস্থাই অভয়পদ। তাই যোগিরাজ বলছেন প্রাণকর্মের দ্বারা প্রথমে নিজেকে স্থির করবার চেষ্টা করো অর্থাৎ তোমার যে বর্তমান

চঞ্চল অবস্থা, গতিময় অবস্থা, যাকে মহামায়া বলে তাকে প্রথমে থামাও, তারপর অভয়পদের অন্বেষণ করো। স্থিরত্বলাভ করার পূর্বে ওই অভয়পদ বা শূন্যভবন লাভ করা সম্ভব নয়। তাই প্রথমে প্রচুর পরিমাণে প্রাণকর্মের মাধ্যমে আগমনিগমরূপ গতিকে থামিয়ে স্থির অবস্থা লাভ কর। এই প্রকার স্থির অবস্থা লাভ করতে পারলে তবেই ওই শূন্যভবনে স্থায়ী স্থিতিলাভ করা যায়, বিনা স্থিরত্বলাভে সেই শূন্যভবনে প্রবেশ করা যায় না অর্থাৎ এখানে যোগীর কর্তব্য প্রাণকর্মের দ্বারা প্রথমে স্থির অবস্থা লাভ করা তারপর ওই স্থির অবস্থায় থেকে শূন্যভবনে প্রবেশ করা। সেই শূন্যভবনই অভয়পদ। এটাই হোলো যোগিরাজ প্রদত্ত শিক্ষার মূল কথা।

> "সূর্য্য নারায়ণ ভগবান জগদীশ্বর সর্ব্বব্যাপী হম হয়। এক জ্যোত ভিতর মালুম হোতা হয় যো সূর্য্যসে আতা হয় সূর্য্যহি হম হয়। জো হম সোই উহ রূপ নিরাকারকা। যো বৃদ্ধিকে পারে অনন্তরূপ ওহি ভগবান—আউর নির্ম্মল। হম হি অক্ষর পুরুষ"॥ ১৭॥

এই জগতের উৎপত্তিস্থল আকাশে উদীয়মান সূর্য; তাহলে সূর্যের উৎপত্তিস্থল কি? বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক মতে যারই উৎপত্তি আছে তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অতএব এই পৃথিবীর যেমন উৎপত্তি আছে একদিন তার বিনাশও হবে। তেমনি আকাশে উদীয়মান যে সূর্য তারও উৎপত্তি আছে অতএব বিনাশও অবশ্যম্ভাবী। তাই এই সূর্যকে অবিনাশী বলা যায় না। সূর্য প্রণামে বলা হয়েছে—"ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।" —আকাশে উদীয়মান যে সূর্য সেই সূর্যকে প্রণাম করলে কি সর্বপাপের নাশ হয়? তা কখনও সম্ভব নয়, অতএব পাপনাশক যে সূর্য তা কোন্ সূর্য?—তা আত্মসূর্য্য। এই মহাদ্যুতিসম্পন্ন বৃহৎ কূটস্থরূপী আত্মসূর্যদর্শনে সকল পাপ দূরীভূত হয়। বিশ্বরূপদর্শনেও এই আত্মসূর্যের কথাই বলা হয়েছে। আকাশে অবস্থিত সূর্য সহ জগতের সবকিছুই ওই আত্মসূর্য হতেই উৎপত্তি, আত্মসূর্যই সবকিছুর আধারস্থল। শাস্ত্র এই আত্মসূর্যকেই প্রণাম করবার উপদেশ দিয়েছেন। যোগী যোগসাধনার মাধ্যমে যখন কূটস্থে স্থিতিলাভ করেন তখন তিনি জানতে পারেন যে এই কূটস্থই অক্ষরপুরুষ, ইনিই আত্মসূর্য এবং ইনিই নারায়ণ। নারায়ণের প্রণামমন্ত্রেও সেকথাই বলা হয়েছে। যোগিরাজ এখন সাধনার মাধ্যমে জানতে পারলেন যে এই আত্মসূর্যই তিনি এবং তিনিই আত্মসূর্য; এই কূটস্থ অক্ষররূপী আত্মসূর্যই সব কিছুর আদিকারণ অর্থাৎ উৎপত্তিস্থল এবং তাই আমি। এখানে তিনি নিজে, আত্মসূর্য এবং কূটস্থ অক্ষর সবই একে পরিণত হওয়ায়

তিনি জানতে পারলেন যে এই সবই আমি এবং এই আমিই মালিক অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের কারণস্বরূপ। এই আত্মসূর্যই নারায়ণ অর্থাৎ ভগবান্। আকাশের সূর্যসহ এই জগতের সবকিছুতেই ইনি বর্তমান তাই এই আত্মসূর্যই জগদীশ্বর, আবার আমিই যখন এই আত্মসূর্য এবং সর্বব্যাপী আমিই বর্তমান তখন আমিই ভগবান্ জগদীশ্বর। আমারই ভেতর থেকে যে জ্যোতি প্রকাশিত হচ্ছে তা যখন ওই আত্মসূর্য থেকেই আসছে তখন আমিই আত্মসূর্য। যা আমি তাই ওই আত্মসূর্যের নিরাকার রূপ। বর্তমান চঞ্চলবুদ্ধির অতীতে যে স্থিরবুদ্ধি তা অনন্তের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় সেই অনন্ত বুদ্ধিই ভগবান্ এবং সেই অনন্ত বুদ্ধিরূপী যে ভগবান্ তা অতীব নির্মল অর্থাৎ বর্তমান যে চঞ্চল বুদ্ধিকে সাধারণ মানুষ বুদ্ধি বলে জানে তা সীমিত, তারও অতীতে যে স্থিরবুদ্ধিরূপী বৃহৎ কূটস্থ তা অনন্ত হওয়ায় সেই অবস্থাই ভগবান্। এই অবস্থা অতীব নির্মল। তাই আমিই বৃহৎ কূটস্থরূপী অক্ষর পুরুষ। অক্ষর অর্থাৎ জীবাত্মা যখন নিজেকে নির্গুণ অর্থাৎ গুণাতীত ও পরমাত্মা হতে অভিন্ন জেনে সেই পরমাত্মায় বিলীন হন অর্থাৎ যোগী যখন কূটস্থে স্থায়ী স্থিতিলাভ করেন তখন কূটস্থ, অক্ষর পুরুষ, আত্মসূর্য, নারায়ণ, ভগবান্ ইত্যাদি সবই মিলেমিশে একাকার হয়ে, একে পরিণত হয়ে সর্বব্যাপী অবস্থা লাভ করেন তখন তিনি স্বয়ংই অক্ষর পদবাচ্য হন। এই অবস্থা অবিনাশী। এর পূর্বে সকল অবস্থাই নাশবান হওয়ায় ক্ষর পদবাচ্য।

“সত্যযুগমে কবীর সাহেব কা নাম—সত্য সুকৃত ; ত্রেতামে—
মুণীন্দ্র ; দ্বাপরমে—করুণাময় ; কলিযুগমে—কবীর” ॥ ১৮ ॥

পঞ্জিকা মতে চারযুগের মিলিত আয়ুঃকাল ৪৩২০০০০ বর্ষ, যথাক্রমে সত্যযুগের আয়ুঃকাল ১৭২৮০০০ বর্ষ, ত্রেতাযুগের আয়ুঃকাল ১২৯৬০০০ বর্ষ, দ্বাপরযুগের আয়ুঃকাল ৮৬৪০০০ বর্ষ এবং কলিযুগের আয়ুঃকাল ৪৩২০০০ বর্ষ। পঞ্জিকা মতে সত্যযুগের অবতারাদি মৎস্যকূর্মবরাহনৃসিংহাঃ, ত্রেতাযুগের অবতারাদি বামনপরশুরামশ্রীরামচন্দ্রাঃ, দ্বাপরযুগের অবতারাদি বলরামবুদ্ধৌ এবং কলিযুগের অবতার বিষয়ে লেখা আছে—সত্যসন্ধিসময়ে কল্কির্ভবিষ্যতি নরাণাং বিংশত্যধিকশতবর্ষাণি পরমায়ুঃ সার্দ্ধত্রিহস্ত-পরিমিতো মানবদেহঃ। এই কলিযুগে ইতিমধ্যে কত বর্ষকাল অতিক্রান্ত হয়েছে তা নির্ণয় করা মুস্কিল। এ বিষয়ে পণ্ডিতগণও একমত নন। এতো গেল অবতারের কথা। অবতার সম্বন্ধে শাস্ত্র নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তাঁদের আগমনের কথা। অবতারগণ পৃথিবীতে আসেন ব্রহ্মের পূর্ণশক্তি নিয়ে। এই হিসাবে কলিযুগে পূর্ণঅবতার এখনো ধরাধামে আসেননি। অবতারের কর্মপরিধি বৃহৎ। সারা

পৃথিবীতে যখন ধর্মের গ্লানি দেখা দেয় এবং শাস্ত্রীয় মতে নির্দিষ্ট সময় যখন উপস্থিত হয় কেবলমাত্র তখনই পূর্ণ অবতারের আবির্ভাব হয় এবং মনুষ্যসমাজে ধর্মের মোড় ফিরিয়ে দেন। এছাড়া আঞ্চলিক ভিত্তিতে বা কোন দেশ ভিত্তিতে যখনই যেখানে অধর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটে তখনই সেখানে কোনো মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে এবং তিনি তখন সেই দেশ বা অঞ্চল থেকে অধর্মের গ্লানি দূর করেন। এই জাতীয় মহাত্মাদের মহাপুরুষ বলে। এই মহাপুরুষগণও নিত্যমুক্ত ও সদা ব্রহ্মে সংযুক্ত। এই মহাপুরুষগণ নিজেদের প্রয়োজনে ধরাধামে অবতীর্ণ হন না কারণ তাঁদের নিজেদের কোনো প্রয়োজন থাকে না। কালপ্রভাবে ক্ষয়মান সত্যধর্ম এবং যোগধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠাই তাঁদের একমাত্র কাজ। তাই তাঁরা সদা ব্রহ্মে যুক্ত থেকে, কর্মের অতীতাবস্থায় অবস্থান করে সত্য যোগধর্ম পুনরায় মনুষ্যসমাজে স্থাপন করে যান, যা করলে মানুষ পুনরায় ব্রহ্ম-সমীপে পৌঁছতে পারে। এই হোলো মোটামুটিভাবে মহাপুরুষের কর্তব্য। তাই দেখা যায় উপযুক্ত সময়ে প্রয়োজনবোধে এই পবিত্র ভূমিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এমনই একজন মহাপুরুষ মহাযোগী শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়। তিনি যে মহাপুরুষ ছিলেন সেকথা তাঁর জীবদ্দশায় কেউ জানতেন না, তিনি নিভৃতে তাঁর দিনলিপির মাধ্যমে তার প্রমাণ রেখে গেছেন। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট লিখেছেন "আজ হম মহাপুরুষ হুয়ে"।—আজ আমি মহাপুরুষ হলাম। ১৭ই আগস্ট লিখেছেন- "মহাপুরুষ হম হয়, সূর্য্যমে এ্যায়সা দেখা হম হি ব্রহ্ম হয়।"—আত্মসাধন করতে করতে আত্মসূর্যের ভেতর তিনি দেখতে পেলেন এবং জানতে পারলেন যে তিনিই মহাপুরুষ এবং তিনিই ব্রহ্ম। পরের দিন ১৮ই আগস্ট তিনি আরো নিশ্চিতভাবে জানতে পারলেন যে তাঁরই রূপ হতে এই জগতের প্রকাশ এবং তিনিই একমাত্র পুরুষ, তিনি ব্যতীত এই দুনিয়ায় আর কেউ পুরুষ নেই। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন— হমারাই রূপসে জগত প্রকাশিত হম হি এক পুরুষ হয় আউর কোই নহি।"—যোগী যোগসাধনার মাধ্যমে যখন ব্রহ্মের সঙ্গে লয়প্রাপ্ত হন ব্রহ্ম ব্যতীত আর যখন কিছু থাকে না, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন তখন যোগীর এই উপলব্ধি আপনা হতেই হয়ে থাকে। এখন শ্যামাচরণেরও এই অবস্থা। তাই আজকের দিনে মনুষ্য সমাজে তথা সমগ্র সাধু সমাজে এই কথাই প্রচলিত আছে যে যদি সত্যকার আত্মসাধন বা যোগসাধন লাভ করতে চাও এবং যদি সঠিক আত্মোন্নতি চাও তবে শ্যামাচরণ প্রদর্শিত ক্রিয়াযোগ সাধন কর, যা সর্বকালের মানুষের পক্ষে সহজকর্ম বলে গণ্য। তাই দেখা যায় বর্তমানে ভারতবর্ষে আত্মলাভেচ্ছু মানুষের কাছে আত্মসাধন বা যোগসাধনের কথা আলোচনা করতে গেলে সর্বপ্রথম যাঁর নাম আপনাহতেই এসে পড়ে তিনি শ্যামাচরণ। অর্থাৎ শ্যামাচরণকে বাদ দিয়ে এখন সহজ যোগসাধনের কথা বর্তমান কালের মানুষ

ভাবতেই পারে না। মহাপুরুষগণ গোপনে এবং শান্তির মাধ্যমে যোগধর্মের প্রতিষ্ঠা করে যান কিন্তু অবতারগণও তাই করেন বটে আবার প্রয়োজনবোধে বলপূর্বক ও পূর্ণক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মস্থাপন করেন।

মহাপুরুষগণ যদিও অনন্ত শক্তি সম্পন্ন হন বটে কিন্তু তাঁদের কর্মের পরিধি হয় সীমাবদ্ধ কিন্তু অবতারের কর্মের পরিধি সীমাহীন। উভয়েই পূর্ণব্রহ্ম কেবল দায়িত্বের ও প্রকাশের তারতম্য। মহাপুরুষ শ্যামাচরণও যে অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ছিলেন সেকথা তিনি ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মে লিখেছেন—"যো কুছ ইরাদা করে সো কর সকতা হয়।"—এখন যা কিছু ইচ্ছা করি সব করতে পারি। তিনি কখনো লিখেছেন আমিই কৃষ্ণ, কখনও লিখেছেন আমিই শিব, কখনও লিখেছেন আমিই ভগবান্, আবার কখনও লিখেছেন আমিই ব্রহ্ম। এইভাবে তিনি তাঁর নিজের পরিচয় নিভৃতে গোপন দিনলিপির মাধ্যমে নিজেই রেখে গেছেন। তাঁর এই পরিচয় বা তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর জীবদ্দশায় সম্ভবত কেউ জানতেন না। তিনি যে কেবল মহাপুরুষ ছিলেন তাই নয়, তিনি পুরুষোত্তমও বটে। এ বিষয়ে তিনি ১৮৭৩ খ্রীঃ ১২ই নভেম্বর লিখেছেন—"হমহি মহাপুরুষ পুরুষোত্তম।"—আমিই মহাপুরুষ পুরুষোত্তম। অতএব এইপ্রকার মহাপুরুষ পুরুষোত্তম যিনি তিনি মানব কল্যাণার্থে এবং সত্যযোগ-ধর্ম পুনঃ স্থাপন করতে চারযুগেই মানবদেহ নিয়ে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন এতে আর আশ্চর্য কি? মহাত্মা কবীর এবং শ্যামাচরণ যে একই ব্যক্তি তা তিনি নিজেই বলে গেছেন। তিনি তাঁর গোপন দিনলিপিতে এক জায়গায় লিখেছেন—"যো কবিরা সোই সূর্য্য সোই ব্রহ্ম সোই হম।"—অর্থাৎ যিনি কবীর তিনিই আত্মসূর্য তিনিই ব্রহ্ম তিনিই আমি। আবার লিখেছেন—"জো কবিরা সূর্য্য কা রূপ সোই অবিনাশী ব্রহ্ম সোই হম।"—যিনি আত্মসূর্যরূপী কবীর তিনিই অবিনাশী ব্রহ্ম আবার তিনিই আমি। যোগী যোগসাধনার মাধ্যমে কূটস্থে আত্মসূর্যে যখন স্থায়ী-ভাবে স্থিতিলাভ করেন তখন তিনি সবই এক দেখেন। যোগিরাজও এক্ষেত্রে আত্মসূর্যের ভেতর কবীর, ব্রহ্ম এবং তিনি নিজেকে একই দেখছেন অর্থাৎ যিনি কবীর তিনিই শ্যামাচরণ। অতএব সত্যযুগে এই শ্যামাচরণরূপী কবীরই সত্যসুকৃত নামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; ত্রেতাতে মুনীন্দ্র নামে, দ্বাপরে করুণাময় নামে এবং কলিযুগে কবীর নামে এবং পরে শ্যামাচরণরূপে। সদামুক্ত বিহঙ্গ শ্যামাচরণ এইভাবে যুগে যুগে, কল্পে কল্পে ধর্মস্থাপনের জন্য এই ধরাধামে বারবার অবতীর্ণ হয়েছেন এবং যখনই যেখানে যোগধর্মের অবসাদ দেখা দিয়েছে তিনি তা অপসারণ করেছেন। এইভাবে সর্বকালে শ্যামাচরণ মানব কল্যাণে ব্রতী আছেন অর্থাৎ যিনি সত্যসুকৃত, তিনিই মুনীন্দ্র, তিনিই করুণাময় আবার তিনিই কবীর ও শ্যামাচরণ। একই

মুক্তাত্মা মহাপুরুষ পুরুষোত্তম বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দেহে তাঁর আগমনধারা অব্যাহত রেখেছেন এবং চিরকাল রাখবেন যতদিন এই পৃথিবীতে মানব অস্তিত্ব বর্তমান থাকবে।

স্বয়ং ভগবানও যদি মানবদেহ ধারণ করে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন তবে তাঁকেও সাধন করে নিজ স্বরূপ জানতে হয়। যোগিরাজেরও তাই হয়েছিল। তিনি ১৮৬৮ খ্রীঃ ২৭শে নভেম্বর রাণীক্ষেতের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং কয়েকদিন পর তিনি সেখানে পৌছান। তিনি গুরুসান্নিধ্য থেকে বিদায় নিয়েছিলেন ১৮৬৯ খৃঃ ১৫ই জানুয়ারী। অর্থাৎ প্রায় দেড়মাস কাল তিনি রাণীক্ষেতে ছিলেন। যদি ধরে নেওয়া হয় যে গুরুসান্নিধ্যে পৌঁছবার পূর্বে হয়ত কয়েকদিন তাঁর রাণীক্ষেতে অতিবাহিত হয়েছিল এবং তারপর গুরুসান্নিধ্যে পৌঁছেছিলেন। অতএব এটাই স্বাভাবিক যে দেড়মাসের কিছু কম সময় তিনি তাঁর গুরুসান্নিধ্য লাভ করেছিলেন ওই পার্বত্য অঞ্চলে। এবং ওই সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর গুরুর নিকট হতে সমস্ত যোগ সাধন তত্ত্ব শিখে নিয়েছিলেন। তারপর তাঁর সাধন জীবন অতিক্রম করতে করতে ১৮৭৩ খৃঃ ১৩ই আগষ্ট যোগসাধনার মাধ্যমে তাঁর নিজের পরিচয় জানতে পারলেন যে তিনি একজন মহাপুরুষ এবং ঐ বছরেরই ১২ই নভেম্বর আরও জানতে পারলেন যে তিনি মহাপুরুষ পুরুষোত্তম। অর্থাৎ মহামায়ার প্রভাবে জীবভাবাপন্ন অবস্থায় স্বয়ং ভগবানও ভুলে যান তাঁর নিজের স্বরূপ। যোগিরাজও তাই ভুলে গিয়েছিলেন তাঁর নিজের স্বরূপ এবং কেন তাঁর এই পৃথিবীতে আগমন। তাই তাঁর মত পুরুষোত্তমকেও সাধন করে জেনে নিতে হল যে তিনি কে এবং কেনই বা তাঁর এই পৃথিবীতে আগমন। এই জীবভাবাপন্ন অবস্থা বা প্রাণের চঞ্চল অবস্থাকে কাটিয়ে, মহামায়ার প্রভাবের ঊর্ধ্বে উঠে নিজের স্বরূপ জানতে তাঁকে মাত্র ৪ বছর ৮ মাস কঠোর তপস্যায় ব্রতী থাকতে হয়েছিল। কিন্তু তার জন্য তাঁকে সংসার বা কোনো কিছু বাহ্যত্যাগ করতে হয়নি, বিজ্ঞান সম্মত আত্মসাধনার এটাই বিশেষত্ব।

"আঁখ উপর স্থির হোগিয়া ব্রহ্ম দেখনে লগা—শ্বাসা ভিতর ভিতর চলেনে লাগা মন স্থির ভয়া—আব প্রণাম করেনেকা এরাদা নাহি করতা আপকে আপ প্রণাম হোতা হয়—ভিতর ভিতর জিহ্বা গলেকে ভিতর বৈঠ গয়া" ॥ ১৯ ॥

অভ্যন্তর্মুখী আত্মকর্ম করতে করতে যখন পঞ্চপ্রাণ (প্রাণ, আপান, ব্যান, উদান, সমান) স্থির হয়, আর যখন শ্বাসের গতি বাইরে নির্গত হয় না, ভেতর ভেতর সুষুম্নাপথে চলতে থাকে তখন আপনা হতেই মন স্থির হয়। বায়ু স্থির হলে আপনা হতেই মন স্থিরত্ব লাভ করে, এই অবস্থায় মনের গতি রহিত হওয়ায় আর বাইরের বস্তুর প্রতি ধাবিত হয় না। তখন চিন্তারহিত হওয়ায় মন ও প্রাণের গতির ঊর্দ্ধে কূটস্থে স্থায়ী স্থিতিলাভ হওয়ায় যোগীর চক্ষুদ্বয় কম্পনরহিত হয় এবং আধাবোঁজা অবস্থায় কূটস্থে স্থায়ী স্থিতিলাভ হয়। এই অবস্থায় যখন মন চিন্তাশূণ্য হয়ে দর্পণ-স্বরূপ কূটস্থে শূন্যব্রহ্ম দেখতে থাকে কিন্তু তখনও চঞ্চলমনের অবসানে স্থিরমনের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে। তাই সেই স্থির মন ব্রহ্ম দেখে এটাও দ্বৈত অবস্থা কারণ তখনও দেখাদেখি বর্তমান। কিন্তু আরো আত্মকর্মরূপ সাধন ও ওঁকার ক্রিয়া করতে থাকলে যখন চঞ্চলমন সম্পূর্ণরূপে স্থির মনে রূপান্তরিত হয়, যখন শূন্যব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু থাকে না, যখন নিজ সত্ত্বারও অবলুপ্তি ঘটে তখন কে কাকে প্রণাম করবে এবং কে কাকেই বা দেখবে? প্রণাম করতে গেলেই দুই হোলো এবং ইচ্ছা বর্তমান থাকা চাই। কিন্তু যখন শ্বাসের গতি রহিত, যখন ইচ্ছাতীত, যখন মনাতীত, যখন যে প্রণাম করবে এবং যাকে প্রণাম করবে এই দুই সত্তা নেই, তখন প্রণামও নেই। অতএব প্রণামটাও এবং প্রণাম করাটাও দ্বৈতাবস্থা। এই দ্বৈতাবস্থা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ দুঃখ। কিন্তু যখন দ্বৈতাবস্থা নেই, প্রণাম নেই, যখন সবকিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে নিজ সত্তার সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্তি প্রাপ্তে একমাত্র শূন্যব্রহ্মই বর্তমান, আর যখন দেখাদেখি নেই, জানাজানি নেই কেবল তখনই সুখ। এই অবস্থায় সুখ বলারও কেউ নেই, জানারও কেউ নেই। এ এক বিচিত্র অবস্থা, যার হয় সেই অনুভব করে, কিন্তু জানে না। তখন কেবল শূন্যব্রহ্ম থাকায় সেই ব্রহ্মই 'আমি' এরূপ অনুভব হয় এবং তখন কোনো প্রকার প্রণাম না থাকলেও আপনা হতেই নিজেই নিজেকে প্রণাম হয়। তখন ভক্ত এবং ভগবান্ এই দুই সত্তা থাকে না, তাই এই প্রণাম করতে হয় না, এই প্রণাম আপনা হতেই হয়, এই প্রণামই প্রকৃত প্রণাম। যোগীর এই অবস্থার কথাই গীতাতে শ্রীভগবান্ বলেছেন—মাং নমস্কুরু। এই রহস্যের কথা বোঝাতে গিয়ে শ্রীভগবান্ এই বাক্যটি দুবার প্রয়োগ করেছেন। তখন যে আমি

বর্তমান থাকে সেই আমিই প্রকৃত আমি, ব্রহ্ম আমি, এক আমি। সেই একে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনি বলেছেন—"ওহি একরূপ মহাপুরুষকা জো তমাম ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিক হয়"।— অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ ওই মহাপুরুষের একই রূপ, তাঁর কোনো পরিবর্তন নেই; তিনিই সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী আছেন। এরপর অদ্বৈতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে, ব্রহ্ম এবং তিনি মিলে মিশে একাকার হয়ে, লয়প্রাপ্ত হয়ে বললেন—"হমারেই রূপ সব জগই—হম ছোড়ায় কোই নহি, উহ রূপ হয় সূক্ষ্ম মে ওহা ন দিন ন রাত।"—এই জগতের সবকিছুতেই আমার রূপ অর্থাৎ আমি ছাড়া এই জগতে আর কিছু নেই। ব্রহ্মই সবকিছুর উৎসস্থল ও আদিকারণ। যোগী যোগসাধন করতে করতে ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়ে যখন নিজেই ব্রহ্ম হয়ে যান তখন এই অবস্থা আপনা হতেই হয়। প্রাণের চঞ্চলতাই দ্বৈত এবং স্থিরত্বই অদ্বৈত, এই স্থিরত্ব স্বতঃ প্রকাশমান। মেঘ সরে গেলে যেমন সূর্যের প্রকাশ, তেমনি চঞ্চলতার অবসানে স্থিরত্বের প্রকাশ। সূর্যের সাময়িক আবরণ যেমন মেঘ, তেমনি স্থিরত্বের আবরণ চঞ্চলতা। এই স্থিরত্বই ব্রহ্ম, কারণ 'নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্চতে'। যোগী যখন স্থির মহাশূন্যরূপী ব্রহ্মে লয় হন তখন সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়ায় এই শূন্যের ভেতর যে মহাশূন্য তাতে অবস্থান করেন। সেই অবস্থায় দিনও নেই, রাতও নেই, স্বয়ং প্রকাশ, স্বতঃ প্রকাশ। আবার এই অবস্থার কথা বলতে গিয়ে কবীর দাস বলেছেন—'প্রকট অগোচর।' যোগীর এ এক উত্তুঙ্গ অবস্থা, সকল যোগের শেষ লয়যোগের অবস্থা অর্থাৎ বৃহৎ সত্তার সঙ্গে লীন হওয়ায় স্বাতন্ত্র্যলোপ অবস্থা, এই অবস্থাই যোগীর চরম ও পরমতম কাম্য। এই অবস্থার কথা কিছুই বলা যায় না, তবুও তিনি ভক্তদের উপদেশ ছলে বলতেন "আইনেমে দুই দেখনেসে অহংকার এক দেখনেসে কুছ নহি"— দর্পণের সামনে নিজের প্রতিবিম্ব দেখলে কত প্রকার রঙ-ঢঙ উপস্থিত হয়, ফলে অহংকার আসে, কারণ তখন আমি এবং আমার প্রতিবিম্ব এই দুই বর্তমান। কিন্তু যখন আমি এবং আমার প্রতিবিম্ব এই দুই মিলে এক হয়ে যায়, কেবল আমিই উপস্থিত, প্রতিবিম্বের অভাব তখন দুই না থাকায় অহংকার নেই। চঞ্চলতার দরুন দেহবোধ, মন ইত্যাদিই প্রতিবিম্ব। কিন্তু যখন এই প্রতিবিম্বগুলি নেই, কেবল শূন্যস্বরূপ আমিই বর্তমান তখন অহংকার কোথায়? তাই তিনি বলছেন যখন মহাশূন্যস্বরূপ এক আমিই বর্তমান তখন কিছুই নেই, কারণ ব্রহ্ম দ্বন্দ্বাতীত। যখন কেবল এক ব্রহ্মই অবশিষ্ট, দুই এর অভাব তখন দ্বন্দ্বাতীত, গুণাতীত। কিন্তু যখন দুই তখন অহংকার, দ্বন্দ্ব সবই বর্তমান। এই দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা প্রমাণাতীত। এই প্রমাণাতীত অবস্থাই ক্রিয়ার পরাবস্থা, এই অবস্থায় সর্বদা থাকলেই তত্ত্বজ্ঞান। তাই তিনি ভক্তদের সর্বদা এই ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাকার উপদেশ দিতেন

কারণ ক্রিয়ার পরাবস্থায় 'আমি' থাকে না অতএব তুই থাকে না কেবল কিছুই নয়রূপ ব্রহ্মআমি বা স্থিরআমি বা শূন্যআমি বর্তমান। সেই আমিই আবার কাকে প্রণাম করবে? এই অবস্থায় জিভ তালুকুহরে স্থিরভাবে লেগে থাকায় খেচরীসিদ্ধি হয় এবং কূটস্থে শূন্যব্রহ্মে স্থায়ী স্থিতিলাভ হওয়ায় একমাত্র শূন্যই বর্তমান থাকে। এই শূন্যই ব্রহ্ম, এই শূন্যই আমি, এই শূন্য হতেই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, এই শূন্যই সবকিছুর মূল বা আদিকারণ তাই 'এই শূন্যই যোগীর গন্তব্যস্থল এবং অবস্থান স্থল। চঞ্চলতাই দুঃখ, তাই চঞ্চলতার নিবৃত্তিতে সুখময়ী স্থিরমহাশূন্যে যোগী যতক্ষণ স্থায়ী স্থিতিলাভ করতে না পাবেন ততক্ষণ তাঁর বিশ্রাম নেই। এই স্থিরমহাশূন্যে স্থায়ী স্থিতিলাভই পূর্ণ বিশ্রাম। তখন সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ। তাই যোগিরাজ পুনরায় বলেছেন—"স্থির বুদ্ধিসে মালুম হোতা হয—জ্যোতি স্বরূপ বড়া নেসা বড়া আনন্দ। ওঁকার দ্বারা যাহা জানিতে ইচ্ছা করে তাহা তাব হয়।"— স্থির বুদ্ধিই বুদ্ধি, চঞ্চল বুদ্ধি বুদ্ধিই নয়। এই স্থির বুদ্ধির উদয়ে শূন্যব্রহ্মকে জানা যায়। তখন এই শূন্যব্রহ্মের আলোহীন ধ্রুবতারাস্বরূপ যে আত্মজ্যোতি দেখা যায় তা দর্শনে প্রচুর নেশা ও আনন্দের উদয় হয়। এই নেশা ও আনন্দই তখন যোগীকে আমি হারা করিয়ে শূন্যব্রহ্মে স্থায়ী স্থিতিলাভ করায়। এই প্রকারে বায়ুস্থিরের পর স্থিরবুদ্ধির উদয়ে যোগী ওঁকার ক্রিয়া করতে থাকলে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান জ্ঞান হয় এবং আধ্যাত্ম বিষয়ের গুহ্যতম রহস্যসহ যা কিছু জানতে চায় তার প্রকাশ হয়। এই অবস্থায় যোগী সর্বজ্ঞত্ব লাভ করেন। তখন তাঁর কাছে আর কিছু অজানা থাকে না। তখন তিনি সাকার এবং নিরাকার উভয় বিষয়ে প্রাজ্ঞ হন। তখন যোগীর সুখ দুঃখ, ভালমন্দ, অর্থ-অনর্থ ইত্যাদি বিষয়ে সমদৃষ্টি হওয়ায় পণ্ডিত হন। সমদৃষ্টিতাই পণ্ডিতের লক্ষণ। তখন তাঁর কাছে আর উচ্চনীচ ভেদাভেদ থাকে না। এই প্রকার পণ্ডিতেরই বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি হয় এবং তিনি তখন যা বলেন তাই বেদ নামে উক্ত হয়। যোগিরাজও এই অবস্থায় উপনীত হয়ে ১৮৭৩ খ্রীঃ ২৩শে আগষ্ট বলেছেন—"জো হম কহে সো বেদ হয়—য়ানে নিশ্চয় জানে।"

অদ্বৈত কোনো বাদবিতণ্ডা নয়। অদ্বৈত এক অবস্থা মাত্র। অদ্বৈত শব্দের অর্থ দ্বিতীয়তাবিহীন, যাঁর দ্বিতীয় কেউ নেই বা যে অবস্থায় গেলে আর দুই বলার কেউ নেই। কোন্ বস্তু কেমন তা বোঝাতে গেলে সেই রকমের অপর বস্তুর দ্বারা বোঝাতে হয়। প্রমাণ হলেই দুই হোলো। ব্রহ্ম কোনো বস্তু নয় এবং যেহেতু তার কোনো দ্বিতীয় নেই, অতএব প্রমাণাতীত। ব্রহ্মই যখন সবকিছুর মূল বা আদিকারণ তখন ব্রহ্মের কোনো দ্বিতীয় থাকা সম্ভব নয়। এই যে জগদাদি যা কিছু প্রত্যক্ষ হয় এ সবই প্রাণের চঞ্চলতা প্রযুক্ত, যাকে অবিদ্যা বা মায়া বলে এবং এই প্রত্যক্ষের

মধ্য দিয়ে সেই একমাত্র স্থির পরব্রহ্মই প্রতিভাসিত। জীব, জগৎ এবং ব্রহ্ম মূলতঃ একই কেবল অবস্থাভেদ মাত্র। ব্রহ্ম স্থির এবং আর সব কিছু চঞ্চল। চঞ্চল অবস্থা থেকেই যেহেতু সবকিছুর উৎপত্তি এবং অবস্থান হওয়ায় তাদের সদৃশ অপর বস্তু থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম সদা স্থির ও উৎপত্তি বিনাশহীন হওয়ায় সদা একরূপ, তাই তার সদৃশ কেউ নেই। জীবের বর্তমান অস্তিত্ব যেহেতু চঞ্চল, যদি কোনো প্রকারে স্থির হতে পারে তখন সেই ব্রহ্মে লয় হওয়ায় নিজেই ব্রহ্ম হয়ে যায়। চঞ্চলতাই দ্বৈত, স্থিরত্বই অদ্বৈত। চঞ্চলতার পূর্ণ অবসান এবং স্থিরত্বের পূর্ণ প্রাদুর্ভাব এই সন্ধিক্ষণের বিষয় বলতে গিয়ে যোগিরাজ তাঁর সাধন উপলব্ধিতে লিখেছেন—"হম বিনা কুছ নহি ফির হমভি নহি খালি শূন্য নির্ম্মল ওহি আপনে পদ। অব শ্বাসা ভিতর ভিতর চলে লগা—ওহি শ্বাসা নারায়ণ হয় আউর ওহি কারণ বারি। এহি কা নাম পার উতরনা কহতে হয়—ইসিনেসেমে জোগিলোগ পড়ে রহতে হয়।"—আমি ব্যতীত আর কিছু নেই কারণ এখন আমিই ব্রহ্ম। এই আমি সত্য-আমি, ব্রহ্ম-আমি। আবার এই আমিও নেই, কেবল অবশিষ্ট থাকল নির্মল স্বচ্ছ মহাশূন্য। সেই মহাশূন্যই আপন পদ অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ। এই অবস্থায় শ্বাস ভেতর ভেতর অর্থাৎ সুষুম্নায় অতি সামান্য চলছে। এই যে সামান্যতম অভ্যন্তর গতিবিশিষ্ট শ্বাস তিনিই নারায়ণ এবং এই অবস্থাই সবকিছুর উৎপত্তিস্থল, এই অবস্থাই ব্রহ্মযোনি। এই অবস্থায় দেহ নেই, মন নেই, ইচ্ছা নেই, সব মিলেমিশে একাকার। এই অবস্থায় যোগী চঞ্চলতার পূর্ণ অবসান এবং স্থিরত্বের পূর্ণ প্রকাশরূপ প্রান্তসীমারূপী কূটস্থে স্থায়ী স্থিতিলাভ করেন। কূটস্থের নীচে ক্রমশঃ চঞ্চলতার প্রকাশ এবং ঊর্ধ্বে একমাত্র স্থিরত্বই বর্তমান। তাই যোগী এই প্রান্তসীমাকে অতিক্রম করে পূর্ণ স্থিরত্বে স্থায়ী স্থিতিলাভ করতে চান। কূটস্থের নীচে থাকলেই জগৎবোধ। তাই যোগীর কাম্য এই ভবসংসাররূপ জগৎবোধের ঊর্ধ্বে সহস্রারে স্থির ব্রহ্মে স্থায়ী আসন লাভ করা। কূটস্থে পৌছান পর্য্যন্তই সাধন, তার ঊর্ধ্বে আর সাধন থাকে না। তখন গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্। এই যে দুদিকের টানাটানি একে অতিক্রম করে ঊর্ধ্বে চলে যাওয়াকেই বলে 'পার উতরনা' অর্থাৎ পরপারে যাওয়া। এই পরপারে যে নিশ্চল অদ্বিতীয় মহাশূন্যরূপী ব্রহ্ম বর্তমান সেখানেই অর্থাৎ সেই অবস্থায় মহাযোগিগণ অবস্থান করেন। এই অবস্থাকে পরব্রহ্ম বলে।

"তনমন বচন কর্ম্ম লাগাওএ—ইসিকো অহিংসা কহতে হয়" ॥ ২০ ॥

আভিধানিক মতে অহিংসা শব্দের অর্থ হিংসাশূন্যতা অর্থাৎ মনের হিংসাশূন্য অবস্থাই অহিংসা। এই অহিংসা সম্পূর্ণরূপে মনোধর্ম। কিন্তু কোন্ মনের? মন দুই প্রকার—চঞ্চল ও স্থির। চঞ্চল মনকেই জীব মন বলে জানে কিন্তু এই চঞ্চল মনের অতীতে যে স্থির মন আছে জীব তা জানে না। তাই জীব চঞ্চল মন ও চঞ্চল বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় এবং সব কর্ম করে থাকে। এই চঞ্চল মন স্বয়ং ইন্দ্রিয় হওয়ায় ঈশ্বর সান্নিধ্যে পৌঁছতে সক্ষম নয়। এই চঞ্চল মন যতক্ষণ বর্তমান ততক্ষণ জীব চঞ্চল মন হতে জাত যে হিংসা তাতেই অবস্থান করে, প্রকৃত অহিংসার সন্ধান পায় না অর্থাৎ জীব যতক্ষণ চঞ্চল মনের অধীনে থাকে ততক্ষণ তার কাছে হিংসাশূন্য অবস্থা অনধিগম্য। সর্বপ্রকারে জীব বধ হতে বিরতি, কায়মনোবাক্যে পরোপীড়াবর্জন, অপরের অনিষ্ট না করা এগুলি অহিংসার লক্ষণ। কিন্তু যতক্ষণ মন হিংসাশূন্য অবস্থা লাভ না করে ততক্ষণ এগুলি দৃঢ়ীকৃত হয় না। অতএব হিংসা চঞ্চল মনের ধর্ম এবং অহিংসা সম্পূর্ণরূপে স্থির মনের ধর্ম। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিময় অবস্থাই জীবের বর্তমান অস্তিত্ব। এই গতিময় অবস্থায় হিংসার উদয়। অতএব যতক্ষণ শ্বাসের গতি বহির্মুখী বা চঞ্চল ততক্ষণ হিংসা অবশ্যই বর্তমান, কিন্তু যখন অভ্যন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করতে করতে শ্বাসের গতিহীন অবস্থা হয় তখন মন আপনা হতেই স্থির হয়, এই স্থিরাবস্থায় বা এই মনশূন্য অবস্থায় হিংসাশূন্য অবস্থা আপনা হতে উদিত হয়। এই মনশূন্য অবস্থা লাভের পূর্বে যে যতই অহিংসার বাণী প্রচার করুক না কেন বা অসূয়া হতে দূরে থাকার চেষ্টা করুক না কেন তার অহিংসায় প্রতিষ্ঠা লাভ হয় নি। অতএব অহিংসায় প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে প্রথমেই মনশূন্য অবস্থা বা প্রাণের চঞ্চলাবস্থার নিবৃত্তি প্রয়োজন। এই অবস্থা লাভ প্রাণকর্মসাপেক্ষ। এটাই ক্রিয়াযোগের উদ্দেশ্য ও বিজ্ঞান। ক্রিয়া অর্থে কর্ম, অতএব যা ক্রিয়াযোগ তাই কর্মযোগ। যে কর্মের দ্বারা পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন ঘটে তাই কর্মযোগ বা ক্রিয়াযোগ নামে আখ্যাত। প্রাণের গতিময় অবস্থাই কর্মপদবাচ্য, কারণ এই গতি হতেই সকল কর্মের উদয়। অতএব গতিই জীব, গতিই কর্ম এবং এই গতি যতক্ষণ বর্তমান ততক্ষণ গতিই ধর্ম। তাই জীব এই গতিকে ধরেই অগতিতে পৌঁছায় অর্থাৎ গতিকে ধরেই গতিহীন অবস্থায় পৌঁছাতে হবে, যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। (নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্যতে)। অতএব যতক্ষণ প্রাণের গতি বর্তমান ততক্ষণ জীবভাব অবস্থাও বর্তমান এবং হিংসাও বর্তমান। কিন্তু যখন প্রাণ গতিহীন, তখন মনশূন্য ও ইচ্ছাশূন্য হওয়ায় শিবভাব এবং তখন হিংসাশূন্য হওয়ায় অহিংসা অর্থাৎ হিংসা নেই। অতএব যা অহিংসা তাই শিবভাব এবং তাই

নির্বাণ অবস্থা। বাণ অর্থে শর বা শ্বাস অর্থাৎ যখন শ্বাসের গতিহীন অবস্থা তাই নির্বাণ। বুদ্ধ যীশু কবীর প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই প্রকার নির্বাণ ও অহিংসা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন, তাই তাঁদের কাছে উচ্চ-নীচ কোনো প্রকার ভেদাভেদ ছিলো না। যোগিরাজও এই প্রকার অহিংসা বা নির্বাণ অবস্থা লাভ করে জগতবাসীকে জানালেন যে যতক্ষণ দেহ, মন, বচন ও কর্ম এই চারটিকে স্বতন্ত্র দেখ ততক্ষণ অহিংসা সুদূর পরাহত কিন্তু প্রাণকর্ম করতে করতে বায়ু স্থির অবস্থায় বা গতিহীন অবস্থায় যখন এই চারটির স্বাতন্ত্র্যতার অবসানে একের উদয় হয় অর্থাৎ যখন দ্বৈতের অবসানে এবং গতিবিহীন অবস্থায় যখন কেবল মহাশূন্যই বর্তমান, তাকেই অহিংসা বলে ; তখন কায়মনোবাক্যে সকল কর্মে হিংসার অভাব হওয়ায় অহিংসা। এই অবস্থাই অদ্বৈত। তাই যোগিরাজ বলেছেন—দ্বৈতই মহাদুঃখের মূল। চঞ্চলতাই শিবা এবং স্থিরত্বই শিব। তাই যোগিরাজ বলেছেন—আত্মার মৃত্যু নেই, কারণ আত্মাই মহাকালস্বরূপ। কিন্তু স্থিতিপদ কালেরও ওপরে। মহাকাল সমুদ্রস্বরূপ গতিহীন, জীব নদীর ন্যায় সেই সমুদ্রে পড়ে। কালে সতর্ক থাকলে মৃত্যু হয় না। জীবের পক্ষে কালাকাল মনে হয়, কালের অকাল নেই, এজন্য জীবের কর্তব্য সমস্তকালেই কালরূপী হংসে শরণাপন্ন হয়ে থাকা। শ্বাস-প্রশ্বাসই কালরূপী হংস। সেই হংসের শরণাপন্ন হলে কালাতীত অবস্থায় অর্থাৎ কালের অতীত সমুদ্রস্বরূপ গতিহীন মহাকালে বা স্থিতিপদে যাওয়া যায়। সেই অনন্ত মহাকাল যা অবিচ্ছেদ্যভাবে চলছে তা অখণ্ড। কেবলমাত্র শ্বাস-প্রশ্বাসের টান ফেলার মাধ্যমে (চঞ্চল অবস্থায়) সেই অখণ্ড কালকে খণ্ড বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা খণ্ড নয়। সেই অখণ্ড মহাকাল ঘটস্থ হয়ে অর্থাৎ দেহস্থ হয়ে হংসরূপে (শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে) জীবদেহে বিরাজমান। সেই শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ হংসের শরণাপন্ন হলে অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলার অতীতে অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করতে থাকলে যখন স্থিতিপদের উদয় হয় তখন আর কালাকাল থাকে না। তখন সমুদ্রস্বরূপ গতিহীন মহাকালে রূপান্তরিত হওয়ায় জন্ম-মৃত্যু থাকে না। এই প্রকার গতিহীন অবস্থাই অহিংসা পদবাচ্য এবং গতিপূর্ণ অবস্থা হিংসা পদবাচ্য অর্থাৎ যতক্ষণ শ্বাসের গতি বর্তমান ততক্ষণ হিংসা এবং যখন কেবল-কুম্ভক অবস্থায় গতিহীন তখন অহিংসা। ক্রিয়ার পরাবস্থা বা এই প্রকার স্থিরাবস্থাই কৃষ্ণপদবাচ্য, তিনিই স্থির প্রাণরূপ জীবনকৃষ্ণ। এই প্রকার ক্রিয়ার পরাবস্থায় অর্থাৎ স্থিরাবস্থায় যিনি সর্বদার জন্য প্রতিষ্ঠিত তিনিই অহিংসায় প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হন এবং তখন তাঁকে হিংস্র প্রাণীও আর হিংসা করে না।

"অব ভিতর ভিতর কুছ কুছ জানে লাগা—বড়া কঠিন কবারা—ইহা কোই হয় নহি কি জিসকো পকড়কে হোসমে আদমি রহে—জয়সে নিদ—লেকন ঠিক নিদ নহি হয় - হমেসা ওঁকার ধ্বনি—রাজা পুরুষোত্তম সামনে খড়ে—সন্তোষামৃত পান—ইস মজেকে আগে কোই মজা জো করে সো চাখে নাহিতো বহে গোতা খাতে।" ॥ ২১ ॥

সাধক এবং যোগীর মতবাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। সাধক ঈশ্বরবাদী, যোগী ব্রহ্মবাদী। সাধক চান চিনি খেতে এবং চিনির রসাস্বাদন করতে। যোগী চান নিজেই চিনি হতে অর্থাৎ সাধক চান ঈশ্বরের সঙ্গে লীলা করতে এবং যোগী চান ব্রহ্মে লীন হতে। তাই সাধক দ্বৈতবাদী কিন্তু যোগী ব্রহ্মবাদী বা অদ্বৈতবাদী। ব্রহ্মই যে সবকিছুর আদিকারণ বা উৎসস্থল একথা সাধকও স্বীকার করেন বটে কিন্তু তাঁর মূল লক্ষ্য কৃষ্ণ, বিষ্ণু, নারায়ণ, শিব, কালী, দুর্গা ইত্যাদি। এগুলিকেই সাধক ব্রহ্মজ্ঞানে গ্রহণ করেন। কিন্তু যোগীর কাছে এগুলি সবই মায়িক। যোগীর মতে যতক্ষণ দ্রষ্টা, দৃশ্য, লীলা ইত্যাদি বর্তমান থাকে ততক্ষণও দ্বৈত। তাই বলা হয় সাধকের সাধনা যেখানে শেষ যোগীর সাধনা সেখানে শুরু। সাধকের কাছে দেখাদেখি, জানাজানি, রসাস্বাদন, লীলা ইত্যাদি থাকে, যোগী এ সবের উর্ধ্বে যেতে চান। ব্রহ্ম যেহেতু চিরঅচঞ্চল, স্থির, নিরাকার ও মহাশূন্যরূপী, তাই যোগীকে বলা হয় নিরীশ্বরবাদী বা শূন্যবাদী। কিন্তু আসলে যোগী এই সমস্ত কৃষ্ণ বিষ্ণু ইত্যাদি দেখাদেখি জানাজানি লীলা ইত্যাদিকে অস্বীকার করেন না। এগুলি যোগীর কাছে এক এক অবস্থামাত্র। এগুলি মায়িক। তিনি এই মায়িক অবস্থাগুলি ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করে মহাশূন্যরূপী স্থিরব্রহ্মে লয় হতে চান। কিন্তু সাধক এইপ্রকার দেখাদেখি, রসাস্বাদন, লীলা ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ এবং এখানেই তাঁর সাধনার শেষ, কারণ তাঁর সাধনার মূল লক্ষ্য এই পর্য্যন্ত। তাই এই লীলা ইত্যাদির উর্ধ্বে যে স্থিরব্রহ্ম তাতে লয় হওয়া সাধকের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সাধক নানান দেবদেবীর মূর্তি, ইষ্টদেবতা ইত্যাদির মাধ্যমে বা বাহ্যবস্তুর অবলম্বনে ধ্যানস্থ হবার চেষ্টা করেন। তাই তিনি ঈশ্বরের নাম ও গুণগান করেন। বাহ্য অবলম্বন বা কল্পিত মূর্তিই তাঁর প্রাথমিক সহায় হয়। যোগীর এসবের কিছু প্রয়োজন নেই। তাই যোগী নিজের ভেতরেই নিজেকে খোঁজার চেষ্টা করেন, কারণ তিনি জানেন যে তিনি নিজেই ব্রহ্ম, কেবল চঞ্চলতা প্রযুক্ত অবস্থান্তর ভেদে আছেন। যোগী জানেন যে তিনি নিজেই অমৃতের পুত্র। মানুষের পুত্র যেমন মানুষ হয়, তেমনি অমৃতের

পুত্র অমৃত। ব্রহ্মই অমৃত। অতএব তিনি নিজেই ব্রহ্ম বা অমৃত। কেবল চঞ্চলতা প্রযুক্ত যে সাময়িক আবরণ, যাকে মায়া বলে, তার অবসান ঘটানোই যোগীর কর্ম। তাই যোগী ঈশ্বরের নাম করেন না, গুণগান করেন না, প্রার্থনা করেন না, কেবল কর্ম করেন, যে কর্মের দ্বারা তাঁর চঞ্চলতার অবসান হয়। তিনি জানেন যে চঞ্চলতাই জীব, জগৎ ইত্যাদি যা মায়িক। তাই এর অতীতে যে স্থির তাই ব্রহ্ম এবং এই ব্রহ্মই যোগীর গন্তব্যস্থল। তাই যোগী সমস্তপ্রকার দেবদেবী, ইষ্ট ইত্যাদি পরিহার করে, এককথায় সকলপ্রকার বাহ্য রূপ ও কল্পনা পরিহার করে নিজের ভেতর নিজে সমাহিত হয়ে নিজেকে খোঁজার চেষ্টা করেন, তাই তাঁর বাহ্য অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না। এই চেষ্টার কথা বলতে গিয়ে যোগিরাজ ১৮৭৩ খ্রীঃ ২৯শে জুন বলেছেন যে এখন তিনি ভেতরে ভেতরে কিছু কিছু প্রবেশ করলেন এবং বহু ভেতরে প্রবেশ করে প্রায় স্থিরাবস্থার প্রান্তসীমায় এসে উপলব্ধি করছেন যে এখন সামনে এক কঠিন দরজা অর্থাৎ বাধা। এই দরজার যে কঠিন কপাট তা অতিক্রম করা খুবই মুশকিল। কারণ এই যে কুটস্থরূপী প্রান্তসীমা যেখানে পৌঁছে গেলে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, ইচ্ছা এরা না থাকায় আর হুঁশ থাকে না, যারা না থাকায় দেহবোধ থাকে না, কোনোদিকে খেয়াল থাকে না, যাদের অবলম্বন করে জীবভাবাপন্ন হয়ে অবস্থান করছিলাম তারা আর কেউ নেই অর্থাৎ জাগতিক খেয়ালবিহীন এক বেহুঁশ অবস্থা। এই অবস্থাকে কি নিদ্রা বা নিদ্রাবৎ অবস্থা বলা যায়? এ অবস্থা নিদ্রা বা নিদ্রাবৎ নয়। নিদ্রা অবস্থায় ইচ্ছা সুপ্ত থাকলেও মনের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে, তাই মন স্বপ্ন দেখে। কিন্তু এই অবস্থায় ইচ্ছা মন কেউ নেই, সকলেরই অভাব হওয়ায় স্বপ্ন নেই, দেহবোধ নেই, এ এক বিচিত্র অবস্থা। যোগী যখন এই অবস্থায় উপনীত হন তখন তিনি সবদার জন্য ওঁকার ধ্বনিতে তন্ময় প্রাপ্ত হন। তখন যোগীর দেহবোধ না থাকায় শ্রবণযন্ত্রও কর্মহীন থাকে। তাই তিনি তখন ওঁকার ধ্বনি কানে শোনেন না, কেবল ভেতর ভেতর এক অনির্বচনীয় অনুভব হয় মাত্র। এই অবস্থায় দেহরূপ রাজ্যের যিনি রাজা অর্থাৎ পুরুষোত্তম ব্রহ্ম, যিনি একমাত্র পুরুষ, যিনি ব্যতীত আর কেউ পুরুষ নেই, তিনিই কেবল সামনে বর্তমান। তাঁর উপস্থিতিতে সকল অসন্তোষের অবসান হওয়ায় সন্তোষামৃত পান। এই প্রকার সন্তোষামৃত পানের পূর্বে আর যে সব আনন্দ অর্থাৎ নানান দেবদেবী দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে যে সব আনন্দ তা কেবল চাখামাত্র সার, কারণ এগুলি মায়িক। যিনি এইপ্রকার সন্তোষামৃত পানের পূর্বে নানাপ্রকার দেবদেবী দর্শনে আনন্দলাভ ক'রে নিজেকে ধন্য বা পূর্ণ মনে করেন তেমন ব্যক্তি কেবল সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে গোত্তা খেতেই থাকে। তেমন ব্যক্তির চঞ্চলতার নিবৃত্তি বা গতির অবসান না হওয়ায় গতিহীন যে অগতি তা লাভ হয় না।

সে কারণে তাঁর গতিতে পুনরাবর্তন হয় এবং ভবসংসারে আসাযাওয়ারূপ কর্ম চলতেই থাকে। কারণ দেখে কে? মন দেখে। যতক্ষণ ঈশ্বর দেখা, ততক্ষণ মন অবশ্যই বর্তমান। কারণ মন না থাকলে দেখা যায় না। অতএব মন যখন বর্তমান তখন চঞ্চলভাব অবসান হয়নি অর্থাৎ নিশ্চল অবস্থা লাভ হয়নি। অপরদিকে নিশ্চল অবস্থাই যখন ব্রহ্ম এবং নিশ্চল অবস্থা লাভ না হওয়ায় ব্রহ্ম লাভও হয়নি। এই অবস্থায় গতি বর্তমান থাকায় যতই দেব-দেবী দেখ, যতই ঈশ্বর দর্শন হোক্ না কেন গতিহীন না হতে পারায় অগতি লাভ হয় না এবং যেহেতু অগতি লাভ হয় নি সেহেতু ভবসংসারে আসাযাওয়ারূপ কর্ম থাকবেই অর্থাৎ পুনরাবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

"স্বভাব ব্রহ্ম হয়—ইসসে পার জানা মুস্কিল আজ ইন্দ্রিয়োনে সতায়া সবকো মারকে আশা ত্যাগকে আপনে আপ লয় হোনা কাম হয়—লেকন মগন রহনেসে আনন্দ রহত হয়—পর বিষয় চৈতন্য নহি রহতা হয়—রাতকে আব এহি এরাদা করতা হয় কি বাতভর বৈঠকে মগন কটাওএ—তাকত কুছ বড়ানা চাহিয়ে" ॥ ২২ ॥

চঞ্চলভাব মায়াপ্রযুক্ত হওয়ায় মরীচিকাবৎ, স্বভাব নয়। স্বভাব হল নিজভাব বা আত্মভাব। এই স্বভাবও ব্রহ্ম বটে, কিন্তু তা কূটস্থরূপী প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত অবস্থিত। এই প্রান্তসীমার ঊর্ধ্বে স্বভাব ব্রহ্ম নেই, তখন কেবল মহাশূন্যরূপী ব্রহ্মই বর্তমান। তাই যোগীকে এই স্বভাব ব্রহ্মের ঊর্ধ্বে অর্থাৎ কূটস্থরূপী প্রান্তসীমার ঊর্ধ্বে যেতে হবে, যেখানে গেলে ভাব এবং অভাব উভয়েরই অভাব হয় অর্থাৎ আর কিছু থাকে না। কিন্তু এই প্রান্তসীমা অতিক্রম করা খুবই কঠিন। অথচ যোগীকে এই প্রান্তসীমা অতিক্রম করতেই হবে। কারণ তা নইলে শূন্যব্রহ্মে স্থায়ী স্থিতিলাভ করা সম্ভব নয়। কেমন করে এই প্রান্তসীমা অতিক্রম করা যায় সেকথা বলতে গিয়ে যোগিরাজ ১৮৭৩ খ্রীঃ ১৬ই জুলাই তাঁর সাধনলব্ধ উপলব্ধির মাধ্যমে লিখেছেন যে ইন্দ্রিয়গণ এখনও বাধাস্বরূপ হয়ে আছে, আজ তাদের দমন করে অর্থাৎ প্রাণকর্ম এবং ওঁকার ক্রিয়ার দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়দের কর্মহীন অবস্থায় রেখে, তাদের থামিয়ে রেখে, সমস্ত আশা-নিরাশা ত্যাগ করে নিজেকে স্থিরব্রহ্মের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে লয় করে দিতে হবে এবং এইপ্রকার লয় করে দেওয়াই এখন তাঁর একমাত্র কাজ। এই কাজটুকুই এখন তাঁর একমাত্র বাকি আছে। অর্থাৎ এরপরেই ক্রিয়া বা কর্মযোগের সমাপ্তি।

এই সমাপ্তিটুকুই এখন তাঁকে করতে হবে, তা হলেই তিনি নিশ্চল ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন। এই পর্যন্তই যোগীর চেষ্টা, কর্ম এবং পুরুষকার। এর পরেই সবকিছুর অভাব। সেই অভাব অবস্থাই বা কিছু নেই অবস্থাই স্থির ব্রহ্ম। সেই স্থিরব্রহ্মে কি উপায়ে লয় হতে হবে? তার উপায় নির্ধারণ করে তিনি ঠিক করলেন বা সিদ্ধান্ত নিলেন যে সেই নিরবচ্ছিন্ন স্থির ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকলে যে সীমাহীন আনন্দ বিরাজ করে, সে অবস্থায় আর বিষয়চৈতন্য বা বিষয়বুদ্ধি থাকে না। এই প্রকার যে দেহাতীত এবং ত্রিগুণাতীত অবস্থা তা তাঁকে এখন লাভ করতে হবে কিন্তু এই অবস্থা লাভ করতে গেলে যে কঠিন সাধন এবং সেই কঠিন সাধনের প্রস্তুতি তা তাঁর প্রয়োজন। তাই তাঁকে আরো কিছু অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করতে হবে সেজন্য তিনি সারারাত ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হয়ে সমাধিস্থ অবস্থায় কাটাতে লাগলেন।

"অর্জ্জুন মৎসভেদ বাণ মারনা চাহিয়ে—প্রাণায়ামসে ব্রহ্ম জ্ঞান হোতা হয়—তিসকে বাদ ওঁকার—ওঁকার সো রাম হয় সাধো করো বিচার—পহলে শি এয়সা আওজ ভিতরসে হোয়, পিছে ওঁ ইসিসে সোহং কহাতা হয়—পরমহংস কহে—উসকে বাদ ওঁকার ইহ অগাধ মত—য়ানে সমাধি হয়—পবনকো সুরতমে মন লগাকে বুরা ভলা সব মালুম হো জায়—ইসিকে অনুভব কহতে হয়।" ॥ ২৩ ॥

মহাভারতে আছে অর্জুন নীচে জলের দিকে তাকিয়ে ওপরে অবস্থিত মাছের চোখে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন। এবং এই প্রকারে লক্ষ্যভেদ করায় দ্রৌপদীকে লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মহাভারতের এই যে রূপক কাহিনী এগুলির মধ্যে যে গুহ্যতম যোগতত্ত্ব রহস্য নিহিত আছে যোগিরাজ সেই তত্ত্বকে সাধনার দ্বারা নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন। এই গুহ্যতম যোগতত্ত্বরহস্য যোগী ব্যতীত কেউ জানেন না, তাই তাঁরা সাধারণ ব্যাখ্যা নিয়ে টানাটানি করেন। অথচ এইসব যোগতত্ত্ব রহস্য না জানা পর্যন্ত আত্মলাভ সম্ভব নয়। ঋষিরা এসব যোগরহস্যগুলিকে আরেঠারে রূপকের মাধ্যমে বলবার চেষ্টা করেছেন।

পঞ্চপাণ্ডব হল দেহাভ্যন্তরস্থ পাঁচ তত্ত্বের প্রতীক। যুধিষ্ঠির ধর্মপুত্র অর্থাৎ ব্যোমতত্ত্ব। তাই একমাত্র যুধিষ্ঠিরই স্বর্গে গমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন অর্থাৎ বিশুদ্ধতত্ত্ব যা কণ্ঠে অবস্থিত। এই বিশুদ্ধতত্ত্বই কূটস্থে অর্থাৎ পরব্রহ্মে অর্থাৎ শূন্যতত্ত্ব

মহাশূন্যতত্ত্বে মিলে যেতে সক্ষম। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম পবনপুত্র যা অনাহতে অবস্থিত। এই অনাহত বা পবনতত্ত্বই শব্দ অর্থাৎ নাদ ব্রহ্ম। যোগী সাধনার দ্বারা এই অনাহত বা নাদতত্ত্বকে বিশুদ্ধতত্ত্বে অর্থাৎ কণ্ঠে মিলিয়ে দেন। তাই ভীমের অর্থাৎ পবনতত্ত্বের স্বর্গে পৌঁছবার পূর্বেই দেহাবসান ঘটে অর্থাৎ বিশুদ্ধতত্ত্বে মিলে যায়। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন হলেন অগ্নিপুত্র অর্থাৎ তেজস্তত্ত্ব যা মণিপুর অর্থাৎ নাভিতে বর্তমান। এই নাভি হতেই তেজ সর্বশরীরে প্রবাহিত হয়। এই অর্জুন অর্থাৎ তেজস্তত্ত্ব মিশে যায় তার ওপরের তত্ত্বে অর্থাৎ অনাহতে। তাই অর্জুনও স্বর্গে অর্থাৎ কূটস্থে পৌঁছতে সক্ষম নন। চতুর্থ পাণ্ডব নকুল অর্থাৎ জলতত্ত্ব যা স্বাধিষ্ঠানে অবস্থিত। এই অপতত্ত্ব মিলে যায় তার ওপরের তত্ত্ব মণিপুরে অর্থাৎ তেজে। তাই নকুলও স্বর্গে অর্থাৎ কূটস্থে পৌঁছতে সক্ষম নয়। পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব হলেন ক্ষিতি অর্থাৎ মৃত্তিকাতত্ত্ব যা মূলাধারে অবস্থিত। এই মৃত্তিকাতত্ত্ব মিলে যায় তার ওপরের তত্ত্ব স্বাধিষ্ঠানে। তাই সহদেবও স্বর্গে অর্থাৎ কূটস্থে পৌঁছতে সক্ষম নয়। এই পঞ্চতত্ত্ব—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম, এরাই হল পঞ্চপাণ্ডব যা মানবদেহে যথাক্রমে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত ও বিশুদ্ধচক্রে অবস্থিত। প্রাণের চঞ্চলদিকের এই পাঁচ তত্ত্বের সমষ্টিকেই প্রকৃতি বলা হয়। এই প্রকৃতিই দ্রৌপদী পদবাচ্য। তাই পঞ্চপাণ্ডব মিলিতভাবে দ্রৌপদীরূপা 'প্রকৃতিকে পত্নীরূপে লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ যোগীর যোগসাধনার মাধ্যমে মূলাধারে অবস্থিত ক্ষিতিতত্ত্ব সূক্ষ্মাকারে মিলে গেল স্বাধিষ্ঠান তত্ত্বে। স্বাধিষ্ঠানে অবস্থিত অপতত্ত্ব মিলে গেল মণিপুর তত্ত্বে। মণিপুরে অবস্থিত তেজস্তত্ত্ব মিলে গেল অনাহতে। অনাহতে অবস্থিত মরুততত্ত্ব মিলে গেল বিশুদ্ধতত্ত্বে। বিশুদ্ধে অবস্থিত ব্যোমতত্ত্ব মিলে গেল কূটস্থে অর্থাৎ স্বর্গে।

এই পঞ্চতত্ত্বকে কি প্রকারে নির্গুণ, নির্লিপ্ত, ত্রিগুণাতীত মহাশূন্যরূপী কূটস্থতত্ত্বে মিলিয়ে দেওয়া যায়, তার উপায় বলতে গিয়ে যোগিরাজ বলছেন অর্জুনের মত মৎস্যভেদ বাণ মারিতে হবে। বাণ শব্দে শ্বাস ; সেই শ্বাসকে এমনভাবে চালনা করতে হবে অর্থাৎ প্রাণায়াম করতে হবে যার দ্বারা পঞ্চতত্ত্বরূপী পঞ্চচক্রভেদ করে, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নারূপী তিন গুণকে অতিক্রম করে বায়ু স্থির অবস্থায় আজ্ঞাচক্রে স্থায়ী স্থিতিলাভ করতে হবে। এই প্রকারে অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করতে থাকলে যখন আপনা হতেই বায়ুস্থিরের অবস্থা হবে তখন অবশ্যই ব্রহ্মজ্ঞান হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই প্রকার উত্তম প্রাণকর্ম করতে থাকলে যখন অনাহততত্ত্বে বায়ু স্থিরের অবস্থা হয় তখন আপনাহতেই ওঁকার ধ্বনির প্রকাশ হয়। এই ওঁকার ধ্বনিই আত্মারাম, হে সাধুগণ অর্থাৎ ক্রিয়াবানগণ তোমরা বিচার করে দেখো

অর্থাৎ হে প্রিয় ক্রিয়াবানগণ তোমরা উত্তম ক্রিয়া করে আত্মারামের ওঁকার ধ্বনিকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করো। চেষ্টা করলে নিশ্চয় পাবে। কিন্তু এই প্রকার উত্তম প্রাণায়াম অধিক পরিমাণে করতে থাকলে প্রথমে শিঁ শিঁ শব্দ ভেতর থেকে নির্গত হয়, যাকে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি বলে। এই প্রকার শিঁ শিঁ ধ্বনির অন্তে যে গম্ভীর ওঁকারের উদয় হয় সেই অবস্থাকেই সোহহং বলে অর্থাৎ সেই গম্ভীর ওঁকার অবস্থাই 'আমি' পদবাচ্য। আবার এই প্রকার আমি পদবাচ্য অবস্থাকেই অর্থাৎ এই গম্ভীর ওঁকার অবস্থাকে পরমহংস অবস্থা বলে। হাঁস যেমন জলের ভেতর থেকে দুধকে বেছে নিতে সক্ষম, তেমনি এই অবস্থাপন্ন যোগী প্রাণের চঞ্চলতারূপী প্রকৃতিতত্ত্ব অর্থাৎ মহামায়াকে কাটিয়ে স্থির গম্ভীররূপী ওঁকারে স্থিতিলাভ করতে পারেন। কিন্তু এই প্রকার স্থিতিলাভও অস্থায়ী অর্থাৎ এই যে পরমহংসরূপী অবস্থা, এই অবস্থাতেও যোগী স্থিরব্রহ্মে স্থায়ী স্থিতিলাভ করতে না পারায় নির্বিকল্প সমাধি অবস্থা অর্থাৎ সঠিক ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভ কবতে সক্ষম হন না। তাই যোগীকে আরও অগ্রসর হতে হবে এবং স্থির ব্রহ্মে স্থায়ী আসনলাভ করতে হবে যাকে নির্বিকল্প সমাধি বা ক্রিয়ার পরাবস্থা বলে। এই অবস্থালাভই যোগীব পরম কাম্য, এই অবস্থা পরমহংস অবস্থার অনেক উর্ধ্বে অবস্থিত, যেখান থেকে যোগীকে আর কখনও চঞ্চলতার দিকে আকর্ষণ কবতে পারে না। তখন যোগী সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি তত্ত্বের উর্ধ্বে, পঞ্চতত্ত্বের উর্ধ্বে, তিনগুণেব অতীতে চিবস্থিব আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে জগতের হিতার্থে সকল কর্ম কবতে পাবেন। এই উত্তম অন্তর্মুখী প্রাণায়াম যতই করা যাবে এবং ক্রমে ক্রমে যতই বায়ুস্থিরেব অবস্থার দিকে অগ্রসর হবে ততই কোন্‌টা ভাল এবং কোন্‌টা মন্দ এ জ্ঞান আপনা থেকেই প্রকাশিত হবে। তখন যোগী আপনা হতেই জানতে পারবেন যে প্রাণের এই চঞ্চল দিকের টানই প্রকৃতি বা মহামায়া যা জগতের দিকে, স্থূল বস্তুর দিকে আকর্ষিত কবে। এই চঞ্চলতার অতীতে যে মহাস্থিররূপী অবস্থা তাই ব্রহ্ম এবং সকলের উৎপত্তিস্থল ও গন্তব্যস্থল। এই যে উভয় দিকের জ্ঞান একেই অনুভব বলে, যা যোগীর যোগকর্ম করতে থাকলে আপনা হতেই হয়।

অর্জুন যখন মৎস্যভেদ বাণ মেরেছিলেন তখন তাঁর দৃষ্টি ছিল নীচের দিকে কিন্তু লক্ষ্য ছিল ওপর দিকে। এর অর্থ হল জীবের মন সর্বদাই নিম্নগামী কিন্তু সেই জীব যেতে চায় তার উৎসস্থল কূটস্থে। তাই যোগিরাজ বলেছেন এমন নিখুঁত উত্তম প্রাণায়াম কর যাতে তোমার পার্থিব জগতের সমস্ত কামনা বাসনারূপ দৃষ্টি ঘুরে গিয়ে পঞ্চতত্ত্ব এবং তিনগুণকে অতিক্রম করে কূটস্থরূপী স্বর্গে স্থায়ী স্থিতিলাভ করতে পার। ওপরদিকে তীর চালনার উদ্দেশ্য হল মূলাধার থেকে ক্রমান্বয়ে ছয়চক্রকে ভেদ করে

কূটস্থে পৌঁছে যাওয়া। সমস্ত দেব-দেবী তত্ত্ব, উপাখ্যান এবং সকল ধর্ম কাহিনীর মধ্যে এইভাবে যোগের অন্তর্নিহিত রহস্য ও গুহ্যতত্ত্ব অবস্থিত অর্থাৎ এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে ঋষিগণ এবং যোগিগণ যোগতত্ত্বের কথাই বলেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কাল প্রভাবে অনুভবহীন অযোগীদের হাতে পড়ে যোগ সাধনার এইসব গূঢ় তত্ত্বগুলি আজ প্রায় নেই বললেই চলে। তাই আজ সমগ্র মানব সমাজে ধর্ম নিয়ে এত হানাহানি এবং এইসব রূপকের মধ্যে যা গুহ্যতম যোগতত্ত্ব তাকে বাদ দিয়ে কেবল রূপক নিয়েই টানাটানি। অতএব মানুষের আত্মিক উন্নতি হবে কি করে?

"দশ লাখ একষট হাজার প্রাণায়াম মে
কেবল কুম্ভক সিদ্ধ হোতা হয়" ॥ ২৪ ॥

প্রত্যেক মানুষই ঈশ্বরের ভক্ত। কেউ জেনে ভক্ত, কেউ না জেনে ভক্ত। কেউ ঈশ্বরকে মেনে ভক্ত, কেউ না মেনে ভক্ত। কিন্তু সকলেই ভক্ত; কারণ এই প্রাণরূপী ঈশ্বর ব্যতীত ক্ষণকাল কারও জীবিত থাকা সম্ভব নয়। এই প্রাণই সর্বশক্তিমান, প্রাণ ব্যতীত আর কিছু নেই, এ দুনিয়ায় যা কিছু দেখা যায় সবই প্রাণের খেলা। প্রাণের এই চঞ্চল দিকটাই আদ্যাশক্তি মহামায়া এবং জীবের বর্তমান অস্তিত্ব। তাই সকলেই নারী, কেউ পুরুষ নয়। পুরুষ এক অদ্বিতীয়, তা হোলো প্রাণের স্থির দিকটা। প্রাণের এই মহাস্থির অবস্থায় দুই নেই, দুই বলারও কেউ নেই। প্রাণের এই স্থির দিকটাকে জানা কঠোর তপস্যা সাপেক্ষ এবং এই স্থিরাবস্থাকে যে জানতে গেছে সে নিজেই স্থিরে লয় হয়ে গেছে, তাই তার আর জানা হয় না। অতএব জানা জানি ততক্ষণই যতক্ষণ চঞ্চলতা। তাই জীবের কর্তব্য হল তার বর্তমান অস্তিত্বরূপী প্রাণের এই চঞ্চল দিকটাকে জানা। যদি জানা যায় তবেই মানুষ্য জীবন সফল হয় এবং আপনা হতেই পুরুষরূপী প্রাণের স্থিরাবস্থাকে জানা যায়। শিব, কৃষ্ণ, কালী ইত্যাদিকে যদি ডাকতে হয় বা উপাসনা করতে হয়, এমনকি ভগবান্ বা ঈশ্বর বলেও যদি ডাকতে হয় বা উপাসনা করতে হয় তা হলেও প্রাণকে দরকার। দেহে প্রাণ না থাকলে শিব কৃষ্ণ কালী বা ভগবান্ বলেও ডাকা যায় না। ঈশ্বরে প্রেম ভক্তি ইত্যাদি প্রদর্শন বা আরোপ করতে হলে দেহে প্রাণ থাকা দরকার। প্রাণহীন দেহে প্রেম ভালবাসা ভক্তি সম্ভব নয়। অতএব যে সাধনার দ্বারা চঞ্চল প্রাণকে স্থির করা যায়

এবং স্থির প্রাণকে জানা যায় তাই সাধন, সেই সাধনই সকলের করা উচিত। কারণ স্থির প্রাণই ঈশ্বর এবং সবকিছুর মূল।

মানুষ নানাপ্রকারে বা উপায়ে ঈশ্বরের উপাসনা করে থাকে। কেউ হরি বলে, কেউ শিব বলে, কেউ কালী বলে, কেউ গড্ বা আল্লা বলে। কিন্তু মূল সেই প্রাণ। এই প্রাণের কাছে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন, ফার্সী, শিখ ছোট বড় উঁচু জাত নীচু জাত ভেদাভেদ নেই; কারণ সর্বত্রই এক প্রাণরূপী ঈশ্বর বর্তমান। অতএব যে যেভাবেই সাধনা করুক না কেন সকলেই প্রাণের সাধনায় রত। এই প্রাণ সকল দেহে আছে বটে কিন্তু কেউ তার দিকে নজর রাখে না, প্রাণের প্রতি কারও খেয়াল নেই। প্রাণের প্রতি খেয়াল না থাকায় কারও প্রাণে থাকা হোলো না, যদিও প্রাণ আছে বটে। এই প্রাণই আত্মা, পরমাত্মা এবং ব্রহ্ম। পৃথিবীতে যত প্রকারের ঈশ্বর সাধনার পথ বা মত এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে ঋষিগণ কোনটাকেই মহাধর্ম বলেন নি। নাম, জপ, সংকীর্তন, তীর্থভ্রমণ, ব্রত, উপবাস, দরিদ্র-সেবা, জীবে-দয়া, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি যত প্রকার ঈশ্বর সাধনার পথ বা মত প্রচলিত আছে এগুলির কোনটাই মহাধর্ম নয়। ঋষিগণ উদাত্ত কণ্ঠে, দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রাণায়ামকে মহাধর্ম বলেছেন—

"প্রাণায়ামো মহাধর্ম্মো বেদানামপ্যগোচরঃ।
সর্ব্বপুণ্যস্য সারোহি পাপরাশিতুলানলঃ॥
মহাপাতক কোটীনাং-তৎ কোটীনাঞ্চ দুষ্কৃতাম্।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং পাপং নানাদুষ্কর্ম্মপাতকম্॥
নশ্যত্যেব মহাদেব ধন্যঃ সোঽভ্যাসযোগতঃ॥"

রুদ্রযামল ১৫শ পটল।

প্রাণায়ামই মহাধর্ম যা বেদেরও অগোচর, যার কথা বেদও বলতে পারেন নি। এই প্রাণায়াম সকল পুণ্যের সার এবং সকল পাপ বিনাশক। এই অন্তর্মুখী প্রাণায়াম ক্রিয়া দ্বারা কোটী কোটী দুষ্কর্মের ফল এবং পূর্বজন্মের সকল পাপ অচিরে ধ্বংস হয়। যত বড় মহা পাতকই হোক না কেন এই প্রাণায়াম ক্রিয়া সাধনে তার নাশ অবশ্যম্ভাবী। যিনি এই অন্তর্মুখী প্রাণায়ামের অভ্যাস করেন তিনি ধন্য হন। এই প্রাণায়ামের উপকারীতা সম্বন্ধে যোগশাস্ত্র আরও বলেছেন—"আনন্দো জায়তে চিত্তে প্রাণায়ামী সুখী ভবেৎ"। যিনি প্রাণায়াম করেন তিনি আনন্দে বা সুখে এই ভবসংসারে বাস করেন। যোগিরাজও বলেছেন—"প্রাণায়ামসে ব্রহ্মজ্ঞান হোতা হয়।" অতএব শাস্ত্রে ঋষিদের উক্তি এবং যোগিরাজের উক্তির দ্বারা এটাই বোঝা গেল যে পৃথিবীতে যত প্রকার সাধন পথ বা মত আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে অন্তর্মুখী প্রাণায়াম সাধনই শ্রেষ্ঠ সাধন, এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু এই প্রাণায়াম করবার বহুপ্রকার বিধি প্রচলিত

আছে। যেমন সবচেয়ে বেশী প্রচলিত আছে এক নাক দিয়ে শ্বাস টেনে কিছুক্ষণ কুম্ভক অবস্থায় রেখে অপর নাক দিয়ে শ্বাস ত্যাগ করা। এই প্রকারে প্রাণায়াম করা শাস্ত্র নির্দিষ্ট বা যোগিরাজের উদ্দেশ্য নয়। এ বিষয়ে শাস্ত্র বলেছেন—

"বালবুদ্ধিভিরঙ্গুল্যাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নাসিকাচ্ছিদ্রমবরুধ্য
যঃ প্রাণায়ামঃ ক্রিয়তে স খলু শিষ্টৈস্ত্যাজ্যঃ।"
—ঋগ্‌বেদ (শঙ্কর ভাষ্য)।

অর্থাৎ স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরাই আঙ্গুল দ্বারা নাসিকাছিদ্র রোধ করে যে প্রাণায়াম করে থাকে তা শিষ্টজনের পরিত্যাজ্য। তা হলে এই প্রাণায়াম কোন প্রাণায়াম?' এই প্রাণায়ামের পদ্ধতি সম্বন্ধে গীতা বলেছেন—

"অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপাণগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারা প্রাণান্ প্রাণেষুজুহ্বতি"॥ —গীতা ৪/২৯.

কেউ কেউ প্রাণবায়ুকে অপাণবায়ুতে এবং অপাণবায়ুকে প্রাণবায়ুতে হোম করেন। এরূপ করতে করতে 'কেবল' নামক কুম্ভক অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় প্রাণের গতি রুদ্ধ হয় অর্থাৎ প্রাণাযামপরায়ণ হয়ে থাকেন। অপর কেউ কেউ ওই প্রকারে প্রাণায়াম-পবায়ণ হয়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযম কবে প্রাণকে প্রাণেতেই হোম করেন অর্থাৎ ওঁকারক্রিয়া করেন। প্রথমটা হোলো চঞ্চল প্রাণের কর্ম অর্থাৎ অভ্যন্তর গতিসম্পন্ন চঞ্চল বায়ুর কর্ম এবং দ্বিতীয়টা হোলো স্থির বায়ুর কর্ম যাকে ওঁকার ক্রিয়া বলে। অতএব রাজযোগেব অন্তর্গত বা যোগিরাজ প্রদর্শিত এই প্রাণায়ামে নাক বা মুখ দিয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগরূপ কর্ম নেই। এই প্রাণায়ামে বাইরের বায়ু হতে ঈড়া ও পিঙ্গলার মাধ্যমে বা দুই নাসিকার মাধ্যমে শ্বাসের গ্রহণ ও ত্যাগরূপ কর্ম নেই, এ সম্পূর্ণ অভ্যন্তর্মুখী ; ভেতরের প্রাণ ও অপাণ বায়ুর দ্বারায় এই প্রাণায়াম। ইড়া ও পিঙ্গলাই জীবকে জগতের দিকে আকৃষ্ট করে রাখে ; তাই ইড়া ও পিঙ্গলাকে প্রথমেই পরিত্যাগ করে সুষুম্নান্তর্গত গতিসম্পন্ন এই প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম অত্যন্ত আরামদায়ক ও সম্পূর্ণ গুরুমুখী বিদ্যা। এই প্রাণায়ামে কোনো প্রকার হানি বা অনিষ্টের সম্ভাবনা নেই।

গীতা এবং যোগিরাজ প্রদর্শিত এই প্রাণায়াম সাধন যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত সে বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি হিসাব দিয়ে বলেছেন যে সাধারণ মানুষ চব্বিশ ঘণ্টায় ২১,৬০০ বার শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। এই শ্বাস-প্রশ্বাসই জীবের আয়ু। শ্বাসের এই প্রকার গ্রহণ ও ত্যাগের মাধ্যমে জীবের আয়ুক্ষয় হয় এবং যখনই শ্বাসের পুঁজি শেষ হয় তখন জীবের মৃত্যু হয়। কিন্তু এই অন্তর্মুখী একটি প্রাণায়ামে সময়

লাগে ৪৪ সেকেণ্ড। এই হিসাবে যোগী ২৪ ঘণ্টায় প্রাণায়াম করেন প্রায় ২,০০০টি। অর্থাৎ যোগী ২৪ ঘণ্টায় শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করেন যেখানে মাত্র ২,০০০ *সেখানে সাধারণ মানুষ গ্রহণ ও ত্যাগ করেন ২১,৬০০ বার। সাধারণ মানুষের* শ্বাসের পুঁজি এই প্রকারে অধিক খরচ হওয়ায় শ্বাসের গতি-স্রোত উত্তরোত্তর বেড়েই চলে এবং অচিরে কালগ্রাসে পতিত হয়। কিন্তু যোগী প্রাণায়াম করতে করতে যখন নিশ্চল অবস্থা প্রাপ্ত হন তখন তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের কোনোপ্রকার গতি থাকে না। এ বিষয়ে যোগিরাজ আরো বলেছেন—"২১৬০০ শ্বাসকো রোকে। ১০০ দিন রোকে তো যো ইচ্ছা করে সিদ্ধ হোয়—তব যত্তা রোজ চাহে জিএ।"—অর্থাৎ প্রতিদিন জীবের এই যে ২১,৬০০ বার শ্বাসের গতি চলছে তাকে প্রাণায়ামের দ্বারা থামাও। যতই প্রতিদিন উত্তম ও অধিক প্রাণায়াম করবে ততই শ্বাসের গতি নিরুদ্ধ হবে। কোনোদিন অল্পক্ষণের জন্য নিরুদ্ধ এবং কোনোদিন বেশীক্ষণের জন্য নিরুদ্ধ হবে। এই প্রকার নিরুদ্ধ অবস্থা অবশ্যই প্রয়োজন, একেই ক্রিয়ার পরাবস্থা বলে। প্রতিদিনের এই যে কিছু কিছু সময় *নিরুদ্ধ অবস্থা লাভ হয়, এই রকমভাবে যদি ১০০ দিন নিরুদ্ধাবস্থা যে যোগী লাভ* করতে পারেন তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই তাঁর সিদ্ধ হবে এবং তিনি যতদিন খুশী জীবিত থাকতে পারেন অর্থাৎ তেমন অবস্থাপন্ন যোগী ইচ্ছামৃত্যু অবস্থা লাভ করেন। ১০০ দিন নিরুদ্ধাবস্থা বলতে ১০০ দিনের মধ্যে কোনো সময়েই শ্বাসের গতি চলবে না তা নয়। এখানে যোগিরাজ বলতে চেয়েছেন যে প্রতিদিন প্রাণকর্ম করতে করতে কিছু কিছু সময় যে শ্বাসের গতি রুদ্ধ হয় সেই অবস্থার কথাই বলতে চেয়েছেন। অষ্টাঙ্গযোগের অন্তর্গত এই বারোটি উত্তম প্রাণায়ামে প্রত্যাহার অবস্থা হয়। প্রত্যাহার অর্থে ইন্দ্রিয়বিষয় বা জগতের দিকে মন না যাওয়া। ১৪৪টি উত্তম প্রাণায়ামে ধারণা অবস্থা হয়। ধারণা অর্থে আত্মবিষয়ক ধারণা অর্থাৎ আত্মা যে আছেন, আত্মজ্যোতি দর্শনে সেই বিষয়ক ধারণা। ইন্দ্রিয় বিষয় হতে এবং স্থূল জাগতিক দিক্ হতে মন সম্যকরূপে প্রত্যাহৃত হলেই আত্মবিষয়ক ধারণা জন্মে। এর পর একই আসনে বসে ক্রমান্বয়ে ১৭২৮টি উত্তম প্রাণায়াম করলে ধ্যানাবস্থা লাভ হয় অর্থাৎ আত্মবিষয়ে স্থির লক্ষ্য হয়। এই প্রকারে ২০,৭০৩৬টি উত্তম প্রাণায়াম নিরবচ্ছিন্নভাবে করতে পারলে সমাধি অবস্থা লাভ হয়। সমাধি অর্থাৎ সম্যকরূপে ধীয়মান্ অবস্থা। তখন কেবল আত্মাই আছেন, আমি নেই। তাই যোগিরাজ বলছেন প্রতিদিন নিয়মিতভাবে এই প্রকারে উত্তম প্রাণায়াম করতে করতে যখন ১০,৬১০০০ প্রাণায়াম সম্পূর্ণ হবে তখন কেবল কুম্ভক অবস্থা আপনা হতেই সিদ্ধ হবে। ওই 'কেবলকুম্ভক' অবস্থাই তখন তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা হবে। বর্তমানে জীবের যে বহির্গতি শ্বাস, এটাই এখন যেমন

তার কাছে স্বাভাবিক, তেমনি ওই অবস্থাপন্ন যোগীর ওইপ্রকার 'কেবলকুম্ভক' অবস্থায় থাকাই তখন স্বাভাবিক হয়। তেমন যোগীর বাইরের দিকে শ্বাসের গতি প্রায় থাকে না বললেই চলে বা শ্বাস ফেলবেন কি ফেলবেন না এটা তাঁর ইচ্ছাধীন হওয়ায় কালাতীত অবস্থা লাভ করেন। কালাকাল জীবের পক্ষে, কিন্তু এইরকম অবস্থাপন্ন যোগীর কাছে কালাকাল থাকে না। কারণ তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে গতিকে অতিক্রম করে অগতি অবস্থা লাভ করেন। তাই যোগিরাজ আরও বলেছেন—"পুরক রেচক ছুটে তব কেবল কুম্ভক বাহলাওএ"—অর্থাৎ প্রাণকর্ম করতে করতে যখন শ্বাসপ্রশ্বাসের টানা ফেলারূপ কর্ম রহিত হয়ে নিরুদ্ধ অবস্থা লাভ করবে, নিশ্চল হয়ে যাবে, তখনই কেবল-কুম্ভকরূপ আনন্দ অবস্থা হবে। এই অবস্থা ত্রিগুণাতীত হওয়ায় কোনো প্রকার বৃত্তি থাকে না, বৃত্তি না থাকায় অভাব। কিন্তু এই অবস্থার পূর্বে বৃত্তি থাকায় ভাব, তখন দুই। আবার প্রকৃষ্ট প্রকারে যখন লয় তখন অভাব। যখন অভাব তখন নিশ্চয়ই নিরবয়ব; যখন নিরবয়ব তখন কিছুই নেই। তখন ব্রহ্মে লীন হওয়ায় নিবৃত্তি, কারণ তুমিই তখন লয় হয়ে গিয়েছ। যখন নিরবয়ব, অভাব বা লয় হল তখন সমস্ত পদার্থের পরমাণু বিশেষরূপে বিভাগ হতে হতে ব্রহ্মে মিশে গেল—পৃথিবীর অণু জলে, জলের অণু তেজে, তেজের অণু বায়ুতে, বায়ুর অণু শূন্যে, শূন্যের অণু ব্রহ্মে, এভাবে যা বিস্তার হয়েছিল তা সঙ্কুচিত হতে হতে যেখানে ব্রহ্মাণুও নেই সেখানে আটকে গেল অর্থাৎ শূন্যব্রহ্মে স্থিতি হল, যার পর আর কিছু নেই।

"ক্রিয়া সত্য আর সব মিথ্যা। ক্রিয়ার অভ্যাসই বেদপাঠ।
ক্রিয়াই যজ্ঞ। এই যজ্ঞ সকলের করা উচিত"॥ ২৫॥

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলেছেন ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। যোগিরাজ বলেছেন ক্রিয়া সত্য আর সব মিথ্যা। সকল মহাত্মা, সকল ধর্ম এবং সকল শাস্ত্র এই জায়গায় একমত যে ব্রহ্ম চূড়ান্ত এবং পরিণাম সত্য। এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই। যোগিরাজেরও সেই একই অভিমত। সেই চূড়ান্ত সত্য ব্রহ্ম অবিনাশী এবং একরূপ। সেই ব্রহ্ম হোলো একটা অবস্থা। সেই অবস্থা থেকে সব কিছুর উৎপত্তি, আবার ঘুরে ফিরে তাতেই লয়। সেই চূড়ান্ত সত্য যে ব্রহ্ম তা চিরকাল আছে ও থাকবে; অবিকৃতভাবে। সেই সত্যকে পেতে গেলে নিশ্চয়ই কোনো কর্মের মাধ্যমে পেতে হবে। তাই যোগিরাজ বলছেন সেই কর্মই জীবের কাছে প্রথম সত্য। কর্মই

জীব, কর্মই জীবন, কর্মই ধর্ম, কর্মই বর্তমান অস্তিত্ব। প্রাণের স্থির দিকটাই ব্রহ্ম এবং চঞ্চল দিকটাই জীব-জগৎ। প্রাণের এই চঞ্চল অবস্থা হতেই সব কিছুর উৎপত্তি ও অবস্থান। প্রাণের স্থির দিকটা শূন্য এবং চঞ্চল দিকটায় সবকিছু। অতএব কর্মও প্রাণের চঞ্চল দিক্ হতে জাত। তাই প্রথম সত্য যে কর্ম তাকে বাদ দিয়ে অর্থাৎ প্রাণের চঞ্চল দিকটাকে বাদ দিয়ে চূড়ান্ত সত্য ব্রহ্মকে ভাবা বা জানা যায় না। এ কারণে প্রাণের স্থির দিকটাকে পেতে হলে শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ প্রাণের চঞ্চল দিকটাকে ধরেই পেতে হবে।. ক্রিয়া অর্থে কর্ম। তাই যোগিরাজ বলেছেন প্রাণের এই চঞ্চল দিকটাই যখন কর্ম এবং জীবের বর্তমান অস্তিত্ব তখন এই দিকটাই প্রথম সত্য এবং প্রথম সত্যকে ধরেই দ্বিতীয় অর্থাৎ চূড়ান্ত সত্যে উপনীত হতে হবে। যোগিরাজের মতে প্রাণের ওই স্থিরাবস্থাকে লাভ করতে হলে শ্বাস প্রশ্বাসরূপ প্রাণের যে গতি তাকে ধরে অর্থাৎ প্রাণকর্ম করে লাভ করতে হবে। এই কর্ম ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে স্থিরত্বলাভ সম্ভব নয়। একথা বলতে গিয়ে তিনি আরো বলেছেন যে ভাবেই ঈশ্বর সাধন করো না কেন, কোনো এক জন্মে এই প্রাণকর্মরূপ আত্মসাধন অবশ্যই করতে হবে; তা না হলে সম্পূর্ণরূপে স্থিরত্বলাভ সম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্যেই যোগিরাজ বলেছেন ক্রিয়া সত্য আর সব মিথ্যা এবং এই ক্রিয়া করার অভ্যাসই বেদপাঠ। বেদ অর্থে জ্ঞান। জ্ঞান সকলের ভেতরেই আছে কিন্তু তাকে জাগ্রত করা প্রয়োজন। জ্ঞান সকলের ভেতরেই সুপ্তাবস্থায় থাকে। প্রাণকর্মরূপ ঘর্ষণ ক্রিয়া যতই করা যায় ততই স্থিরত্বের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় এবং সেই স্থিরত্বই জ্ঞান। মানুষ সবকিছু বুদ্ধি বিবেক ও বিচারের দ্বারা জানতে চায়। এগুলি সবই প্রাণের চঞ্চল অবস্থা হতে জাত। কিন্তু সত্যকারের যে জ্ঞান তা প্রাণের স্থির দিকেই অবস্থিত। অতএব স্থির না হতে পারলে পূর্ণজ্ঞান সম্ভব নয়। ব্রহ্মজ্ঞানই পূর্ণজ্ঞান। সকল জ্ঞানের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ, সকল বিদ্যার মধ্যে আত্মবিদ্যা শ্রেষ্ঠ এবং সকল সাধনের মধ্যে ক্রিয়াসাধন শ্রেষ্ঠ। তাই যোগিরাজ বলছেন গ্রন্থরূপ বেদপাঠে ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব নয়, পরন্তু ক্রিয়াসাধন নিয়মিতভাবে অভ্যাস করতে থাকলে আপনা হতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে, তাই নিয়মিতভাবে ক্রিয়া করার অভ্যাসই বেদপাঠ এবং এই ক্রিয়া করাটাই যজ্ঞ। সাধারণতঃ সকলে অগ্নিতে ঘৃতাহুতিকেই যজ্ঞ বলে থাকেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় এই প্রকারে অগ্নিতে যতই ঘৃতাহুতি করা হোক না কেন, এই কর্মের মাধ্যমে কখনই আত্মজ্ঞান সম্ভব হয় না। এখানে যোগিরাজ বলছেন ক্রিয়াই যজ্ঞ। তাহলে এটা কোন্ যজ্ঞ? চঞ্চল প্রাণকে স্থির প্রাণে মিলিয়ে দেওয়ারূপ যজ্ঞ। অর্থাৎ প্রাণের যে চঞ্চল দিক্, যা জীবের বর্তমান অস্তিত্ব, তার সেই বর্তমান অস্তিত্বকে অর্থাৎ প্রাণের এই চঞ্চল দিকটাকে প্রাণকর্ম করতে করতে স্থিরত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। এটাই

প্রকৃত যজ্ঞ এবং এই যজ্ঞ সকলের করা উচিত অর্থাৎ সকল যোগী এই কর্মই করে থাকেন। তাই যোগিরাজ বলছেন এই কর্মটাই হোলো ক্রিয়া, এই ক্রিয়াই একমাত্র সত্য এবং এই কর্ম ব্যতীত আর সকল কর্মই মিথ্যা।

যোগিরাজের মতে এই ক্রিয়া করাটা বেদ পাঠ অর্থাৎ প্রতিদিন ক্রিয়ার অনুশীলনই বেদপাঠরূপে গণ্য এবং এই প্রকারে প্রতিদিন ক্রিয়ার অভ্যাস করতে করতে যখন ক্রিয়ার অতীত অবস্থায় অর্থাৎ কর্মের অতীত অবস্থায় লক্ষ্য হবে অর্থাৎ যখন আর কোনো প্রকার কর্ম থাকবে না, প্রাণের চঞ্চল অবস্থার সম্পূর্ণরূপে অবসান, সেই অবস্থাই বেদান্ত দর্শন। এই প্রকার বেদান্তদর্শন গ্রন্থপাঠে সম্ভব নয়, তা ক্রিয়া করে লাভ করতে হবে। কিন্তু এই অবস্থাতেও দর্শন অর্থাৎ দেখাদেখি থাকে কারণ যোগী তখনও লয়ে উপনীত হননি অতএব যোগীকে বেদান্তদর্শনের অতীতে অর্থাৎ সকল প্রকার জ্ঞান ও অজ্ঞানের অতীতে, সকল প্রকার দর্শন ও অদর্শনের অতীতে অনন্ত শূন্যরূপী স্থিরব্রহ্মে স্থায়ী স্থিতিলাভ করতে হবে। এই প্রকার স্থিরব্রহ্মে যিনি উপনীত হতে পারেন তিনি স্বয়ংই জ্ঞানের মূর্তপ্রতীক হন এবং এই প্রকার যোগী যা বলেন তাই বেদ অর্থাৎ অপরের কাছে চূড়ান্ত জ্ঞান বলে গণ্য হয়। যোগিরাজও এইপ্রকার স্থির ব্রহ্মে উপনীত হয়ে জগৎবাসীকে জানালেন যে তিনি যা বলছেন মানুষের মঙ্গলের জন্য তাকেই বেদ বা চূড়ান্ত জ্ঞান বলে জেনো। এই অবস্থালাভ অর্থাৎ এই প্রকার স্থিরত্বলাভ যাঁরই হবে তিনিই বেদজ্ঞ বলে গণ্য হবেন। বেদ কোনো গ্রন্থ বিশেষ নয়, বেদ হোলো স্থিরত্বের জ্ঞান। এই প্রকার স্থিরত্বের জ্ঞান যাঁর হয়নি তিনি কখনই বেদ অর্থাৎ স্থির জ্ঞানকে জানতে সক্ষম হন না, তাই তাঁকে বেদজ্ঞ বলা যায় না। তাই বেদজ্ঞান সম্পন্ন সাধক কমই দেখা যায়। পরন্তু দ্বৈতজ্ঞান সম্পন্ন সাধকই অধিক দেখা যায়। বেদজ্ঞান হোলো চূড়ান্ত জ্ঞান, এই চূড়ান্ত জ্ঞানে উপনীত না হতে পারলে চূড়ান্ত জ্ঞানের কথা বলা যায় না, চূড়ান্ত জ্ঞানসম্পন্ন সাধক বা যোগী বড়ই বিরল। বেদজ্ঞান হোলো একের জ্ঞান, যখন আর দুই এর অস্তিত্ব থাকে না। যোগীর কাছে যতক্ষণ দুই থাকে ততক্ষণ একেকে জানতে পারে না। আবার একেকে না জানলে চূড়ান্ত বা পরিণাম সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। যতক্ষণ দুই ততক্ষণ কিছু না কিছু প্রাণের চঞ্চল অবস্থা বর্তমান থাকে। প্রাণের এই চঞ্চল অবস্থা সামান্যতম বর্তমান থাকলেও সুখ দুঃখ অবশ্যই থাকে। তাই যোগিরাজ বলেছেন দ্বৈতই মহাদুঃখের মূল। কারণ দুই থাকলেই সুখ-দুঃখ ইত্যাদি অবশ্যই আছে। যোগীকে এ সবের ঊর্ধ্বে যেতে হবে, যেখানে গেলে চঞ্চলতার পূর্ণ অবসান, দ্বৈতের অবলুপ্তি, কেবল এক বর্তমান। যখন সবই এক স্থির ব্রহ্ম তখন সুখ-দুঃখ, জ্ঞান-অজ্ঞান, দর্শন-অদর্শন ইত্যাদি কোথায়? এই অবস্থাকেই বলে

পূর্ণমিলন, এই অবস্থাকেই বলে পরমপদ, অভয়পদ, অজর অমর ঘর, যেখান থেকে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। এই অবস্থাই যোগীর একমাত্র কাম্য।

"গুরুকৃপা চাহিতে হয় না, তাহা গুরুর আজ্ঞামতে কার্য্য করিলে আপনা আপনি না চাহিতে পাইয়া থাকে" ॥ ২৬ ॥

গুরুকৃপা সকলেই চায়, সকলেরই কাম্য। কিন্তু কেমন করে পেতে হয় তা সকলে জানে না। গুরুকৃপা কি, এ বিষয়ে বুঝতে হলে প্রথমেই বুঝতে হবে গুরু কাকে বলে এবং তাঁর কৃপা কাকে বলে। শাস্ত্র বলছেন—আত্মা হ বৈ গুরুরেকঃ, আত্মাই গুরু। যোগিরাজ বলছেন, গু—অন্ধকার; রু—আলোক অর্থাৎ অন্ধকাব হতে আলোক প্রদর্শক শ্বাসবায়ুই গুরু এবং কূটস্থ শ্রীগুরু। শ্বাস-প্রশ্বাসের যে চঞ্চল গতি সেই গতিই জীবের বর্তমান অস্তিত্ব। শ্বাসেব এই গতিময় অবস্থাই জীবের কাছে অন্ধকার দিক্। কাবণ গতি থাকার দরুন জীব স্থিরত্বের হদিস পায় না এবং স্থিরত্বের হদিস না পাওয়ায প্রকৃত প্রস্তাবে আলোর সন্ধান পায় না। এক কথায় জীবের যে বর্তমান গতিময় অবস্থা এটাই অন্ধকারেব দিক্ এবং এর বিপরীতে যে স্থিরত্ব তাই আলো বা জ্ঞানের দিক্। তাই যে কোনো প্রকাবে জীবকে স্থিরত্বের হদিস করতেই হবে। এই স্থিরত্বের দিকটাই প্রকৃত পক্ষে গুরুপদবাচ্য এবং মহাস্থিররূপী অবস্থাই শ্রীগুরুপদবাচ্য; অতএব সত্যিকারের গুরু হলেন স্থিরশ্বাস, আবার এই শ্বাসই বেদমাতা গায়ত্রী। শ্বাসের এই চঞ্চল অবস্থাই শিষ্য পদবাচ্য। এই শ্বাসকে ধরেই অর্থাৎ প্রাণকর্মের মাধ্যমে তাকে স্থির করতে হবে, যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। যতই শ্বাস স্থিরত্বের দিকে অগ্রসর হবে ততই গুরু এবং ক্রমান্বয়ে শ্রীগুরুর হদিস পাওয়া যাবে। দেহধারী গুরুর কর্তব্য হোলো কেমন করে এই শ্বাসকে স্থির করতে হয় তার পথ দেখিয়ে দেওয়া, কারণ তিনি নিজে এই কর্ম করে শ্বাসের স্থিরাবস্থার উপলব্ধি করেছেন। এই প্রকার গুরুই সদ্গুরু। তাই শাস্ত্রকার বলেছেন—গুরুকে যিনি মনুষ্যরূপে জ্ঞান করেন তিনি নরাধম। যোগিরাজ তাঁর দিনলিপিতে একটি সূর্য এঁকে তার পাশে লিখেছেন—"এহি গুরুচরণ হয়"। আবার লিখেছেন—"এহি গুরুকা রূপ হয় য়ানে সূর্য—ইহ প্রত্যক্ষ গুরু য়ানে মহাদেব।" এই আত্মসূর্যই গুরুচরণ বা গুরুর রূপ ইহাই প্রত্যক্ষ গুরু অর্থাৎ মহাদেব, কাবণ মহাদেবই আদিগুরু। এই আত্মসূর্যই সবকিছুর উৎপত্তি স্থল, অবস্থান স্থল ও লয়স্থল। এই আত্মসূর্য হতেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর প্রকাশ। এই আত্মসূর্য আছেন বলেই আকাশে উদীয়মান

-সূর্য জ্যোতির্ময়। এই আত্মসূর্যই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই আত্মসূর্য। এই আত্মসূর্যই আসল। তাই যোগিরাজ বলেছেন—"সূর্য্য হমারা রূপ যো ওঁকার হয় ওহি স্থির ঘর যানেকা রস্তা হয়।"—আত্মসূর্যই আমার রূপ যা ওঁকার ও স্থির ঘরে পৌঁছবার রাস্তা। এই আত্মসূর্যই প্রকৃত গুরু, কারণ বার বার এই আত্মসূর্য দর্শন করতে করতে তবেই যোগী স্থিরত্ব অবস্থা লাভ করেন। কিন্তু যখন স্থির অবস্থায় যোগী পৌঁছে যান তখন আর দেখাদেখি নেই, জানাজানি নেই, গুরুশিষ্য নেই, সব মিলেমিশে একাকার। এই অবস্থার কথা বলতে গিয়ে মহাত্মা রামপ্রসাদ বলেছেন—"সে বড় অদ্ভুত ঠাঁই, যেথায় গুরুশিষ্যে দেখা নাই।" যোগিরাজ আরো বলেছেন—"সূর্য্যকা দুসরা রূপ জম ওহি হম—সূর্য্যই হম। জো শ্বাসা সোই সূর্য্যকা জ্যোত সোই হম—সূর্য্যসে ইহ শ্বাসা আতা হয়—ইহ সমঝনা জল্দি নহি হোতা হয়।"—আত্মসূর্যের দ্বিতীয় রূপ যম অর্থাৎ মৃত্যুর স্থান, তাও আমি কারণ ওই আত্মসূর্যই আমার উৎপত্তিস্থল ও লয়স্থল। সেই লয়স্থলও যেহেতু আমি, অতএব আমিই যম বা নিধনকর্তা। এই উভয় অবস্থা যখন একই, তখন আমিই সব। এ অবস্থায় দুই নেই। তখন দুই না থাকায় একমাত্র যে আত্মসূর্য বর্তমান থাকেন তিনিই কৃষ্ণ—"সূর্য্যহি কৃষ্ণ"। এই যে আত্মসূর্য তাঁর কথা বলতে গিয়ে স্বয়ং ভগবান্ বলেছেন—

> ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
> যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ গীতা ১৫/৬

অর্থাৎ সেই আত্মসূর্য দর্শনে যোগী আরও জানতে পারেন আকাশে উদীয়মান এই যে সূর্য ও চন্দ্র এবং অগ্নির দীপ্তি সেখানে নেই, কারণ এই সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নির দীপ্তি সেই অবস্থাকে অর্থাৎ ওই আত্মসূর্যকে প্রকাশিত করতে সক্ষম নয়। ওই আত্মসূর্য পরমজ্যোতির্ময়, স্বয়ং প্রকাশ ও অব্যক্ত। সেই যে অবস্থা যা প্রাপ্ত হলে অর্থাৎ ওই আত্মসূর্য দর্শন করলে যোগিগণ আর সংসারে পুনরাবর্তন করেন না; সেই অবস্থাই আমার পরমধাম। এই আত্মসূর্য সম্বন্ধে কঠোপনিষদ বলেছেন—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমে বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।"—যেখানে সূর্যের কিরণ পৌঁছোয় না, চন্দ্র-তারকার কিরণও পৌঁছোয় না, বিদ্যুতের দ্যুতিও তার অপেক্ষা উজ্জল নয়, এই অগ্নির ত কথাই নেই। তিনি নিত্যকাল দেদীপ্যমান আছেন্ বলে এই দৃশ্যমান সূর্য, চন্দ্র, তারা তাঁর জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়।

এই আত্মসূর্যদর্শনে জীবনের যা কিছু অন্ধকার অর্থাৎ চঞ্চলতা থেকে উদ্ভূত যতকিছু তরঙ্গ ও প্রকাশ সবই দূরীভূত হয় অর্থাৎ সমস্ত তরঙ্গ থেমে যায়। এই আত্মসূর্যই প্রকৃতপক্ষে গুরুপদবাচ্য। গুরুর যে বর্তমান দেহ তাও বিনাশী। কিন্তু

গুরুর ওই দেহের ভেতরে যিনি দেহী তিনি অবিনাশী, তিনি আত্মসূর্য। তাই যোগিরাজ সকলকে বলতেন—"আমার এই হাড়-মাস দেখিয়া লাভ কি? কূটস্থে লক্ষ্য রাখুন, তাহাই আমার রূপ, আমি হাড়মাস বা 'আমি' এই শব্দও আমি নহি, আমি সকলের দাস।"—এ বিষয়ে তিনি আরো বলেছেন—"সেই গুরু-ভগবানে লক্ষ্য রাখিতে বিধিপূর্বক চেষ্টা করুন, ইহাতেই মঙ্গল। আত্মাই গুরু। সেই অব্যয় অবিনাশী গুরুই (আত্মা) অহৈতুকী প্রেমের উদাহরণ। তিনি অতি নিকটে সর্বদা সকলের কাছে আছেন, ইহাতেও কেহ তাঁহার অন্বেষণে যত্নবান্ নহে।"

এবার সেই গুরুর 'কৃপা' কাকে বলে দেখা যাক। কৃপা—কৃ ধাতু কর্ষণ করা, পা—পাওয়া বা লাভ করা অর্থাৎ এই দেহরূপ ক্ষেত্রকে প্রাণকর্মের দ্বারা কর্ষণ করতে করতে যে স্পন্দনরহিত নিবৃত্তিরূপ শাশ্বত স্থিরত্বপদ লাভ হয় সেই অবস্থাই কৃপাপদবাচ্য। আবার এই অবস্থাকেই শ্রীকৃষ্ণ বলা হয়। অতএব এইপ্রকার কৃপা লাভ করা প্রাণকর্ম সাপেক্ষ। এই প্রকার কৃপা অর্থাৎ এই যে স্থিরপদ (নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্চতে) তা চাইলে পাওয়া যায় না। এই প্রকার কৃপা ভিক্ষার বস্তু নয়, কর্মের মাধ্যমে (প্রাণকর্মের) অর্জন করতে হয়। তাই যোগিরাজ বলেছেন—"গুরুকৃপা চাইতে হয় না, গুরুর আজ্ঞামতে কার্য্য করিলে আপনাআপনি না চাহিতে পাইয়া থাকে।" অতএব গুরুবাক্য দৃঢ় করে গুরুর উপদেশমত ক্রিয়া করতে থাকলে স্থিরপ্রাণে ভগবান্ বোধ আপনা হতেই হবে এবং তা একদিন প্রত্যক্ষ হবে ইহা অতীব নিশ্চয়। অতএব ভয়ের সহিত ক্রিয়া করলে সঠিক ক্রিয়া করা হয় না এবং সেইরকম ক্রিয়া দ্বারা নিজেকে রক্ষা করা যায় না। অতএব সমস্ত প্রকার ভয় ও সন্দেহ পরিত্যাগ করে, ক্রিয়া করলে মরব কি বাঁচব, ভাল হবে কি মন্দ হবে, এই রকম সমস্ত প্রকার আশা-নিরাশা ত্যাগ করে ক্রিয়া করলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা যায়। অতএব স্থিরপদই যে কৃপা এতে আর কোন সন্দেহ নেই এবং সেই কৃপা সাধন করে অর্জন করতে হবে, এছাড়া আর কোনা বিকল্প নেই।

তবে কোনো ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ যদি কাউকে কোনোপ্রকার কৃপা বা আশীর্বাদ করেন তবে কি তা বিফল হয়? তা কখনই নয়, অবশ্য এই প্রকার কৃপা অস্থায়ী। কারণ অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ভক্তের সাময়িক দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য দয়া পরবশ হয়ে যে কৃপা করে থাকেন, তা শিষ্যের অর্জিত না হওয়ায় তাৎক্ষণিক বা অস্থায়ী হতে বাধ্য। এই প্রকার কৃপালাভে ভক্তের সাময়িক উপকার সাধিত হয় নিশ্চয়ই। কিন্তু সাধক যদি গুরুর আজ্ঞামতে কার্য করে স্থায়ী স্থিরত্বের হদিস পায়, সেই অবস্থায় যে কৃপা তা স্থায়ী হবে, কারণ এই অবস্থা তার অর্জিত সম্পদ। অতএব এই অর্জিত সম্পদরূপ যে কৃপা সেই কৃপা যাতে সকলে লাভ করতে পারে তার কথাই

যোগিরাজ বারবার বলেছেন অর্থাৎ সদ্‌গুরুর আজ্ঞামতে কার্য কর এবং ক্রিয়ার পরাবস্থায় স্থায়ী স্থিরঘরে অবস্থান কর ; তখন দেখবে কৃপা বা আশীর্বাদ চাইতে হবে না, আপনা হতেই পাবে এবং তা স্থায়ী সম্বল হবে।

"তোমার নিজের ভালো কিসে হবে তা তুমি নিজেই জানো না" ॥ ২৭ ॥

আমরা সবাই চাই আমাদের মঙ্গল হোক, ভাল হোক। সেজন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, সারাদিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করি। আমরা ভাবি অনেক অর্থ রোজগার করলে ভাল হবে, শরীর সুস্থ থাকলে ভাল হবে ইত্যাদি। কিন্তু স্থায়ীরূপে ভাল কিছুতেই হয় না। তাই যোগিরাজ বলছেন সঠিক ভাল কি উপায়ে হবে তা কেউ জানে না, অথচ ভাল হোক এই আশায় সকলেই দিবানিশি না জেনে কর্মে ব্যস্ত। কোন্ কর্ম করলে ভাল হবে, মঙ্গল হবে তা না জানায় যত গোল। অতএব নিজের ভাল হোক এ যদি লাভ করতে হয় তবে প্রথমেই জানতে হবে কোন্ কর্ম করলে ভাল হবে। কর্ম ত আমরা সবাই করি—অর্থ রোজগার করি, সংসার করি, শরীরকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করি, তীর্থ ভ্রমণ, জপ, ব্রত, দীনদরিদ্র আতুর সেবা, ঈশ্বর সাধন, কত না করি। কিন্তু কিছুতেই আর সঠিক ভাল হয় না। এত কিছু করেও সঠিক ভালর যে কর্ম তা না জানায় যত গোলমাল। যে ব্যক্তি নিজের ভাল করতে জানে না, সে কখনই অপরের ভাল করতে পারে না। অথচ অপরের ভাল করার জন্য কত না চেষ্টা। দিন দুঃখীর সেবা করলে, অপরের ভাল করলে আমার সুনাম হবে, আমার ভাল হবে এই চেষ্টায় সবাই রত। কিন্তু হায়, কোন্ কর্ম করলে নিজের সত্যিকারের হিত হয়, ভাল হয় তা জানা হোলো না। আজকে যার রোগ হয়েছে সে রোগ সারিয়ে তুললে পরে তা আবার হবে, আজ যে ক্ষুধার্ত তাকে অন্ন দিলে কাল তার আবার ক্ষুধা লাগবে ইত্যাদি। এসব কর্মগুলি মন্দের ভাল, কিছু না করার চেয়ে কিছু করা ভাল। এসবের দ্বারায় সামাজিক উপকার নিশ্চয়ই হয় ; অতএব এ কর্মগুলি করা ভাল। কিন্তু এসব কর্মের দ্বারা নিজের স্থায়ী ভালো হয় না। তাহলে নিজের স্থায়ী ভালো কোন্ কর্মের দ্বারা হতে পারে তা জানা দরকার এবং সেই ভালটাই বা কি, কাকে ভালো বলে তাও জানা দরকার।

প্রাণের চঞ্চল অবস্থায় এই জীবদেহ বর্তমান। অতএব যতক্ষণ প্রাণ চঞ্চল থাকবে ততক্ষণ দেহ থাকবে এবং দেহ থাকলেই রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি যা কিছু দেহধর্ম ও মনোধর্ম সবই থাকবে। এ সবই প্রাণের চঞ্চল

অবস্থা হতে জাত এবং যতক্ষণ প্রাণের চঞ্চল অবস্থা বর্তমান ততক্ষণ এদেরও অস্তিত্ব থাকবে। কিন্তু প্রাণের স্থিরাবস্থায় এসব কিছু নেই। জীব যদি কোনো প্রকারে প্রাণকে স্থির করতে পারে তখন সে সকল মন্দের অতীতে পৌঁছে যায়, তখন আর ভাল মন্দ দুইই থাকে না। দুই হলেই নানাত্ব, নানাত্ব হলেই ভাল মন্দ। কিন্তু যেখানে এক অর্থাৎ স্থিরভাব ভালমন্দ সেখানে নেই। অতএব সকলকে চেষ্টা করতে হবে কি উপায়ে প্রাণকে স্থির করা যায়। সেই কর্ম হোলো প্রাণকর্ম যা সদ্‌গুরুর নিকট উপস্থিত হয়ে শিক্ষালাভ করতে হয়। সদ্‌গুরু হাতে-কলমে সেই কর্ম দেখিয়ে দেন। পরে শিষ্য সেই কর্ম করে নিজের ভালো করেন অর্থাৎ চঞ্চল প্রাণকে স্থির করেন। প্রাণের এই চঞ্চল দিকটাই শিষ্য বা মন্দ বা অন্ধকার। স্থির দিকটাই গুরু বা জ্ঞান বা ভালো। তাই যোগিরাজ বলছেন সেই প্রাণকর্ম যা করলে তোমার ভালো হবে তা তুমি নিজেই জানো না এবং না জানার দরুন সে কর্ম তুমি কর না অথচ ভালো হোক এ আশায় বৃথা ছুটে বেড়াও। তাই দয়ার্দ্র হৃদয়, মানুষের দুঃখে কাতব, মানুষেব পরম কল্যাণকামী শ্যামাচরণ দেখলেন জীব এই চঞ্চল দিকে থাকাতেই যত কিছু মন্দ। তাই তাদের এই চঞ্চলতার অবসান কল্পে, তাদেব দুঃখ কষ্ট লাঘবেব জন্য সকল মানুষকে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করে বললেন—ক্রিয়া কবলেই মঙ্গল, না করলেই অমঙ্গল ; ক্রিয়া সত্য, আর সব মিথ্যা। কাবণ তিনি দেখলেন মানুষ সহ সকল প্রাণী প্রাণের চঞ্চল অবস্থায় থাকায় তাদের দুঃখ কষ্টের অন্ত নেই। এই চঞ্চল অবস্থার যে তরঙ্গ সেই তবঙ্গই সকলকে অবিরত দুঃখকষ্টের দিকে ঠেলে দেয়, এটাই মহামায়া। এই তরঙ্গের অতীতে স্থিরাবস্থায় প্রাণকে কোন্ উপায়ে স্থাপিত করা যায়, যোগিরাজের প্রাণ তার জন্য কেঁদে উঠেছিল। তাই তিনি স্পষ্টভাবে জানালেন জাগতিক যত কর্মই তোমরা কর না কেন এর দ্বারা স্থায়ী ভাল কখনই সম্ভব নয়, তাই এগুলি অকর্ম। স্থায়ী ভাল প্রাণকর্ম সাপেক্ষ, যার কোন বিকল্প নেই ; তাই এই প্রাণকর্মই একমাত্র কর্মপদবাচ্য।

অতএব সঠিক ও স্থায়ী ভাল বলতে যাকিছু বোঝায় তা প্রাণের স্থির অবস্থায় বর্তমান। এবং যতকিছু মন্দ সবই প্রাণের চঞ্চল অবস্থা হতে জাত। তাই যে কোন প্রকারেই হোক না কেন প্রাণকে স্থির করতে পারলে তবেই ভালকে পাওয়া যাবে এবং তার পূর্বে প্রাণের চঞ্চল অবস্থায় জীব যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সঠিক ও স্থায়ী ভাল সম্ভব নয়। তাই যোগিরাজ বলছেন—"যে যাবার সে যাক বয়ে

তুই আপন কর্ম করে যা
তোর হবে ভাল
শেষে তুই স্থির ঘরে চলে যা।"

অর্থাৎ জাগতিক যতপ্রকার কর্ম তোমরা কর সেই সব কর্মকে উপেক্ষা করে, একমাত্র প্রাণকর্মকেই কর্ম বলে জান এবং সেই কর্ম করতে থাক। এই প্রকারে প্রাণকর্ম কিছুদিন নিষ্ঠা ও তেজস্বিতার সঙ্গে করতে থাকলে শেষে তোমার নিশ্চয় ভাল হবে যখন তুমি স্থির ঘরে চলে যাবে। কারণ সেই স্থির ঘরে কোনোপ্রকার তরঙ্গ না থাকায় কোন কিছু উৎপন্ন হয় না এবং কোনোপ্রকার কর্ম সেখানে থাকে না। কোনোপ্রকার তরঙ্গ না থাকায়, যাকে তোমরা ভাল বা মন্দ বল, এই উভয় অবস্থাই সেখানে থাকে না। এই প্রকার যে স্থির অবস্থা তাই সঠিক ভাল এবং তার পূর্বে অর্থাৎ ওই স্থিরস্থলাভের পূর্বে সবই ভাল-মন্দ মিশ্রিত। এই ভাল-মন্দের উর্ধ্বে যে সঠিক ভাল স্থির ঘর তার কথা বলতে গিয়ে যোগিরাজ বলছেন—"স্থির ঘরমে ঠহরে—অব অটকনেকা জাগহি মিলা।" ভালমন্দের অতীতে, চঞ্চলতার উর্ধ্বে যে স্থির ঘর সেই স্থির ঘরে সর্বদার জন্য আটকে থাকার মত অবস্থা পেলাম। এই যে অবস্থা সেটাই সঠিক ভাল ও আনন্দদায়ক—"অব ময় আনন্দকা ঘর পায়া য়ানে শ্বাসা ন আওএ ন যাএ।" এই অবস্থায় যখন শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি আর নেই, সব কিছুই স্থির হয়ে গেল, সেই স্থির অবস্থাই আনন্দদায়ক, এই অবস্থাটাই প্রকৃত ভাল। এই স্থায়ী ভালকে পেতে গেলে অর্থাৎ এই স্থিরাবস্থাকে লাভ করতে হলে যে কঠোর সাধনার প্রয়োজন সে কথা বলতে গিয়ে যোগিরাজ বলেছেন—

প্রাণ যায় যাক ক্ষতি নাই
পাইব আমি সেই ধন ·
হরি ধন অমূল্য রতন।

এই যে নশ্বর দেহ, সাধন করতে করতে যদি এর নিধন হয় সেও ভাল তবুও আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে সাধন করতেই হবে এবং শেষে যখন অমূল্য হরিধন (স্থিরপদ) লাভ হবে তখন জীবনের সমস্ত জ্বালা চলে যাবে। কেউ যদি বিনা সাধনায় জীবন অতিবাহিত করতে থাকে এবং এই জগতিক সুখভোগের আশায় রত থাকে তারও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাই যোগিরাজ বলছেন এই প্রকারে মৃত্যু কাম্য হওয়া উচিত নয়। বরং ঈশ্বর সাধন করতে করতে যদি ইহ জীবনের সমাপ্তি ঘটে সেও ভাল তাই সত্যিকার ভাল যে কি তা জীব জানে না, জানলেই ত শিব হল (শিব অর্থে স্থির)। আবার ভাল যে কি তা না জানায় সময়ে সময়ে ভালকেই মন্দ বলে মনে করে এবং সকল কর্ম করে থাকে। ক্রিয়ার পরাবস্থায় (কর্মের অতীতাবস্থায়, স্থিরাবস্থায়) যখন শ্বাসের টানাফেলার ইচ্ছা আর থাকে না, সবকিছু নিশ্চল হয়ে যায় সেই অবস্থায় মনকে রাখা চাই, কারণ সেই অবস্থাই প্রকৃত ভাল, স্থায়ী ভাল। সেই অবস্থাই কৃষ্ণ। এই প্রকার ভালকে লাভ করতে হলে তা কর্ম করে অর্জন করতে হবে, এই

ভাল প্রাণকর্মসাপেক্ষ। তাই মানব দরদী শ্যামাচরণ সকলের দুঃখ কষ্ট লাঘবের জন্য উদাত্ত কণ্ঠে জানালেন—"এই দেহেই মুক্তিলাভ করতে হলে বিধি পূর্বক ক্রিয়া করা চাই, তবেই গুরুকৃপায় যা প্রার্থনীয় তা ঘটে। যারা বলে কেবল সুখ ও দীর্ঘায়ু চাই, মুক্তি চাই না, তাদের সব ফাঁকিবাজী। তারা আশীর্বাদ চায় তা কিন্তু হবার নয়।" যদি কেউ মনে করে এই দেহে হয়ত মুক্তিলাভ সম্ভব নয়, তা ঠিক নয়, এটা দুর্বলতার লক্ষণ। এমন দুর্বল প্রকৃতির যে মানুষ, যা সাধারণতঃ দেখা যায়, তাদেরও হতাশ না করে যোগিরাজ বলছেন এই প্রকার দুর্বলতাকে পরিত্যাগ করে ভক্তি, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও তেজস্বিতার মাধ্যমে যদি উত্তম প্রকারে ক্রিয়াসাধন করতে থাক তবে সেই স্থিরপদ এই জীবনে নিশ্চয় পাবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কেবল চাই তোমার আন্তরিক প্রচেষ্টা। কারণ এই কর্মই তোমাকে নিয়ে যাবে সকল প্রকার কর্মের অতীতাবস্থায়। এই প্রাণকর্মের এমনই মহিমা, কারণ এ কর্ম স্বয়ং সম্পূর্ণ ও বিজ্ঞান সম্মত। অতএব তোমরা যদি সঠিক ভাল পেতে চাও তাহলে জগতের দিকে বেশী লক্ষ্য না রেখে, জাগতিক কর্মের মধ্যে অধিক জড়িয়ে না পড়ে এই প্রাণকর্মরূপ ক্রিয়াসাধন যতটা পার দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তম প্রকারে করতে থাক, তাহলে আমি কথা দিচ্ছি তোমাদের ভাল নিশ্চয় হবে।

"ওহি সূর্য্য উসিকা জ্যোত সমেত ওহি মহাপুরুষ ব্রহ্ম
হয়—বড়া আনন্দ—অব বড়া মজা হুয়া, অব বিলকুল
শ্বাসা ভিতর চলতা হয় ইসকে বরাবর আনন্দ কোই
দুসরা বাত নহি ইসিকা নাম চিদানন্দ--এহি ব্রহ্ম—
এত্তেরোজ বাদ আজ জন্ম সফল" ॥ ২৮ ॥

মানুষ আকাশের সূর্যকেই সূর্য বলে জানে। কিন্তু মহাযোগীদের কাছে এই সূর্য অনিত্য, তাঁরা সূর্য বলতে জানেন আত্মসূর্যকে, যা নিত্য, শাশ্বত, অবিনাশী, অব্যয় এবং সেই সূর্যই ধর্মগোপ্তা। সেই আত্মসূর্যকেই যোগিরাজ বলেছেন—"সূর্য হি মালিক," আবার কখনো বলেছেন—"সূর্য হি কৃষ্ণ।" যোগী প্রাণকর্মের মাধ্যমে বায়ুর স্থিরাবস্থায় যখন কূটস্থে স্থিতিলাভ করেন তখন এই আত্মসূর্য আপনাহতেই তাঁর সামনে উদিত হয় এবং তিনি তখন সেই আত্মসূর্য দর্শনে নিখিলবিশ্বের সবকিছু রহস্য জানতে পারেন। এই আত্মসূর্যকে দর্শন করে অর্জ্জুন বলেছিলেন—তুমিই শাশ্বত ধর্মগোপ্তা অর্থাৎ সকল ধর্মের গুপ্ত রহস্য তুমিই। তোমাকে জানলেই সবকিছু জানা হয়।

এখানে যোগিরাজও সাধনার মাধ্যমে অর্জুনের মত সেই আত্মসূর্য দর্শন করে বলছেন যে ওই আত্মসূর্যের যে জ্যোতি সেই জ্যোতি সমেত আত্মসূর্য তিনিই মহাপুরুষ ব্রহ্ম। অর্থাৎ আত্মসূর্য, তার জ্যোতি, মহাপুরুষ এবং ব্রহ্ম সবই অভিন্ন। অতএব মহাপুরুষ বলতে কোনো বিশেষ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষকে বোঝায় না। মহাপুরুষ হোলো একটা অবস্থা। এই অবস্থায় বড়ই আনন্দ। প্রাণকর্ম করতে করতে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি সম্পূর্ণ থেমে গিয়ে সুষুম্নাবাহী হয় তখন এই অবস্থা আপনাহতেই লাভ হয়, এই অবস্থায় উপনীত হলে যে আনন্দ তা আর অন্য কিছুতেই প্রাওয়া যায় না। এই শাশ্বত আনন্দে স্থিতিলাভ করে তিনি বলছেন যে এই অবস্থাকেই চিদানন্দ বলে কারণ এই অবস্থাই চৈতন্যস্বরূপ নিত্যানন্দময় পরমপুরুষ। এই অবস্থাই পরমজ্ঞান সদানন্দ শিব, এই অবস্থাই ব্রহ্ম। এই অবস্থাই সবকিছুর মালিক ও এই অবস্থা থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি আবার ঘুরে ফিরে এখানেই লয়। এই চিদানন্দরূপী আত্মসূর্য দর্শনে তিনি জানতে ও বুঝতে পারলেন যে এতদিনের সাধনার ফল যে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান ও মুক্তাবস্থা তা লাভ হোলো, তাই আজ মনুষ্য জন্ম সফল হোলো।

প্রাণের প্রচণ্ডতম চঞ্চল অবস্থাই জীবেব বর্তমান অস্তিত্ব এবং অখিল বিশ্বের প্রকাশ। আবার এই প্রাণেরই সম্পূর্ণ স্থিরাবস্থাই হোলো ব্রহ্ম। তাই প্রাণের প্রসারণই জীব এবং সংকোচনই শিব। প্রাণের এই প্রচণ্ডতম চঞ্চল অবস্থা থেকে যতই স্থিরত্ব অভিমুখে যাওয়া যায় ততই এক এক স্তরকে অতিক্রম করতে হয়। যোগী যতই এইসব স্তরকে অতিক্রম করতে থাকেন তখন তাঁর কাছে সেই সব স্তরের অবস্থাগুলি প্রকাশিত হয়। এই রকম এক একটি স্তর হোলো মহাপুরুষ, পুরুষোত্তম, কৃষ্ণ, শিব ইত্যাদি এবং সর্বশেষে নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্চতে। যোগী যখন যে স্তরের মুখোমুখি উপস্থিত হন তখন সেই স্তরের অবস্থা তাঁর দর্শন হয়। পরে তিনি সেই স্তরে নিজেকে সম্পূর্ণ মিলিয়ে দিয়ে নিজেই সেই স্তর হয়ে যান। তারপর তিনি আবার পরবর্তী স্তর অভিমুখে ধাবিত হন যতক্ষণ না নিজেকে স্থির ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারেন। অন্তে যোগী নিশ্চল অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে নিজেই স্থিরব্রহ্মে মিশে যান। এই স্থির অবস্থাটাই ব্রহ্ম, যাকে পরিণাম ও চূড়ান্ত সত্য বলে। সেই চূড়ান্ত সত্যে মিলে যাওয়াই যোগীর লক্ষ্য। যতক্ষণ যোগী সেই পরিণাম সত্যে মিলে যেতে না পারেন ততক্ষণ তাঁর বিশ্রাম নেই। এই চূড়ান্ত সত্যে মিলে যাওয়ার পূর্বে যেসব স্তরগুলি যোগীকে অতিক্রম করতে হয় এবং যখন যোগী যে স্তরে উপনীত হন তখন তাঁর কাছে সেই স্তরগুলিই সত্যরূপে প্রতিভাসিত হয়। এই প্রকারে যখন যোগী পরবর্তী স্তরে উন্নীত হন তখন আবার সেই অবস্থাই সত্যরূপে প্রতিভাসিত হতে হতে শেষে যোগী মহাস্থির ঘরে পৌঁছে যান এবং নিজেকে সেই

অবস্থায় মিলিয়ে দেন। তখন তাঁর কাছে আর তুই বলার কেউ থাকে না, কারণ তখন তিনি নিজেই নেই। এটাই হোলো যোগীর সাধনা ও চলার পথ। এটাই হোলো বেদান্তের সাধন। এই পথ ধরে যোগিরাজ চলেছেন এবং শেষে নিজের অবলুপ্তি ঘটিয়ে নিজেই ব্রহ্ম হয়ে গেছেন। যদিও তিনি নিজেই শাশ্বত পুরুষ, কেন তাঁর এই পৃথিবীতে আগমন এবং সেটা যে তাঁর ইচ্ছাধীন, এসব জানা সত্ত্বেও জীবরূপে পৃথিবীতে আসায় মহামায়ার প্রভাবে সবই তাঁর ভুল হয়েছিল এবং এটাই স্বাভাবিক। তাই তাঁকে পুনরায় সাধন করে স্বাভাবিক এই চঞ্চলতার প্রবাহকে ক্রমে ক্রমে কাটিয়ে পুনরায় নিজেকে স্থিরব্রহ্মে মিলিয়ে দিয়ে স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়েছিল। এইসব স্তর গুলিকে তিনি যখন যেভাবে অতিক্রম করে গেছেন, তাঁর গোপন দিনলিপিতে সেই সব স্তর গুলিব বর্ণনাও রেখে গেছেন, যেগুলিকে সকল শাস্ত্রের মিলিত সমষ্টি বলা যায়। খণ্ড খণ্ড বিভিন্ন শাস্ত্র পড়ে মানুষ যে বাহ্যজ্ঞান আহরণ করতে পারে, যোগিরাজের এই ক্রম, স্তর বা অবস্থাগুলির কথা, যা তিনি গোপন দিনলিপিতে লিখে রেখে গেছেন সেগুলি জানলে সকল শাস্ত্রের বাহ্য মূলজ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু যদি কেউ অন্তরনিহিত রহস্যকে জানতে চান এবং এইসকল স্তরগুলি অতিক্রম করতে চান তবে তাঁকে এই যোগসাধন করেই লাভ করতে হবে, গ্রন্থ পড়ে নয়। এটাই হোলো যোগিরাজের দেওয়া মূল শিক্ষা। এই শিক্ষা আজ গ্রহণ কর অথবা কাল, এ জীবনে গ্রহণ কর অথবা পরজন্মে। কিন্তু জেনে রেখো করতেই হবে, এ সাধন করতেই হবে, এর অন্যথা হবার উপায় নেই। তাই ক্রিয়া সত্য, আর সব মিথ্যা।

এই সব স্তরগুলোকে অতিক্রম কবতে গিয়ে কখনো লিখেছেন—"আপনাহি স্বরূপ নারায়ণকা দেখা। মহাদেব ও পার্বতী আদমিকা রূপ দেখা, পার্বতী হমে চুমা দিয়া।"—আপন স্বরূপ নারায়ণকে দেখলাম। মনুষ্যরূপী মহাদেব ও পার্বতীর রূপ দেখলাম। মাতৃভাবে পার্বতী আমাকে চুমা দিলেন। আবার ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট লিখেছেন—"এক আদি পুরুষ খডা দেখা। আদি পুরুষ শূন্য মে। চাঁদমে ওহি পুরুষোত্তমকা রূপ রাতভর দেখা কভি হাত কভি পএর ভি হয়।"—মহাশূন্যে এক আদিপুরুষ দণ্ডায়মান দেখলাম। কূটস্থে যে চন্দ্র দেখা যায় সেই চন্দ্রমধ্যে ওই পুরুষোত্তমের রূপ সারারাত ধরে দেখলাম, কখনো কখনো হাত পা আছে তাও দেখলাম। পরের দিন ১৩ই আগষ্ট লিখেছেন—"আজ হম মহাপুরুষ হুয়ে।" —আজ আমি মহাপুরুষ হলাম। ১৭ই আগষ্ট লিখেছেন—"মহাপুরুষ হম হয়—সূর্যমে এয়সা দেখা হমহি ব্রহ্ম হয়।"—আমিই মহাপুরুষ এবং আমিই ব্রহ্ম, আত্মসূর্যের ভেতর এই রকম দেখলাম। পরের দিন ১৮ই আগষ্ট লিখেছেন—"হামারাই রূপসে জগত

প্রকাশিত—হমহি এক পুরুষ হয় আউর কোই নহি।"—আমারই রূপ হতে জগতের প্রকাশ, আমিই একমাত্র পুরুষ, এ অবস্থায় সেখানে আর কেউ নেই। কারণ স্থির অবস্থাই পুরুষ এবং চঞ্চল অবস্থাই প্রকৃতি। মহাস্থির অবস্থায় চঞ্চলতা না থাকায় একমাত্র পুরুষই বর্তমান থাকেন। ২২শে আগষ্ট লিখেছেন—"হমহি আদিপুরুষ ভগবান।"—অনাদিমধ্যান্ত স্থিরপুরুষ ভগবান্ আমিই। ২৫শে আগষ্ট লিখেছেন—"সূর্য নারায়ণ ভগবান্ জগদীশ্বর সর্বব্যাপী হম হয়। হমহি অক্ষর পুরুষ।"—আত্মসূর্যরূপী নারায়ণ ভগবান্ জগদীশ্বর যিনি সর্বব্যাপী তা আমিই। আমিই সেই অক্ষর পুরুষ। জীবাত্মা যখন নিজেকে নির্গুণ ও পরমাত্মা হতে অভিন্ন বলে জেনে তাঁতেই বিলীন হন, তখনই তিনি অক্ষর পদবাচ্য। এই প্রকারে স্তরগুলিকে অতিক্রম করতে করতে এবং নিজেই সেইসব স্তর-গুলিতে রূপান্তরিত হতে হতে এগিয়ে চলেছেন শ্যামাচরণ। এই প্রকার এগোতে এগোতে কখনো বলেছেন—"হম হি মহাপুরুষ পুরুষোত্তম।" কখনো বলেছেন—"হম হি কৃষ্ণ।" আবার কখনো বলেছেন—"হম সূর্য্য হয়—মহাদেব।" এই প্রকারে আরো স্তর অতিক্রম করতে করতে শ্যামাচরণ ছুটে চলেছেন মহাশূন্যরূপী স্থির ব্রহ্ম অভিমুখে। তাই তিনি কখনো লিখেছেন—"শূন্য আসল চিজ হয়।" কখনো লিখেছেন—"সূর্য্য শূন্য হয় শূন্য মে মিল জানা হয়।" আবার লিখেছেন—"হমহি আসমানকা সূর্য্যরূপ—হম ছোড়ায় দুসরা কোই নহি। যো শূন্য ভিতর সোই বাহর। অব শিরফ সূন্য হোজানা হয়।" শেষে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মহাশূন্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে বললেন—"হম বিনা কুছ নহি, ফিব হমভি নহি, খালি শূন্য নির্মল ওহি আপনে পদ। এহি কা নাম পার উতরনা কহতে হয়—ইসিনেসেমে যোগিলোগ পড়ে রহতে হয়।" কেবল আমি ব্যতীত আর কেউ নেই। আবার আমিও নেই, কেবল নির্মল মহাশূন্য বর্তমান। এই মহাশূন্যই আপনপদ, স্ব-স্বরূপ অবস্থা, এই অবস্থাতেই সমস্ত মহাযোগিগণ অবস্থান করেন। এই অবস্থাকেই ভবসংসার অতিক্রম করা বলে। শেষে কোন রূপই থাকে না, সবই মহাশূন্যে মিলে যায়। এরই উপসংহার করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"যত রূপ দেখা যায় সব অপরূপ। সব রূপ শূন্যমে মিলযাতা হয়।"

———

"কস্‌কে প্রাণায়াম করনা চাহিয়ে।" ॥ ২৯ ॥

প্রত্যেকেই ঈশ্বরের ভক্ত। কেবল মানুষ নয়, প্রতিটি প্রাণীই ঈশ্বরের ভক্ত। কারণ প্রাণরূপী ঈশ্বর আছেন বলেই সকলের অস্তিত্ব। সেই প্রাণরূপী ঈশ্বরের ভক্ত নয় কে? তবে কেউ জেনে ভক্ত কেউ না জেনে ভক্ত। যে যেভাবেই সাধনা করুক

না কেন মূল প্রাণকে বাদ দিয়ে সাধন হয় না এবং সকল-সাধনাই ঘুরে ফিরে প্রাণেরই করা হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর থেকে শুরু করে একটা ধূলিকণা পর্যন্ত এই প্রাণ সত্তায় বিরাজিত। একই প্রাণ বহুরূপে বিচিত্র প্রকাশ। ঈশ্বর সাধনের বহু পথ ও মত দেখা যায়, সেকারণে বহু দেবদেবী, খোদা, গড্, ভগবান্ ইত্যাদি বিভিন্ন নাম, রূপ ও মতবাদ দেখা যায়। কারণ সকলের রুচি বা অভিমত এক নয় এবং এক না হওয়ায় বিভিন্ন। কিন্তু এটা ঠিক যে এই সকলের মধ্যে এক প্রাণসত্তা বিরাজমান আছেন, যাঁর অস্তিত্বে সকলের অস্তিত্ব। তিনি নেই তো কেউ নেই, আবার তিনি নেই এমন কিছুই হতে পারে না। বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন নদী যেমন সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, তেমনি যে কোন সাধনার ধারা ওই প্রাণসত্তাতেই মিলিত হয়। অতএব এদিক ওদিক না করে, বিভিন্ন মত ও পথের চাথাচাথি না করে সরাসরি প্রাণের সাধনা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ প্রাণকে বাদ দিয়ে কোনো সাধনই হতে পারে না। প্রাণই বন্ধনকর্তা, প্রাণই মুক্তিদাতা, প্রাণই সর্বময়কর্তা। কি উপায়ে সেই প্রাণকে পাওয়া যায়, সেই প্রাণের সাধনার কথাই যোগিরাজ বলেছেন। এই প্রাণের সাধনায় কোনো দল, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, জাতি ইত্যাদি কিছুই নেই, কারণ সবার ভেতর সেই একই প্রাণ। সবার ভেতর সেই একই প্রাণ, অথচ তাকে কেউ জানল না, এটাই মূর্খতা। প্রাণকে জানলেই সব জানা হয়। এই প্রাণের সাধনার একমাত্র উপায় প্রাণায়াম। এই প্রাণকে প্রাণ বা ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু ভেবে সাধন করতে গেলেই বিভিন্ন মতবাদ ও সাধনার পথ এসে যায়। কিন্তু যেখানে একমাত্র সর্বময়কর্তা প্রাণেরই সাধন সেখানে বিভিন্ন মত বা পথের প্রশ্ন আসে না। সেখানে কেবল একমাত্র প্রাণায়ামই সাধন পথ। এই প্রাণায়াম সাধনই মূল পথ, আদি পথ, চিরন্তন ও শাশ্বত পথ, যা সকল ঋষি ও মহাত্মাগণ করে থাকেন। অতএব প্রাণায়াম সাধনায় বিভিন্ন মতবাদের কথা আসে না। তাই যোগিরাজ বলেছেন—প্রাণায়ামে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। আবার প্রাণায়াম সাধনই যে শ্রেষ্ঠ এবং মহাধর্ম সেকথা শাস্ত্রেও বলা আছে—প্রাণায়ামো মহাধর্ম। এই প্রাণায়ামে বহুপ্রকার নিয়ম বা বিধি প্রচলিত আছে কারণ যে যেমন বুঝেছে সে তেমনই প্রাণায়ামের নিয়ম বা বিধি চালু করেছে। ফলে বহুপ্রকারের প্রাণায়ামের কথা জানা যায়। কিন্তু এগুলি বহু হওয়ায় এবং বহির্মুখী প্রাণায়াম হওয়ায় কোনটাই ব্রহ্মবিদ্যা নয়। ব্রহ্মবিদ্যারূপ যে প্রাণায়াম তা অন্তর্মুখী এবং একই, সেখানে বিভিন্নতা নেই। এই ব্রহ্মবিদ্যারূপ যে প্রাণায়াম তা কেবল যোগিগণই অবগত আছেন, অন্যের পক্ষে জানা অসম্ভব। এই প্রাণায়াম কেমন করে করতে হবে সেকথা বলতে গিয়ে বলেছেন—কসকে প্রাণায়াম করনা চাহিয়ে। অর্থাৎ তেজস্বিতার সঙ্গে, অন্তর্মুখীভাবে, বলপূর্বক এই প্রাণায়াম

করতে থাকলে 'জলদিসে স্থির হো যাও।' প্রাণের যে চঞ্চল গতি, যেটা প্রতিটি জীবের বর্তমান অস্তিত্ব তাকে থামিয়ে স্থির করাটাই সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য ; কারণ প্রাণের ওই স্থিরাবস্থাই ব্রহ্ম। স্থির হওয়াটাই যদি সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তাহলে অন্তর্মুখী প্রাণায়াম বা প্রাণকর্ম ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। যদি অন্য কোনো সাধনার মাধ্যমে প্রাণকে স্থির করবার চেষ্টা করা হয় তবে তা ক্ষণস্থায়ী হবে এবং ক্ষণস্থায়ী হওয়ায় ব্রহ্ম সমীপে উপস্থিত হলেও অনতিবিলম্বে পুনরায় চঞ্চলতায় ফিরে আসতে হবে। তাই অন্তর্মুখী প্রাণায়াম সাধন ব্যতীত অন্য সাধনায় স্থিরত্বে বা ব্রহ্মে স্থায়ী স্থিতি বা লয় কখনই হয় না। অথবা অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম ব্যতীত অন্যপ্রকার সাধনায় সেই স্থির ঘরে যে স্থায়ী স্থিতি হবে তার নিশ্চয়তা না থাকায় বিজ্ঞানসম্মত সাধন হোলো না। কিন্তু এই অন্তর্মুখী প্রাণায়াম সাধন বিজ্ঞানসম্মত হওয়ায় স্থায়ী স্থিতি যে হবে তা নিশ্চয় এবং অবশ্যম্ভাবী।

প্রচ্ছর্দন বিধারণ বা টানা ফেলা, শ্বাসের এই দুই গতি জীবদেহে সর্বদাই চলছে। শ্বাসের এরূপ বহির্মুখী গতিসম্পন্ন প্রাণায়াম সব দেহে সর্বদাই চলছে। শ্বাসের এই গতি বহির্মুখী হওয়ায় জীবের সকল অস্তিত্ব বহির্মুখী ও চঞ্চল। তাই জীব কোনো প্রকারেই অন্তর্মুখী ও স্থিরত্বলাভ করতে পারে না। স্থিরত্বলাভ করতে না পারায় নিশ্চল যে ব্রহ্ম তার থেকে দূরে অবস্থান করে। এই গতিময় অবস্থায় থাকায় সমুদ্রের ঢেউএর মত একের পর এক সুখ দুঃখ, হাসি কান্না, জরা ব্যাধি, জন্ম মৃত্যু ইত্যাদির ফেরে পড়ে দুলতে থাকে। কিছুতেই আর স্থিরত্বের হদিস পায় না। তখন জীব এই সমস্ত দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য ঈশ্বরের শরণাগত হয় এবং কি উপায়ে ঈশ্বর লাভ করা যায় তার সাধনপথের অন্বেষণ করে। এই অবস্থায় অন্বেষণ করতে করতে সৌভাগ্যবশতঃ জীব যদি সদ্‌গুরুর নিকট উপস্থিত হতে পারে তখন সদ্‌গুরু বলে দেন কোন্ কর্মের দ্বারা প্রাণের এই অনন্ত চঞ্চলতাকে থামিয়ে স্থির হওয়া যায়, বিশ্রাম পাওয়া যায়। সেই কর্মটিই হোলো অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম বা ব্রহ্মবিদ্যা। আবার এই কর্ম পেয়েও জীব যদি অবহেলা না করে দৃঢ়তার সঙ্গে, জাগতিক দিককে কিছুটা উপেক্ষা করে শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে করতে থাকে তাহলে জীব তার দীর্ঘ চঞ্চলতাকে কাটিয়ে স্থিরে পৌঁছতে সক্ষম হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই জন্যই এটা বিজ্ঞানসম্মত সাধন। ভগবানকে পাব, পেলে আমার ভাল হবে, মঙ্গল হবে এসব আশা নিরাশা ত্যাগ করে সকলেরই এই প্রাণকর্ম করা উচিত। তাহলেই জীব ক্রমে ক্রমে স্থিরত্ব অভিমুখে, যা তার স্বরূপ সেখানে যাবে এবং সত্যিকারের স্থায়ী বিশ্রাম পাবে, পূর্ণতা পাবে। একথাই যোগিরাজ বলতে চেয়েছেন। এটাই তাঁর শিক্ষা, আদর্শ, যা নিজের জীবনে করে, উপলব্ধি করে তবেই জগদ্বাসীকে

দিয়েছেন। এরজন্য তাঁকে বাহ্যভাবে কোনো কিছুই ত্যাগ করতে হয়নি, কাউকে কিছু বাহ্যভাবে ত্যাগ করতেও বলেননি। কারণ তিনি বলতেন—বাহ্যত্যাগ ত্যাগই নয়। পরন্তু এই প্রাণকর্ম করতে থাকলে সত্যকারের ত্যাগ অবস্থা আপনা হতেই আসবে। অতএব কোনোদিকে না তাকিয়ে এই প্রাণকর্ম করতে থাক, তা হলেই—'তোর হবে ভাল, শেষে তুই স্থির ঘরে চলে যা।'

"ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা এই
একটি কথা বলিলেই সব বলা হইল" ॥ ৩০ ॥

যোগিরাজের উপরোক্ত কথাটি বুঝতে হলে প্রথমে জানতে হবে ক্রিয়া কাকে বলে এবং ক্রিয়ার পরাবস্থা কি? ক্রিয়া অর্থে কর্ম। ক্রিয়ার পরাবস্থা অর্থে কর্মের অতীতাবস্থা, যখন আর কোনোপ্রকার কর্ম থাকে না, এমনকি প্রাণের স্পন্দন পর্যন্ত নেই; কারণ প্রাণের স্পন্দনও প্রাণের কর্ম, সেই কর্মও যখন থাকে না, কেবল ত্রিগুণাতীত মহাশূন্যই বর্তমান, কর্মের লেশমাত্র নেই, সেই অবস্থাই ক্রিয়ার পরাবস্থা। কিন্তু ক্রিয়া ব্যতীত এই প্রকার পরাবস্থা লাভ কখনই সম্ভব নয়। অপরদিকে কর্মই জগৎ। এই বিশ্বসংসার সবই প্রাণের স্পন্দন বা কর্মদ্বারাই যুগপৎ উৎপত্তি ও স্থিতি। এককথায় প্রাণের স্পন্দন ব্যতীত কিছু নেই, থাকাও সম্ভব নয়। সবই প্রাণের স্পন্দনের প্রকাশ অর্থাৎ সবই প্রাণের কর্মের প্রকাশ। তাহলে বোঝা গেল যে এই বিশ্বসংসার সহ যা কিছু জানা যায়, বোঝা যায়, সুখ দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ সবই প্রাণের কর্মময় অবস্থা। কিন্তু যেখানে প্রাণের কর্ম নেই, স্পন্দন নেই সেখানে কেবল স্থির মহাশূন্য। এই মহাশূন্যই ব্রহ্ম। অতএব যা ক্রিয়ার পরাবস্থা তাই ব্রহ্ম তাই আমি। অতএব জীবের বর্তমান অস্তিত্বই হোলো প্রাণের স্পন্দন বা কর্ম। তাই কর্মকে বাদ দিয়ে অর্থাৎ ক্রিয়া ব্যতীত সেই স্থিরাবস্থায় পৌঁছানো সম্ভব নয়। সবই যখন কর্মময় তখন এই দেহও কর্মময় কিন্তু ব্রহ্ম কর্মাতীত। অপরদিকে জাগতিক নিয়ম অনুসারে বিনাকর্মে যখন কিছুই পাওয়া সম্ভব নয় তখন বিনা কর্মে স্থিরত্বকেও পাওয়া সম্ভব নয়। জাগতিক কর্মের দ্বারা জাগতিক বস্তু লাভ হয়, স্থিরত্ব লাভ সম্ভব নয়; তেমনি প্রাণকর্মের দ্বারা প্রাণের স্থিরত্বলাভ হয়। এই প্রাণকর্মই হোলো 'ক্রিয়া' তাই যোগিরাজের মতে প্রাণকর্ম যা করলে প্রাণের স্থিরত্বলাভ হয় তাই কর্ম বা ক্রিয়া, এছাড়া আর সবই অর্থাৎ এই প্রাণকর্ম বা ক্রিয়া ব্যতীত আর সবই অকর্ম বা অক্রিয়া। এই উদ্দেশ্যেই যোগিরাজ বলেছেন—"অকর্ম যো সোই মেরা কর্ম হয়।"

অকর্ম অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যে কর্মকে জানে না সেই প্রাণকর্মই যোগীর কাছে একমাত্র কর্ম এবং সাধারণ মানুষ জাগতিক যে সব কর্মকে কর্ম বলে জানে ও করে থাকে সে সবই যোগীর কাছে অকর্ম। কি করলে সুখে থাকব, আনন্দে থাকব, ভালো থাকব, দীর্ঘদিন বাঁচব, নাম যশ প্রতিপত্তি হবে এই সব কর্মকেই সাধারণ মানুষ কর্ম বলে জানে ও করে থাকে। এগুলিই সাধারণ মানুষের প্রধান কর্ম। কিন্তু যোগীরা এসব কর্মের প্রাধান্য দেন না যদিও লোকচক্ষে এসব কর্মও তাঁরা করেন বটে। আবার অকর্ম অর্থে কর্মহীন বা কর্মের অতীতাবস্থাকেও বোঝায় যাকে ক্রিয়ার পরাবস্থা বলে। প্রাণকর্মরূপ কর্ম করতে করতে সমস্ত প্রকার দ্বন্দ্ব, আশা নিরাশার উর্ধ্বে, ভাল মন্দের উর্ধ্বে, সুখ দুঃখের উর্ধ্বে, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ইত্যাদি সহ সকল প্রকার কর্মের অতীতে মহাশূন্যে যোগী যখন অবস্থান করেন, সেই অবস্থাকেও অকর্মরূপ অবস্থা বলা হয়। তাই যোগিরাজ বলছেন সেই অকর্মরূপ অবস্থায় থাকাই এখন আমার একমাত্র কাজ। অর্থাৎ জাগতিক কর্ম ত বটেই এমনকি প্রাণকর্মও যখন নেই, সবকিছু থেমে গেছে, আমি তুমি ভক্ত ভগবান্‌রূপ দ্বৈতাবস্থাও যখন নেই এমন যে মহাস্থির অবস্থা সেই ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাকাই এখন আমার একমাত্র কাজ। কারণ এই অবস্থাটাই সত্য, আর এর পূর্বে প্রাণের যে চঞ্চল অবস্থা তা অসত্য, কারণ সেই চঞ্চল অবস্থা বিনাশী, পরিবর্তনশীল ও মরীচিকাবৎ। কিন্তু প্রাণের যে স্থিরাবস্থা তা সদা একরূপ ও অপরিবর্তনীয় হওয়ায় সদা সত্য। সেই সত্যে থাকাই যোগীর একমাত্র কাজ।

যোগিরাজ প্রদর্শিত এই ক্রিয়াযোগ যা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত তার পাঁচটি বিভাগ আছে যথা :—তালব্য, প্রাণায়াম, নাভিক্রিয়া, যোনিমুদ্রা ও মহামুদ্রা। এই পাঁচটি বিভাগের সমষ্টি নিয়েই প্রথম ক্রিয়া। এই পাঁচটি ক্রিয়ার পর আরো পাঁচটি ক্রিয়া আছে যেগুলিকে ওঁকার ক্রিয়া বলা হয়। মূলক্রিয়া চারটি। তারমধ্যে প্রথম ক্রিয়া যাতে উপরোক্ত পাঁচটি অঙ্গ বর্তমান সেই প্রথম ক্রিয়াকে বলা হয় অথর্ববেদ। দ্বিতীয় ক্রিয়া থেকে চতুর্থ ক্রিয়া পর্যন্ত সবটাই ওঁকার ক্রিয়ার অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় ক্রিয়াকে যজুর্বেদ, তৃতীয় ক্রিয়াকে বলা হয় সামবেদ এবং চতুর্থ ক্রিয়াকে বলা হয় ঋগ্‌বেদ। এই ওঁকার ক্রিয়ার অধ্যায়ের তৃতীয় ক্রিয়াকে যোগিরাজ বলতেন 'ঠোকর ক্রিয়া' এবং চতুর্থ ক্রিয়াকে বলতেন 'বায়ুস্থিরের ক্রিয়া'। যদিও দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ ক্রিয়া পর্যন্ত ওঁকার ক্রিয়ার এই অধ্যায়কে স্থির বায়ুর ক্রিয়াও বলা হয়। চার বেদকে অবলম্বন করে এই যে চারটি ক্রিয়া যোগিরাজ তাঁর জীবদ্দশাতেই ভক্তদের সুবিধার্থে ভেঙ্গে ছয়টি ক্রিয়ায় রূপান্তর করেছিলেন। ক্রিয়াবানগণ ক্রিয়ায় যেমন যেমন উন্নতিসাধন করেন তাঁরা তেমনি পরবর্তী ক্রিয়া পেয়ে থাকেন। প্রথম ক্রিয়ায়

দ্বারায় জিহ্বাগ্রন্থি ভেদ হয় ও প্রাণায়ামের দ্বারা কেমন করে বায়ু স্থির করতে হয় তার উপায় নিরূপণ। দ্বিতীয় ক্রিয়ার দ্বারা বায়ুকে একেবারে স্থিরাবস্থায় পৌঁছে তৃতীয় অর্থাৎ ঠোকর ক্রিয়ার মাধ্যমে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করতে হয়। এরপর বায়ুর সম্পূর্ণ স্থিরাবস্থায় চতুর্থ ক্রিয়ার মাধ্যমে মূলাধার গ্রন্থি ভেদ করে যোগী আজ্ঞাচক্রে মহাস্থিরে নিজেকে মিলিয়ে দেন। তাই এই চতুর্থ ক্রিয়াকে বলা হয় স্থিরবায়ুর ক্রিয়া। এর পূর্বে তৃতীয় ক্রিয়ার মাধ্যমে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হলে যোগী ক্রিয়ার রহস্য সম্পূর্ণরূপে জানতে পারেন। এই অবস্থাপন্ন যোগীকেই জ্ঞানী বলা হয়। কিন্তু যোগী যখন পরবর্তী ক্রিয়ার মাধ্যমে স্থিরত্বের সঙ্গে লয় হয়ে যান তখন তিনি জ্ঞানীও নন অজ্ঞানীও নন। তখন তিনি জ্ঞান অজ্ঞানরূপ দ্বৈতের অতীতে মহাস্থিরে লয় হয়ে যান। এমন অবস্থাপন্ন যোগী খুবই বিরল। মূল এই আত্মক্রিয়াকে চার ভাগে ভাগ করেছিলেন বলেই ব্যাসদেবকে বেদ বিভাগ কর্তা বলা হয়। অর্থাৎ ব্যাসদেবই চারটি ক্রিয়ার প্রচলন করেছিলেন। কিন্তু কালপ্রভাবে মানুষের দৈহিক, মানসিক সব ক্ষমতাই কমতে থাকে, তাই যোগিরাজ বর্তমানকালের মানুষের উপযোগী করে সেই ব্যাসদেব কর্তৃক প্রবর্তিত চার ক্রিয়াকে ছয় ক্রিয়ায় চালু করেন। অর্থাৎ এই ছয় ক্রিয়ার মধ্যে সেই চার ক্রিয়াই বর্তমান, যাকে চার বেদ বলে। তাই যোগিরাজ বলতে সমর্থ হয়েছিলেন—"আমি যা বলছি তাই বেদ, নিশ্চয় জেনো।" এই হোলো ক্রিয়াযোগের মোটামুটি বিজ্ঞান ও রহস্য যা সম্পূর্ণ সদ্‌গুরুর নিকট শিক্ষালাভ করতে হয়। কখনোই বই পড়ে এই ক্রিয়াযোগকে করা উচিত নয়। তাই যোগিরাজ বলছেন তোমার কোনো শাস্ত্র পড়ার দরকার নেই, দুনিয়ায় কি হচ্ছে না হচ্ছে কোনো দিকে দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজন নেই, এ সংসারে কি পেলে না পেলে তাও দেখার দরকার নেই, কেবল ক্রিয়া কর এবং সমস্ত প্রকার কর্মের অতীতে পৌঁছে অবস্থান কর। এই একটি উপদেশ দিলেই সব দেওয়া হোলো।

"গুড়ের ময়লা টানতে টানতে সাদা হয়, তেমনি
প্রাণায়াম করতে করতে নির্ম্মল হয়" ॥ ৩১ ॥

অতীত অতীত কর্মফলের সমষ্টিই এই দেহ। যতক্ষণ দেহ অর্থাৎ দেহবোধ আছে ততক্ষণ কর্মও আছে। জাগতিক সমস্ত কর্ম ত্যাগ করলেও শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ কর্ম থাকবেই। এই শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ কর্মই জীবের জীবন। অতএব শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ কর্ম যতক্ষণ আছে ততক্ষণ দেহবোধও আছে, মন ইচ্ছা সবই আছে। আবার মন ইচ্ছা থাকায় জাগতিক

কর্মও আছে। তাই কর্মই জীবের বর্তমান ধর্ম। অপরদিকে কর্মের ধর্মই হোলো ফল উৎপাদন করা। ভাল কর্মের ভাল ফল, মন্দ কর্মের মন্দ ফল। কর্মফলকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। কিছু কর্ম তার ফল দেয় তখনই, যেমন আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে, খাদ্য খেলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় ইত্যাদি। আবার কিছু কর্মের ফল সুদূর প্রসারিত যেমন অপরের দ্রব্য চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদি। যেসব কুকর্ম অনেক পরে ফল উৎপাদন করে সেগুলিকেই সাধারণতঃ পাপ বলা হয়। আবার যে সব সৎকর্ম যেমন পরোপকার করা, জীবে দয়া করা এগুলিও ফল দেরীতে উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু এগুলিকে পুণ্য কর্ম বলা হয়। এই পাপ কর্ম এবং পুণ্য কর্ম উভয় কর্মই কিন্তু ফল উৎপাদন করে। এ জাতীয় কর্মগুলি কখনই নিষ্কাম কর্ম হতে পারে না। তাই দেখা যায় মানুষ কখনো জাগতিক দিকে সুখে থাকে, কখনো দুঃখ ভোগ করে। অতীত কর্মের ফলগুলি যখন যেভাবে তার সামনে উপস্থিত হয় তখন জীব সেই অবস্থায় থাকতে বাধ্য হয়। আবার জীব এইসব অবস্থা গুলির মধ্যে থাকার দরুন পুনরায় নূতন নূতন কর্ম করে এবং পরবর্তীকালে সেইসব কর্মের ফলভোগ করে। তাই জীব সদা কর্মে রত থাকায় তার আর আশা যাওয়ারূপ প্রবাহ ঘোচে না। কারণ সঠিক কর্ম, যে কর্ম করলে আর ফল উৎপাদন হয় না সেই প্রাণকর্মের কথা জীব জানে না। না জানার দরুন অন্য কর্ম করতেই থাকে, কারণ প্রকৃতির বশে কর্ম না করে কারো উপায় নেই। ফলে কর্মের ফলভাগী হওয়ায় বন্ধন ঘোচে না। সুকর্মের ফল বন্ধন, কুকর্মের ফলও বন্ধন। এই উভয় কর্মের ফেরে পড়ে জীবের যত বন্ধন দশা। জীব যদি কোন প্রকারে সেই কর্মের হদিস পায় যে কর্ম ফল উৎপাদন করে না, যে কর্মের সঙ্গে ইচ্ছা অনিচ্ছা, সঙ্কল্প বিকল্প থাকে না, যা আপনা আপনি জন্মের থেকে শুরু হয় সেই নিষ্কাম প্রাণকর্ম করতে থাকে তাহলে জীব অচিরে কর্মের অতীতে পৌঁছতে সক্ষম হয়। যখন জীব এই প্রকারে কর্মের অতীতে পৌঁছে স্থিরমহাশূন্যরূপী ব্রহ্মে অবস্থান করে তখন তার কাছে কর্মফলের সঞ্চিত ঘরও শূন্য হয়ে যায় অর্থাৎ সুকর্ম কুকর্ম, পাপ পুণ্য উভয়বিধ কর্মফলের ঘর শূন্য হয়ে যায়। এইপ্রকার অবস্থাপন্ন যোগী জাগতিক ভাবে যদিও কোনো কর্ম করেন তবে তা সঙ্গে ইচ্ছা অনিচ্ছা, সঙ্কল্প বিকল্প জড়িত না থাকায় সে সব কর্ম আর ফল উৎপাদন করতে পারে না। তখন তার কামনা বাসনার ঘর শূন্য হওয়ায় বন্ধন মুক্ত হন। তাই যোগিরাজ বলছেন—"দুধ খির খায় সকলে চাঁচি ছেলেমানুষ অর্থাৎ সাধকেই খায়।" অর্থাৎ সাধারণ মানুষ ভাল-মন্দ উভয় দিক্ নিয়ে ব্যস্ত কারণ তারা চঞ্চলতার স্রোতে ভাসে। কিন্তু যোগীরা, যাঁদের সাধারণ মানুষ ছেলেমানুষ-অর্থাৎ বোকা বলে মনে করে প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁরাই কিন্তু ভালমন্দর অতীতে পৌঁছে চাঁচি খান অর্থাৎ স্থিরব্রহ্মে

সংযুক্ত থাকেন। তাই যোগীদের সাধারণ কর্মে অনীহা থাকায় তাঁরা মূঢ়বৎ অবস্থান করেন। এই অবস্থার কথা বলতে গিয়ে যোগিরাজ বলছেন যে যখন গুড় তৈরী করা হয় তখন গুড়ের পাত্রের গায়ে গুড়ের ময়লা টানতে টানতে গুড়ের যে লাল রঙ তা কেটে গিয়ে সাদা হয় অর্থাৎ পরিষ্কার ভাল গুড় হয়। তেমনি অন্তর্মুখী প্রাণায়াম করতে থাকলে শরীর মন নির্মল হয় অর্থাৎ ময়লাশূন্য হয়। অতীত অতীত কর্ম-ফলের সমষ্টিই হোলো ময়লা। সেই ময়লার সমষ্টি যখন দূরীভূত হয় তখন আর কর্মফল থাকে না। দীর্ঘসময় উত্তমপ্রকারে অন্তর্মুখীভাবে প্রাণায়াম করতে থাকলে আপনা হতেই বায়ুস্থির হওয়ায় মহাশূন্যে স্থিতি হয়। অবলম্বনহীন সেই মহাশূন্যে তরঙ্গাতীত অবস্থায় কর্ম থাকা সম্ভব নয়। যে অবস্থায় শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি এমনকি হৃদস্পন্দন পর্যন্ত থাকে না, যখন কামনা বাসনা, ইচ্ছা অনিচ্ছা, সঙ্কল্প বিকল্প কিছুই নেই তখন কর্ম করে কে? সে অবস্থায় কর্মের ফলই বা কোথায়? এই অবস্থাকেই যোগিরাজ বলছেন নির্মল অবস্থা, কারণ তখন কর্মফল না থাকায়, কোনোপ্রকার তরঙ্গ এমনকি প্রাণের স্পন্দনরূপ কর্মও না থাকায় নির্মল।

"তোমাদের কূটস্থের মধ্যেই যখন আমি সর্বদা আছি, তখন এই হাড়মাংসের দেহটাকে দেখতে আসার কোন প্রয়োজন।" ॥ ৩২ ॥

এই দুই চোখের দ্বারায় জাগতিক সব কিছু দেখা যায়, স্থূল বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু অধ্যাত্মজগৎকে দেখতে ও জানতে গেলে কূটস্থরূপী চক্ষু ব্যতীত উপায় নেই। প্রকৃতপক্ষে এই দুই চোখ নিজে দেখে না, কারণ তার দেখবার সামর্থ নেই। চোখের মাধ্যমে মনই দেখে। আবার মনের মাধ্যমে বুদ্ধি দেখে, বুদ্ধির মাধ্যমে প্রাণ দেখে, প্রাণের মাধ্যমে আত্মা দেখে। অতএব আত্মাই প্রাণ বুদ্ধি মন চক্ষু ইত্যাদির মাধ্যমে এই জগৎ সংসারকে দেখে থাকেন। আবার সেই আত্মাই যদি এই দিকটাকে পরিত্যাগ করে কূটস্থের মাধ্যমে দেখেন তখনই অধ্যাত্ম জগৎকে জানা যায়। তাহলে বোঝা গেল যে দ্রষ্টা স্বয়ং আত্মা কিন্তু তিনি যখন যে মাধ্যমে দেখেন তখন তাই প্রকাশিত হয় অর্থাৎ একই আত্মা দ্রষ্টা এবং দৃশ্যরূপে বিরাজিত। জীবের বর্তমান গতিই হোলো নিম্নাভিমুখী, যেমন জল। এটাই স্থূলত্বের গুণ। এই স্থূলত্বের গুণে থাকায় অর্থাৎ জীব চঞ্চলতার স্রোতে দোদুল্যমান থাকায় প্রতিটি জীবের গতি চঞ্চলতার গুণে আকৃষ্ট হয় এবং তার দৃষ্টি স্থূলের দিকে থাকে। কিন্তু পরিশোধিত মানুষ চেষ্টা করেন তাঁর এই দৃষ্টি ও গতিকে এই দুই চক্ষুকেন্দ্রিক না করে কূটস্থ-

কেন্দ্রিক করা। এই প্রকারে কূটস্থকেন্দ্রিক করতে করতে স্বয়ংই কূটস্থ হয়ে যান। তখন তিনি শূন্যে অবস্থান করায় নিজেই শূন্য হন। অতএব কূটস্থই সাধনার মূল পীঠভূমি ; এই পীঠভূমিতে যিনি সর্বদা স্থায়ীভাবে থাকেন যাঁকে আর সেখান থেকে বিচ্যুত হতে হয় না, তিনি তখন নিজেই কূটস্থ হন, যেমন কাঁচপোকা। একারণেই তাঁর জীবদ্দশায় যে সব ভক্তরা দূরে থাকতেন, তাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি প্রায় সকলকেই বলতেন—"দেখা করার জন্য এত ব্যস্ত কেন ? আমার এই হাড়-মাস দেখিয়া লাভ কি ? কূটস্থে লক্ষ্য রাখুন, তাহাই আমার রূপ, আমি হাড়-মাস বা 'আমি' এই শব্দও আমি নহি, আমি সকলের দাস।" আবার কাউকে লিখেছেন—"গুরু সব চালাইতেছেন। আমি কূটস্থরূপে সর্বদা সঙ্গে আছি। মায়া কর্তৃক হাড় মাস দেখা যাইতেছে, তাহা যত শীঘ্র যায় অর্থাৎ মায়ার বিষয় যত শীঘ্র যায় ততই ভাল। ভাল মন্দ তথায় নাই। আমার বলিতে যাহা কিছু আছে তাহা গুরুকে অর্পণ করা চাই। অর্পণ হইলে তাহাতে আর স্বত্ব থাকে না। যখন দেহ অর্পণ করেছেন তখন নিজের দেহ দেখলেই ত আমাকেই স্থূলেতে দেখা হয়। এইরূপ ভাবে আমার দেহ সব। শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত ক্রিয়া করুন।"

জীব প্রাণের এই চঞ্চলদিকে থাকায় বুদ্ধি, মন এবং চক্ষুর মাধ্যমে তার সামনে যা কিছু প্রতিভাসিত হয় তা সবই মায়া। তাই যোগিরাজ বলছেন—"মায়া কর্তৃক হাড়মাস দেখা যাইতেছে, তাহা যত শীঘ্র যায় অর্থাৎ মায়ার বিষয় যত শীঘ্র যায় ততই ভাল। ভাল মন্দ তথায় নাই।" তাহলে এটা বোঝা গেল যে প্রাণের এই চঞ্চল দিকটাই যেহেতু জীবের বর্তমান অস্তিত্ব অতএব এই দেহ হাড়মাস সবই ওই মায়া অর্থাৎ প্রাণের চঞ্চল অবস্থা দ্বারা রচিত। তাই প্রাণের এই চঞ্চল দিকটা যত শীঘ্র থেমে যায় ততই ভাল অর্থাৎ প্রাণকর্ম করতে করতে প্রাণের চঞ্চলতার যতই নিবৃত্তি হবে এবং স্থিরত্বের দিকে অগ্রসর হবে তখন চঞ্চলতার দ্বারা রচিত যে মায়া তা আর থাকবে না। তখন আপনা হতেই জগৎবোধ, আমিবোধ, মায়া ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। আর এই মায়া না থাকায় অর্থাৎ চঞ্চলতার অবসানে দেহ থাকা সত্ত্বেও দেহবোধ থাকবে না। কারণ চঞ্চলতা বা মায়া কর্তৃক এই যে হাড়মাস রচিত হয়েছে এবং যে দেহবোধ জেগেছে তা থাকবে না। এই প্রকার মায়া বা চঞ্চলতার অবসানে যখন আর কোন কিছুই থাকে না, সবই শূন্যময় হওয়ায় ভাল মন্দ উভয়েই থাকতে পারে না। আমার বলতে যাহা কিছু আছে অর্থাৎ এই প্রকারে চঞ্চলতা দ্বারা রচিত দেহ মন ও আমি ভাব সহ যা কিছু আছে সবই গুরুকে অর্থাৎ স্থির আত্মাকে অর্পণ করতে হবে। আত্মসাধন করতে করতে যখন সম্পূর্ণরূপে চঞ্চলতার অবসান হবে, যখন সব কিছু স্থির হয়ে যাবে সেই অবস্থাই হোলো অর্পণ।

এই প্রকার অর্পণ হলে আর সত্তা থাকে না। অর্থাৎ আমিহারা অবস্থায় আমার বলতে কিছু থাকে না। তাই যোগিরাজ বলছেন যিনি এই প্রকারে সবকিছু অর্পণ করতে পেরেছেন অর্থাৎ প্রাণকর্মের দ্বারা যিনি প্রাণের সম্পূর্ণরূপে গতিরুদ্ধাবস্থা লাভ করেছেন তিনি সর্বত্র সেই একেরই মহিমা জানতে পেরেছেন। এই প্রকার অবস্থাপন্ন যোগী নিজের দেহ এবং গুরুর দেহকে আলাদা দেখেন না। কারণ তাঁর কাছে মায়া অর্থাৎ চঞ্চলতা তিরোহিত হওয়ায় দেহ ও আমি আমার ভাবের অতীতে থাকায় সবই আমার দেহ বা সবই আমি এইরূপ অনুভব হয়। এই অবস্থা যাতে সকলে লাভ করতে পারে অর্থাৎ চঞ্চলতার অবসান ঘটিয়ে, মায়া-মোহের অতীতে স্থির ব্রহ্মে কেমন করে যুক্ত থাকা যায় তার উপায় নির্ধারণ করে সকলকে বললেন— শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত ক্রিয়া করুন। এই ক্রিয়াই যে ভবসাগর পাড়ি দেবার তরণী এবং এটাই যে একমাত্র উপায় তা তিনি পরিষ্কার করে বললেন। তিনি আরো বললেন এই ক্রিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে কর, এই দুনিয়ায় কত কি হচ্ছে তার দিকে তাকিও না, সুখ পেলাম কি দুঃখ পেলাম সব কিছু ভুলে গিয়ে এই ক্রিয়াস্বরূপ নৌকার ওপর আরোহণ কর তা হলেই সব পাবে। তাই তিনি ভক্তদের বলতেন— গুরু দর্শনের জন্য অর্থাৎ গুরুর এই দেহটাকে দর্শন করার জন্য এত ব্যস্ত হয়ো না। কারণ গুরুর দেহটা গুরু নয়, এটা বিনাশী। এই দেহের ভেতরে কূটস্থরূপী গুরু সদাই আছেন এবং তা সব দেহেই আছেন। অতএব আমি স্বয়ংই যখন কূটস্থ তখন কূটস্থকে দেখলেই আমাকে দেখা হয়। আমিই কূটস্থরূপে তাই সর্বদা সকলের সঙ্গে আছি। যদি কেউ সাধনার পীঠভূমি ওই কূটস্থে যখনই স্থায়ী স্থিতিলাভ করবে আমার দর্শন নিশ্চয় পাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি এই কূটস্থরূপে সকলের দেহে অবস্থান করে সকলের সেবা করি, সকলকে আমিময় অর্থাৎ কূটস্থময় করে নেবার চেষ্টা করি, এই প্রকারে আমি সকলকে আমার দিকে অর্থাৎ কূটস্থের দিকে আকর্ষিত করি, এই ভাবে আমি সকলের মঙ্গল করি তাই আমি সকলের দাস।

"যোগী হইতে গিয়া এত দুর্ব্বল হৃদয় কেন ? গাছতলা ত কেহ লয় নাই, নদীর জল ত কেহ লইবে না। অনিত্য বিষয়ের জন্য এত ভাবনা কেন ? আপনার কর্ত্তব্য ভবিষ্যৎ ও অতীতের ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া প্রাণের চিন্তার সহিত বর্ত্তমানের সমস্ত কার্য্য করা।" ॥ ৩৩ ॥

যোগী হলেন শ্রেষ্ঠ বীর। যোগীর থেকে শ্রেষ্ঠ বীর পৃথিবীতে কেউ নেই। এ জগতে যোগী ব্যতীত যাঁরা শ্রেষ্ঠ বীররূপে খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁরা বাইরের শত্রুকে পরাজিত করেছেন কিন্তু নিজের ভেতরে যে শত্রু তাদের পরাজিত করতে পারেননি। কিন্তু যোগী নিজের ভেতরের শত্রুদের পরাজিত করেন। প্রবৃত্তি-পক্ষরূপী ভেতরের এই শত্রুগণই প্রকৃত শত্রু এবং সবচেয়ে বড় শত্রু। বাইরের শত্রুদের যদি পরাজিত করতে নাও পারা যায় তাতেও ক্ষতি হয় না, তাদের থেকে দূরে অবস্থান করলেই হোলো। কিন্তু প্রবৃত্তিপক্ষরূপী যারা ভেতরের শত্রু তারা সব সময়েই আমার সঙ্গে আছে, যেখানেই আমি থাকি না কেন। এই শত্রুগণই মানুষকে জগতের দিকে আকৃষ্ট করে, সুকর্ম কুকর্মের দিকে নিয়োজিত করে, আমি আমাররূপ অহংবোধ জাগিয়ে তোলে, সুখ দুঃখ বোধে ভাবিয়ে তোলে ইত্যাদি নানাপ্রকারে বাধা দেয় যাতে নিবৃত্তিপক্ষের দিকে না যেতে পারে। প্রাণের চঞ্চলগতি হতেই এদের উৎপত্তি এবং যেহেতু জীব চঞ্চল অবস্থায় অবস্থিত সেহেতু প্রবৃত্তিপক্ষের আকর্ষণ বা টান অধিক থাকে। তাই জীব জগতের মোহে মোহিত হয়। প্রবৃত্তিপক্ষের টান বা আকর্ষণ অধিক থাকায় স্বভাবতই নিবৃত্তিপক্ষের আকর্ষণ বা টান কম হয়। একারণেই যোগী বা সাধক অপেক্ষা পার্থিব আকর্ষণের মানুষ অধিক দেখা যায়। তাই বেশির-ভাগ মানুষেরই কি করলে সুখে থাকব, ভাল থাকব, যশ প্রতিপত্তি হবে এই নিয়েই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ যাদের নিবৃত্তিপক্ষের টান বা আকর্ষণ আসে তাঁরাই আত্মসাধনায় রত হন এবং ক্রমে আত্মসাধনা করে প্রবৃত্তিপক্ষের টানকে সম্পূর্ণ-রূপে পরাজিত করে, দমিয়ে রেখে নিবৃত্তিপক্ষে আত্মরাজ্যে স্থায়ী স্থিতিলাভ করেন। এদেরই বলা হয় যোগী এবং এইপ্রকার যারা যোগী তাদের যাতে দুর্বলতা আক্রমণ করতে না পারে, তারা যাতে আরো অধিক বলশালী হয়ে যোগকর্মে অর্থাৎ প্রাণকর্মে রত হতে পারে, তাদের উদ্দেশ্যেই যোগিরাজ বলছেন—যোগী হতে গিয়ে মনকে কখনও দুর্বল কোরো না। দুর্বলতাই পাপ, দুর্বলতাই মৃত্যু ; দুর্বলতাকে সর্বপ্রকারে পরিত্যাগ কর। এই হৃদয়দৌর্বল্য যে পরম ক্ষতিকারক এবং যোগীকে অগ্রসর হতে দেয় না সেকথা বলতে গিয়ে শ্রীভগবান্‌ও অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে সকল মানবকে বললেন—

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং তক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥—গীতা ২/৩

হে পার্থ, কাতরতা প্রাপ্ত হোয়ো না। এটা তোমার যোগ্য কথা নয়। হে পরমতপ, ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য সবপ্রকারে পরিত্যাগ করে উত্থিত হও এবং "তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়"—সাধন সমররূপ যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হয়ে রত হও অর্থাৎ প্রাণকর্ম করতে থাক তাহলে তুমি নিশ্চয়ই ঊর্ধ্বে আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ করতে পারবে।

রজগুণ প্রধান যিনি তিনিই ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের কাজ হোলো যুদ্ধ করা। শত্রুদের সহিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দের সহিত যুদ্ধ করে সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট হতে চেষ্টা করা। এই ইন্দ্রিয়গণই সাধনপথে প্রধান শত্রু। তারাই জীবকে বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করে রাখে এবং জীব সেইসকল ইন্দ্রিয়দের ভোগকে নিজের ভোগ বলে মনে করে। এইপ্রকার মানুষই মনোবলের অভাবেই ঝরাপাতার মত এদিকওদিক ছুটে বেড়ায়। কখনও তার বিষয় ভালো লাগে, আবার কখনও ভগবানকে পেতে ইচ্ছে করে। ক্রিয়াবানগণ যখন ক্রিয়া শুরু করেন তখন তাঁরা সকলেই ক্ষত্রিয় অর্থাৎ রজগুণপ্রধান। তাই ক্রিয়াবানগণের প্রাণকর্মরূপ সাধনসমরে কাতরতা বা দুর্বলতা শোভা পায় না। তাই হে ক্রিয়াবানগণ তোমরা কখনও হৃদয়দৌর্বল্যের শিকার হয়ো না। তোমরা তুচ্ছ হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ কর অর্থাৎ শ্বাস ঢিলা হওয়ায়, শ্বাসের গতি বহির্মুখী হওয়ায় হৃদয়ের যে দুর্বলতা হয়েছে তা ত্যাগ করে ঊর্ধ্বে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে কূটস্থে স্থিতিলাভ করবার জন্য সর্বপ্রকারে সচেষ্ট হও অর্থাৎ প্রাণকর্মরূপ সাধনসমরে লিপ্ত হও, তাহলেই কূটস্থে স্থিতিলাভ করতে পারবে। তাই ভগবান্ নিশ্চিত করে বলছেন যুদ্ধার্থে কৃতনিশ্চয় হয়ে ওঠো এবং প্রাণকর্মরূপ সাধনসমর করতে থাক। এই সাধন করতে গিয়ে অনিত্য বিষয়ের জন্য কোনো কিছু ভেবো না। হয়ত তুমি ভাবছ আমার ক্ষতি হবে, সংসারের ক্ষতি হবে, সুখ পাবো না এসব নানাপ্রকার অনিত্য ভাবনা ত্যাগ কর। এমনকি ভবিষ্যৎ ও অতীতের সমস্ত ভাবনা পরিত্যাগ করে প্রাণের চিন্তার সহিত বর্তমানের সমস্ত কাজ করতে থাক। অর্থাৎ এই প্রাণকর্মরূপ সাধন শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত করতে থাক এবং কূটস্থে মনটি রেখে অর্থাৎ প্রাণের চিন্তার সহিত তোমার সামনে যে কাজটি উপস্থিত হচ্ছে কেবল সেটাই কর। অর্থাৎ সঙ্কল্প বিকল্প রহিত হয়ে, চিন্তাশূন্য অবস্থায় বর্তমানের যা কাজ, যে কাজ তোমার সামনে উপস্থিত কেবল সেটুকুই করো। অধিক কর্মের নেশায় কখনও নিজেকে জড়িয়ে ফেলো না কারণ এ জগতের সব কিছুই দেখতে সুন্দর কিন্তু পরিণামে বিষবৎ। এই সাধন করতে গিয়ে যদিও তোমাকে বাহ্যভাবে কিছুই ত্যাগ করতে হবে না, স্ত্রী পুত্র সংসার

সবই তোমার বজায় থাকবে, তবুও যদি অহেতুক ভয়ে ভীত হও তাই বলছি গাছতলা এবং নদীর জল ত আছে। প্রকৃতির এই দুটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ প্রকৃতিজাত এই দেহকে বজায় রেখে এই সাধন করতে থাক। হে প্রিয় মানুষ আমি তোমাদের সত্যই ভালবাসি, আর ভালবাসি বলেই তোমাদের দুঃখে কাতর হই। কিভাবে তোমরা তোমাদের উৎসস্বরূপ স্থির অভিমুখে সহজে পৌঁছে যেতে পারো তার জন্য আমি সদা ব্যস্ত। তাই আমি যুগে যুগে বারবার তোমাদের কাছে আসি আর তোমাদের সেই পথের হদিস দিয়ে যাই।

"অর্থে সুখ কাহারও হয় নাই, হইবেও না। মনের করকরানিতে অর্থের চেষ্টা। এত ভবিষ্যতের ভাবনা কেন?" ॥ ৩৪ ॥

সারা দুনিয়ার মানুষ অর্থের পিছনে ছুটে বেড়ায়। অধিক অর্থ লাভকেই সুখ বা মোক্ষ বলে মনে করে। আবার অধিক অর্থ হলেই যশ, যশ হলেই প্রতিপত্তি, প্রতিপত্তি হলেই ক্ষমতা, ক্ষমতা হলেই লোভ, লোভ হলেই হিংসা উৎপন্ন হয়। এগুলি পরপর অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। অধিক অর্থ লাভ করাটা মনোধর্ম। এই মন ও ইচ্ছা যতক্ষণ বর্তমান ততক্ষণ অধিক অর্থের বাসনাও বর্তমান। কিন্তু যখন মন থাকে না, ইচ্ছাতীত অবস্থা লাভ হয় তখন যদি অর্থের ওপরে নিজেকে বসিয়ে রাখ, আর অর্থের প্রতি আকর্ষণ থাকে না। কিন্তু এই অবস্থা লাভের পূর্বে অর্থলোভ ত্যাগ করা অতীব কঠিন। কেউ যদি সংসার ত্যাগ করে মঠ মিশন বানিয়ে অবস্থান করেন এবং মনে করেন সর্বত্যাগী, তাঁরও ত্যাগ হয়নি কারণ তাঁরও অর্থ প্রয়োজন এবং অর্থের প্রতি লোভ তাঁর সম্পূর্ণ বর্তমান। অতএব অর্থ যশ প্রতিপত্তি ইত্যাদির প্রতি যে লোভ তা ত্যাগ করাটা সম্পূর্ণরূপে প্রাণকর্ম সাপেক্ষ। এই প্রাণকর্ম করতে করতে যতই দেহাভ্যন্তরস্থ উনপঞ্চাশ বায়ু স্থির হতে হতে মুখ্য এক প্রাণবায়ুর দিকে মিলতে সচেষ্ট হবে ততই মন নিরুদ্ধাভিমুখে অগ্রসর হবে। শেষে যখন নিরুদ্ধ হবে তখন কিছুই থাকবে না, মন আর কোনদিকে আকৃষ্ট হবে না। এইটাকেই বলা হয় 'মন্মনা' অর্থাৎ মনেতে মনের অবস্থান। এই অবস্থা লাভের পূর্বে যদি কেউ বলেন যে তাঁর সব কিছু জয় হয়েছে তা বাতুলতা মাত্র। আবার এই প্রকার 'মন্মনা' অবস্থাপন্ন যোগী যিনি, তাঁকে অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে বসিয়ে রাখলেও তাঁর কিছু আসে যায় না। তাঁকেই বলা হয় স্থিতপ্রজ্ঞ।

অর্থের দ্বারা আমরা পার্থিব সুখ অনেক পেতে পারি ঠিকই কিন্তু তা অনিত্য।

এই অনিত্য বিষয়ের দিকে চেয়ে ভবিষ্যতের জন্য এত ভাবনা কেন? যেমন পুতুল নাচের পুতুল, তাকে যেমন নাচায় সে তেমনি নাচে। সেরকম সকলেই চঞ্চল মন ও বুদ্ধির ফেরে পড়ে এই জগতে হায়রে পয়সারে বলে নাচানাচি করছে। তারা ভুলে যায় যে জগৎ পরীক্ষার স্থল। এখানে প্রতিটি পদক্ষেপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হতে স্থির ব্রহ্মাভিমুখে অগ্রসর হতে হবে। এই জগতের কত কিছু পসরার ডালি তোমার সামনে উপস্থিত। তুমি যদি রূপ রস গন্ধময় এই ডালির প্রতি আকৃষ্ট হও, মোহিত হয়ে থাক তবে স্থিরপদ তোমার থেকে অনেক দূরে। কারণ এগুলি সবই চঞ্চলতার প্রকাশ। চঞ্চলতার মোহে আছো বলেই সবকিছু তোমার সামনে উপস্থিত। হে সাধক তুমি কোনটা চাও? যদি তুমি বিজ্ঞ হও তাহলে তোমায় দক্ষ হতে হবে, এই সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে, পসরার ডালির দিক্ থেকে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি ফিরিয়ে নিতে হবে। ফলে তোমার কিছু নেই এইরকম ভেবে অভাববোধ করলে চলবে না। সুদক্ষ মাঝি ঝড় তুফানের মধ্যেও তার নৌকাকে যেমন রক্ষা করতে পারে, তেমনি যে যোগী এই জগৎ সংসাররূপ মহাসমুদ্রের ওপর দক্ষ তিনিও নিজেকে সমস্ত প্রকার প্রলোভনের অতীতে নিয়ে যেতে সমর্থ হন। তিনি সদা প্রাণকর্মরূপ সাধন সমরে রত থাকায় সমস্ত কার্যে দক্ষতা অর্জন করেন এবং কোনো বিষয়ে ভীত হন না। অতএব সকল প্রলোভনের মধ্যে থেকেও দক্ষতার সহিত এমন কাজ করতে হবে অর্থাৎ এমন সুন্দরভাবে প্রাণকর্ম করতে হবে যা তোমাকে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত অবস্থায় নিয়ে যাবে। অতএব কোনোদিকে দৃষ্টি না দিয়ে, বিশেষ দক্ষতার সহিত এই ক্রিয়াসাধন যদি করতে থাক, তবে এই ক্রিয়ারূপী নৌকাই অবিলম্বে তোমাকে ভবসাগর পার করে দেবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই শয়তানরূপী যে মন তার অতীতে আত্মা ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে মন যাতে ধাবিত না হয় সে বিষয়ে অবশ্যই দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এই প্রকারে আত্মকর্মে যিনি সর্বদা রত, তিনি অচিরে নির্বাণ প্রাপ্তি হবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই।

"সকল দিকেই দক্ষ হওয়া চাই, কোন বিষয়েই
অভাব বোধ করা চাহি না।" ॥ ৩৫ ॥

যোগপথ বীরের পথ, তাই যোগী হলেন শ্রেষ্ঠ বীর। সত্যকারের বীরের ধর্ম হোলো জীবনের বিনিময়েও পরাজয় স্বীকার না করা, তেমনি যোগীও কখনও পরাজিত হন না। পুরুষকারই তাঁর প্রধান সম্বল। যোগী কখনও দৈবের ওপর নির্ভরশীল নন।

দৈবের ওপর যারা নির্ভরশীল এবং দৈবকেই যারা প্রাধান্য দিয়ে থাকে তারা দুর্বল। তাই গীতাতে শ্রীভগবান্ বলেছেন—যোগীর কর্মই প্রধান এবং দুর্বলতাকে সর্বপ্রকারে পরিহার কর। এখানে যোগীর কর্মই প্রধান অর্থে প্রাণকর্ম, যাকে নিষ্কাম কর্ম বলা হয়। এই কর্ম করতে থাকলে আপনা হতেই যোগী নিষ্কাম বা অকর্মে উপনীত হন। তাই যোগীর কাছে প্রাণকর্ম ছাড়া অপর সমস্ত কর্মই অকর্ম বা অহেতুক। কিন্তু সত্যকারের যোগী হতে গেলে প্রাণকর্ম যেমন অবশ্য কর্তব্য, তেমনি অন্যান্য জাগতিক এবং জীবনধারনোপযোগী কর্মগুলিও পরিত্যাজ্য নয়। কারণ এইসব কর্মগুলির দ্বারা শরীর সুস্থ থাকে ও বজায় থাকে। যেহেতু সুস্থ সবল শরীর ছাড়া যোগসাধন সম্ভব নয় সেহেতু যোগীকে চেষ্টা করতে হবে যাতে শরীর সুস্থ থাকে ও রক্ষা হয়, কারণ এই শরীরই ধর্মক্ষেত্র এবং কর্মক্ষেত্র। এই শরীর ছাড়া ধর্মকর্ম সম্ভব নয়। অতএব ঈশ্বরসাধন যেমন প্রযোজন এবং তারজন্য প্রাণকর্মও যেমন অবশ্যম্ভাবী, সেই প্রাণকর্মে যোগীকে যেমন দক্ষতা ও পটুতা অর্জন করতে হবে, তেমনি শরীর রক্ষার্থে, সামাজিক প্রাণী হিসাবে সমাজের সকল কর্তব্য রক্ষার্থে জাগতিক সকল কর্মেও যোগীকে দক্ষ ও পটু হতে হবে। যোগীর কাছে সংসার কর্ম সহ কোনো কর্মই অবহেলিত নয়, যদিও যোগী জানেন যে এসব জাগতিক কর্মের মাধ্যমে আত্মলাভ সম্ভব নয়। অবশ্য জাগতিক সকল কর্মে দক্ষতা বা পটুতা তখনই জন্মায় যখন যোগী প্রাণকর্মে দক্ষতা বা পটুতা অর্জন করেন। জাগতিক কর্মের ধর্মই হোলো ফল উৎপাদন করা। যোগী যতই প্রাণকর্মে দক্ষতা লাভ করেন ততই তিনি জাগতিক কর্মের ফল থেকে দূরে থাকতে সক্ষম হন। এইপ্রকার কর্মে দক্ষতা লাভ না হওয়া পর্যন্ত কোনো না কোনো বিষয়ে মনে অভাববোধ জাগবেই। এইপ্রকার অভাববোধ জাগলেই সেই বস্তুলাভের জন্য চঞ্চল মন ছোটাছুটি করে। কিন্তু এই নিষ্কাম প্রাণকর্ম করতে থাকলে মন ক্রমশঃ যতই নিরুদ্ধাবস্থা লাভ করে ততই মনোশূন্য অবস্থা হয় এবং যতই মনোশূন্য অবস্থা হয় ততই অভাববোধ তিরোহিত হয়। অভাববোধই মানুষকে নুতন নুতন কর্মে আকৃষ্ট করে। সমুদ্রে যেমন ঢেউয়ের শেষ নেই তেমনি চঞ্চল মনেরও কর্মের শেষ নেই। তাই একের পর এক কর্ম মনে উদিত হয় এবং সেই কর্ম করে জীব তার ফলভাগী হয়। এসবের মূলে হোলো চঞ্চল মনের তরঙ্গ এবং অভাববোধ। তাই যোগিরাজ বলছেন কোনো বিষয়েই অভাববোধ যেন না থাকে। এটা চাই ওটা চাই, না পেলে জীবন অসম্পূর্ণ, এসবই অভাববোধ রূপে গণ্য। আমরা কেউ ভাবি না যে জাগতিক বস্তু এবং জাগতিক বস্তু লাভের জন্য যেসব কর্ম তা কখনই স্থায়ী অভাব পূরণে সক্ষম নয়। অতএব জাগতিক সকল কর্ম এমন ভাবে করতে হবে যাতে অভাব পূরণ হবে অথচ অভাববোধ থাকবে না।

এই অবস্থা লাভ প্রাণকর্ম সাপেক্ষ এবং যাঁর হয়েছে তিনি দক্ষ। এইপ্রকার দক্ষতা লাভের চেষ্টা সকলেরই করা উচিত। তাই তিনি বলেছেন মনের বল যাতে না কমে তা করতে হবে, বিশেষ দক্ষতার সহিত সমস্ত কাজ করতে হবে এবং কোনো বিষয়ে ভীত হলে চলবে না। মানুষের সবচেয়ে বড শত্রু হোলো ইন্দ্রিয় ও রিপু। এদেরই তাড়নায় মানুষ সব কাজ করে। কিন্তু যোগী এদের বশীভূত রেখে, নিজের অধীনে রেখে, এদেরই দ্বারা ভৃত্যের মত সব কাজ করায়। তাই যোগী কখনও কোনো বিষয়ে অভাববোধ করেন না এবং কর্মের ফলে জড়িয়ে পরেন না। তাই যোগী যেমন কোনো বিষয়ের অভাববোধে ভীত হন না তেমনি ইন্দ্রিয় ভয়েও ভীত হন না, সবাই তাঁর অধীনে থাকে।

দৈব এবং পুরুষকার এর মধ্যে কার প্রাধান্য বেশী? সাধক বলেন দৈবের প্রাধান্য বেশী এবং যোগী বলেন পুরুষকারের প্রাধান্যই বেশী। যা পুরুষকার তাই কর্ম অর্থাৎ পুরুষকার এবং কর্ম একই কথা। সাধক যেহেতু দৈবের ওপর অধিক নির্ভরশীল তাই তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানান এবং কৃপালাভের চেষ্টা করেন। সাধক কল্পনাবিলাসী, যোগী বাস্তববাদী। সাধক দ্বৈতবাদী এবং কৃপাপ্রার্থী হওয়ায় দুর্বল প্রকৃতির। সাধক চান ঈশ্বরের দর্শন লাভ করে তাঁর রসাস্বাদন করতে এবং তাঁর লীলায় অভীভূত হতে। সাধক বলেন যতই সাধনা কর না কেন ঈশ্বর যদি কৃপা করে দর্শন না দেন তবে তাঁর দর্শন পাওয়া অসম্ভব। তাই সাধক ঈশ্বরের সঙ্গে মাতা, পিতা, সখা, প্রভু ইত্যাদি কোনো না কোনো সম্পর্ক পাতিয়ে এবং ভাবে সাধন করেন। সাধক সব সময়েই কোনো না কোনো ভাবের আশ্রয়ে থেকে ভাবালু অবস্থায় থাকতে ভালবাসেন। ভাবের আবেগে থাকায় বেশীরভাগই সাধকের মধ্যে ভাবের উচ্ছ্বাসও দেখা যায়। অনেক সময় সাধক বাহ্য বেশভূষা পরিবর্তন, তিলক-মালা ইত্যাদি ব্যবহার, নানা প্রকারে বাহ্য বিষয়বস্তু ত্যাগ যেমন কামিনী, কাঞ্চন, সংসার, ইন্দ্রিয় বিষয় থেকে দূরে থাকা ইত্যাদি নানা প্রকারে সাধক নিজেকে গঠন করবার চেষ্টা করেন। সাধকেরা গীত, বাদ্য, স্তুতি, প্রার্থনা, নামগান প্রভৃতির মাধ্যমে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেন। অনেক সময় সাধকেরা দলবদ্ধ ভাবেও এইসব করে থাকেন। তাই সাধক বলেন ঈশ্বরের কৃপালাভ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ভাবের আবেগে, উচ্ছ্বাসে এবং দৈবের ওপর গা ভাসিয়ে চলায় সাধক সমাজে অধিক গ্রন্থের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ভাবের উচ্ছ্বাসবশতঃ একই বক্তব্যকে বা একই ভগবৎ তত্ত্বকে ইনিয়ে বিনিয়ে নানা রস সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। দৈবের স্থান প্রবল এই যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তাঁরা বলেন যেমন চাষী অনেক পরিশ্রম করে চাষ করল কিন্তু দৈব

অনুকূল না হওয়ায় সময় মত বৃষ্টিপাত হল না, ফলে ফসল হল না। তেমনি ঈশ্বর যদি কৃপা করে দর্শন না দেন তবে ঈশ্বর দর্শন সম্ভব হয় না। এই সব নানা কারণে দৈবই প্রধান এটাই সাধকের অভিমত।

যোগী বলেন দৈবের ক্ষমতা নিশ্চই আছে তাই বলে পুরুষকারও কিছু কম নয়। যা পুরুষকাব তাই কর্ম। দৈব যতই অনুকুল হোক না কেন কর্ম না করলে কিছুই লাভ করা সম্ভব নয়। যোগী অদ্বৈতবাদী এবং বিজ্ঞানবাদী। বৈজ্ঞানিক যেমন সবকিছুর মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি চায়, যোগীও তেমনি ঈশ্বব সাধনপথে বিজ্ঞান ভিত্তিক উপায় চায়। অতএব ঈশ্বব সাধনকেও বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে গ্রহণ করতে হলে কর্মভিত্তিক হওয়া চাই, দৈবভিত্তিক নয়। দৈব হল ভাগ্যভিত্তিক, যা হঠাৎ ঘটে, যার ওপরে কোনো হাত থাকে না, যা বর্তমান কর্মের ওপর নির্ভরশীল নয়, তা কখনই বিজ্ঞানভিত্তিক হতে পারে না। তাই দৈব বিজ্ঞান ভিত্তিক নয়। যোগী বলেন দৈব অনুকূল না হওয়ায় হয়ত সময় মত বৃষ্টি হল না, তাই বলে নিরাশ না হয়ে চাষী যদি সেচ কর্ম করে তবে ফসল নিশ্চয় হবে। যোগী বলেন এই জগৎ এমনকি এই দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড সবই কর্মেব ওপর নির্ভরশীল। গীতাতে শ্রীভগবান্‌ও সেকথাই বলেছেন যে ক্ষণকাল মাত্রও যদি তিনি কর্ম থামান তাহলে কিছুই থাকবে না। প্রাণেব চঞ্চল অবস্থা হতেই সব কিছুব উৎপত্তি এবং স্থিতি। প্রাণ যদি ক্ষণকাল মাত্র কর্ম না কবে তবে এই জগৎ সংসার এমনকি এই দেহও থাকবে না। অতএব সবই প্রাণের চঞ্চলতা অর্থাৎ কর্মেব ওপর দাঁড়িয়ে আছে। অতএব কর্মই জগৎ, কর্মই সব। তাই যোগী বলেন সবই যখন কর্মময়, কর্মেব ওপবেই যখন সবকিছুর অস্তিত্ব, কর্ম ছাড়া যখন কিছুই লাভ করা সম্ভব নয়, তখন কর্ম ব্যতিবেকে আত্মলাভও সম্ভব নয়। কর্মই যখন সব, তখন দৈবও কর্মের অন্তর্গত। অতএব সঠিক কর্ম (আত্মকর্ম) করতে থাকলে দৈব যদি প্রতিকূল থাকে তবে তাকেও অনুকূল কবা যায়। কিন্তু প্রতিকূল দৈবকে সঠিক কর্মছাড়া অনুকূলে আনা অসম্ভব। অতীত অতীত জন্মের কর্মের পুঞ্জীভূত সমষ্টি ফলকেই দৈব বলে অতএব দৈবও কর্মফলের সমষ্টি। তাই কর্ম ছাড়া দৈব নেই, কিন্তু দৈব ছাডা কর্ম আছে। অতএব কর্মই প্রধান। যোগী বলেন পিপাসা দূরীকরনের জন্য দৈবের অপেক্ষা না করে-জলপান করারূপ কর্ম করলেই যেমন পিপাসা দূরীভূত হয়, তেমনি আত্মলাভরূপ পিপাসা দূরীকরনের জন্য আত্মকর্ম প্রয়োজন। এখানে দৈবের স্থান কোথায়? যদিও বা থাকে তবে যোগী সেই দৈবের অপেক্ষা না করে আত্মকর্মে প্রবৃত্ত হন। তাই যোগী অদ্বৈতবাদী, নিরাকারবাদী, শূন্যবাদী ও বিজ্ঞানবাদী। প্রার্থনা, স্তুতি, কৃপা ইত্যাদি যেহেতু বিজ্ঞান ভিত্তিক নয় সেহেতু যোগী এগুলির আশ্রয় গ্রহণ করেন না। যোগী

বলেন জলের অবস্থান্তর যেমন বাষ্প, তেমনি চঞ্চল প্রাণের অবস্থান্তর আত্মা বা শূন্যব্রহ্ম। এই দেহেই উভয় অবস্থা বর্তমান। অতএব সঠিক কর্মের (আত্মকর্ম) মাধ্যমে এই চঞ্চল প্রাণের অবস্থান্তর ঘটিয়ে স্থির প্রাণে রূপান্তর ঘটানো যায় তাহলেই সাধনার শেষ। কারণ 'নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্চতে'। অতএব যোগীর লক্ষ্যই হোলো চঞ্চল প্রাণকে স্থির প্রাণে রূপান্তর ঘটানো। এই রূপান্তর ঘটানো কর্ম বা পুরুষকার (আত্মকর্ম) সাপেক্ষ। এখানে দৈবের স্থান কোথায়? যোগী বলেন যাকে তোমরা দৈব বলো, যা হঠাৎ ঘটে বলে মনে হয়, তা কখনই হঠাৎ ঘটে না। সেই হঠাৎ ঘটনা ঘটার পূর্বে তুমি জাননা বলেই হঠাৎ বলে মনে হয়। কোনো কিছুই হঠাৎ ঘটে না। অতীত জন্মের সুকর্ম এবং কুকর্মের সমষ্টি ফলই একে একে ঘটতে থাকে এবং এটা কখন ঘটবে তা তোমার জানা না থাকায় দৈব বলো। অতএব যাকে তোমরা দৈব বলো তাও কিন্তু অতীত কর্মের সমষ্টি এবং সেই কর্মের ফলভোগেই জীব সুখ দুঃখ ভোগ করে। তাই দৈব আর কিছুই নয় কেবল অতীত কর্মফলের সমষ্টি। অতএব কর্মই মূল বা আদিকারণ। শাস্ত্রকারও তাই বলেছেন—

দৈবং হেতুং বদন্ত্যেবং ভৃশং কাপুরুষাঃ পতে।
স্বযং পুরাকৃতং কর্ম্ম দৈবং তচ্চ নহীতরৎ॥
ততঃ পৌরুষমালম্ব্য তৎকর্ম্মপরিশান্তযে।
ঈশ্বরং শরণং যাযাৎ সর্ব্বকারণকারণম্॥
বিধাতুঃ শাম্ভবীং ভক্তিং প্রিয় সর্ব্বে মনোরথাঃ।
সিদ্ধয়োঽষ্টৌ গৃহদ্বারং সেবন্তে নাত্র সংশয়ঃ॥

[কাশীখণ্ডম্ ৩২ অধ্যায়, ৩১, ৩২ ও ৩৪ শ্লোক]

অর্থাৎ কাপুরুষগণই দৈবকে হেতুরূপে নির্দেশ করে থাকে, কিন্তু দৈব পূর্বজন্মের স্বোপার্জিত কর্মভিন্ন আর কিছুই নয়। অতএব পুরুষকারপূর্বক সেই সমস্ত কর্মের শান্তির জন্য [নিরসনের জন্য], সমস্ত কারণের কারণ ঈশ্বরের [স্থির ব্রহ্মের] শরণ নেয়া উচিত। সেই বিধাতাকে [স্থির ব্রহ্মকে] যে ব্যক্তি শাম্ভবী ভক্তি করে তার সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ হয় এবং অষ্টসিদ্ধি তার গৃহদ্বারে অবস্থান করে থাকে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। যোগীর লক্ষ্যই হোলো শূন্যে স্থিতি। সেই শূন্যে স্থিতি না হওয়া পর্যন্ত যোগীর বিশ্রাম নেই, কর্ম করতেই থাকেন। কিন্তু যখন শূন্যে স্থিতি হয় তখন আর কোনো কর্ম থাকে না। এই একটিই হোলো যোগীর মূল কথা, তাই যোগপথে ভাবোচ্ছ্বাস না থাকায় অধিক সাহিত্য এবং অধিক প্রচার প্রয়োজন হয় না। এ কারণে যোগিগণ বাহ্যবেশ পরিবর্তন, বাহ্যত্যাগ, বাহ্যপূজা, স্তুতি, কৃপাভিক্ষা, নামগান, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে সাধন ইত্যাদির প্রয়োজন বোধ করেন না। এইসব

কারণে যোগীর কাছে দৈব অপেক্ষা পুরুষকার বা কর্মের প্রাধান্যই বেশী। যোগী বলেন কামিনী, কাঞ্চন, সংসার এবং ইন্দ্রিয় বিষয় থেকে দূরে থাকলে সঠিক ত্যাগ হোলো না। যে বস্তু আমার সামনে নেই এবং না থাকায় ভোগ করবার উপায় নেই, এ অবস্থাকে সঠিক ত্যাগ বলে না। সঠিক ত্যাগ তাকেই বলে যখন সকল প্রকার ভোগ্য বস্তু যেমন কামিনী, কাঞ্চন, বিষয় ইত্যাদি হাতের কাছে আছে অথচ ভোগ করার ইচ্ছা নেই। এই প্রকার ইচ্ছাতীত অবস্থালাভের পূর্বে ভোগ্য বস্তু থেকে দূরে থাকাটা বঞ্চনার সামিল। কিন্তু ভোগ্য বস্তু আছে অথচ ভোগের ইচ্ছা নেই এটাই সঠিক ত্যাগ। তাই যোগী কামিনী, কাঞ্চন, সংসার, ইন্দ্রিয় এগুলিকে কখনও পরিত্যাগ করে না বা এগুলি থেকে দূরে থাকে না। যোগী জানে মনই ম্লেচ্ছ এবং এই ম্লেচ্ছ মনই সবকিছু ভোগ করে। তাই যোগী ম্লেচ্ছ মনকে স্থির করে নিজের বশীভূত রাখে যাতে সে ভোগের উদ্দেশ্যে এদিক ওদিক ধাবিত না হয়। একারণে যোগী কামিনী, কাঞ্চন, সংসার ইত্যাদি কোনো কিছুকেই ত্যাগ করে না, কোনো কিছু থেকে দূরে থাকে না, সবকিছুর মাঝে থেকে সঠিক কর্মের মাধ্যমে শূন্যব্রহ্মে স্থায়ী স্থিতিলাভের জন্য কর্ম করে। এ জন্য যোগীর কর্মই প্রধান।

———

"ক্রিয়াবানই দেবতা, সকল দেবতা
এই ক্রিয়াই করিতেছেন" ॥ ৩৬ ॥

দেবতা কাদের বলা হয়? মানুষ সহ পৃথিবীর সকল প্রাণীর মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই বিভাগ দেখা যায়। যেমন জীবকুলের মধ্যে তেমনি দেব-দেবীর মধ্যেও এই দুই বিভাগ লক্ষিত হয়। দেব-দেবীর মধ্যে যাঁরা পুরুষরূপী তাঁদের দেবতা বলা হয় এবং যাঁরা স্ত্রীরূপী তাঁদের দেবী বলা হয়। দেবতা দিব্ শব্দ হতে জাত। দিব্ শব্দে আকাশ, অর্থাৎ শূন্যতত্ত্বে অবস্থানকারী যাঁরা তাঁদের দেবতা বা দেবী বলা হয়। একই প্রাণের দুটো দিক্, চঞ্চল ও স্থির। স্থির দিকটা ব্রহ্ম এবং চঞ্চল্ দিকটার চঞ্চলতার ক্রমান্বয়ে বা তারতম্যে এই জগতের সবকিছুর উৎপত্তি। অর্থাৎ স্থির দিক্ হতে জাত যে প্রথম চঞ্চলতা তাকে বলা হয় আকাশ বা শূন্য। এখানেই প্রথম গুণ আবির্ভূত হয়। তাই এটা প্রথম সূক্ষ্ম মহাভূত। এই আকাশ গুণাতীত নয়। এই সূক্ষ্ম মহাভূতের গুণগত যে তত্ত্ব সেই তত্ত্বকেই দেবতা বলা হয় এবং এই তত্ত্বের মধ্যেও যে স্পন্দনগত ও গুণগত প্রভেদ, সেইসব প্রভেদ অনুসারে বিভিন্ন দেবদেবীগত তত্ত্ব বর্তমান। অতএব মূল কথা হোলো প্রাণের প্রথম স্পন্দন হতে জাত যে প্রথম সূক্ষ্ম

মহাভূত সেই সূক্ষ্ম মহাভূতের মধ্যে স্পন্দন ও চঞ্চলতার প্রকারভেদ অনুসারে এক এক তত্ত্বকে এক এক দেব-দেবী বলা হয়। এই চঞ্চলতা আরো অধিক হলে যে তত্ত্ব প্রকাশিত হয় তাকে বলা হয় দ্বিতীয় ভূত অর্থাৎ বায়ুতত্ত্ব। এই বায়ুতত্ত্ব শূন্য অপেক্ষা অধিক স্থূল হওয়ায় চোখে দেখা যায় না অথচ স্পর্শেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এই তত্ত্বেও অনেক দেব-দেবী দেখা যায়। এই বায়ুতত্ত্ব আরো অধিক স্পন্দিত হওয়ায় আবির্ভূত হয় তেজস্তত্ত্ব। বায়ুই এই তেজস্তত্ত্বের ধারক। এই তেজস্তত্ত্বে ঘনীভূত সমষ্টিকে অগ্নি বলে। এই অগ্নি চোখে দেখা যায় এবং সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কিন্তু এই অগ্নি যখন সূক্ষ্মাকারে বায়ুতে অবস্থিত তখন চোখে দেখা যায় না কিন্তু স্পর্শগ্রাহ্য। এইপ্রকারে তেজস্তত্ত্বের মধ্যে সূক্ষ্ম ও স্থিরত্বের তারতম্য হেতু এবং বিভিন্ন গুণগত প্রকারভেদ হেতু বিভিন্ন দেব-দেবী দেখা যায়। অর্থাৎ এই তেজস্তত্ত্ব আরো অধিক স্পন্দিত হওয়ায় অপ বা জলরূপী চতুর্থ মহাভূত উৎপন্ন হয়। এই অপতত্ত্বের মধ্যেও জল বাষ্প বরফ ইত্যাদি গুণগত প্রভেদ দেখা যায়। অতএব এই অপতত্ত্বের মধ্যেও গুণগত প্রভেদ অনুসারে বিভিন্ন দেব-দেবী দেখা যায়। এই অপতত্ত্ব আরো অধিক স্পন্দিত হলে উৎপন্ন হয় ক্ষিতিতত্ত্ব। এই ক্ষিতিতত্ত্ব অপতত্ত্ব হতে জাত এবং অপতত্ত্বই এর ধারক। এই ক্ষিতিতত্ত্বের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকারভেদ দেখা যায় যেমন বিভিন্ন প্রকারের মাটি, বালি, পাথর ইত্যাদি। ক্ষিতিতত্ত্বের মধ্যে প্রকারভেদ অনুসারে গুণগত তারতম্য হেতু বিভিন্ন দেব-দেবী দেখা যায়। এই ক্ষিতিতত্ত্ব ক্রমান্বয়ে আরো তরঙ্গায়িত হওয়ায় এবং তরঙ্গের প্রকার ভেদ অনুসারে এই পৃথিবীতে অবস্থিত যাবতীয় বস্তু উৎপন্ন হয়। এইপ্রকারে পাঁচ গুণগততত্ত্বের তরঙ্গের অসংখ্য প্রকারভেদ দেখা যায়। যৌগিকমতে এই প্রকারভেদ তেত্রিশকোটী, তাই তেত্রিশকোটী দেব-দেবীর কথা জানা যায়। অর্থাৎ প্রাণের প্রথম চঞ্চলতা বা প্রথম তরঙ্গ থেকে শুরু করে সৃষ্টিতত্ত্বের শেষ ঘনীভূত তরঙ্গ পর্য্যন্ত এই যে তেত্রিশ কোটী তরঙ্গ বর্তমান, সেই তেত্রিশকোটী তরঙ্গের গুণকে তেত্রিশকোটী দেব-দেবী বলা হয়। এই প্রকারে প্রাণের প্রথম তরঙ্গে অর্থাৎ শূন্যতত্ত্বে অবস্থিত তরঙ্গের প্রকারভেদে যে সব দেব-দেবী অবস্থিত অর্থাৎ যে সব গুণগুলি অবস্থিত তাঁরা অধিক বলশালী হওয়ায় বৃহৎ দেব-দেবীরূপে গণ্য। এই তরঙ্গ আরো অধিক হওয়ায় যে দ্বিতীয় মরুৎতত্ত্ব এবং সেই মরুৎতত্ত্বে প্রকারভেদ অনুসারে যেসব দেব-দেবী অবস্থিত তাঁরা কিছুটা কম বলশালী। এই প্রকারে যতই প্রাণের তরঙ্গ বাড়তে থাকে ততই অধিক স্থূলত্বের প্রকাশ হয় এবং প্রত্যেক তত্ত্বের গুণগত পার্থক্য অনুসারে ক্রমান্বয়ে কম বলশালী দেব-দেবী দেখা যায়। যেমন কোনো দেব-দেবী পূজা করলে কেবলমাত্র রোগের উপশম হয়, আবার কোনো দেব-দেবী পূজা করলে ঝড়, বন্যা, অগ্নিভয়, আধি-ব্যাধি দূর হয় ইত্যাদি। এইসব দেব-দেবী আর

কিছুই নয় কেবল গুণগত প্রকারভেদ মাত্র। এইসব দেব-দেবী যেহেতু সকলেই কোনো না কোনো গুণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা দেবী তাই এঁরা কেউই ঈশ্বর, ভগবান্ বা ব্রহ্ম পদবাচ্য নন। এইসব দেব-দেবী গুণগত হওয়ায় উপাসনা, প্রার্থনা বা স্তুতির মাধ্যমে এঁদের সন্তুষ্ট করা যায় এবং সন্তুষ্ট করতে পারলে সেইসব গুণের অধিকারীও হওয়া যায়। কিন্তু যিনি ব্রহ্ম, যিনি নিশ্চল, তিনি গুণাতীত হওয়ায় তাঁকে সন্তুষ্ট করার প্রশ্নই আসে না, কারণ প্রাণের ওই স্থিরাবস্থায় সন্তোষ অসন্তোষ উভয়দিকেরই অভাব। তাই যোগিরাজ বলছেন—ক্রিয়াবানই দেবতা। কারণ যারা ক্রিয়াবান তারা এইসব গুণগত স্থূল দেব-দেবীর উপাসনা করে না। ক্রিয়াবান চেষ্টা করে কি উপায়ে সরাসরি প্রাণের ওই স্থিরাবস্থায় পৌঁছান যায়। এই স্থিরাবস্থায় পৌঁছাতে গেলে প্রথমে স্থূল তত্ত্বগুলিকে অতিক্রম করে শূন্যতত্ত্বে স্থিতিলাভ করতে হবে। ক্রিয়াবান যখন শূন্যতত্ত্বে স্থিতিলাভ করে তখন ওই শূন্যতত্ত্বের অন্তর্গত প্রাণের প্রথম চঞ্চলতার তরঙ্গের প্রকারভেদ অনুসারে যে যে গুণে অবস্থান করে সেই সেই গুণগুলি একএক দেব-দেবীরূপে লক্ষিত হয় এবং ক্রমে যখন ক্রিয়াবান সেইসব গুণগুলিকে অতিক্রম করতে থাকে, তখন ক্রিয়াবান নিজেই সেইসব গুণগুলির মধ্যে মিশে যাওয়ায় নিজেই সেইসব গুণগুলির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে গণ্য হয়। সূক্ষ্মতত্ত্বের ওইসব গুণগুলির লক্ষ্যস্থলই হোলো গুণাতীত নিশ্চল ব্রহ্মে অর্থাৎ তাদের উৎসস্থলে মিশে যাওয়া। এই মিশে যাওয়ার জন্য সেইসব সূক্ষ্মতত্ত্বের গুণগত অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবীরাও সদাই ব্যস্ত। ক্রিয়াবানও এই উদ্দেশ্যেই ব্যস্ত। তাই যোগিরাজ বলছেন—সকল দেবতা এই ক্রিয়াই করছেন। স্থিরপ্রাণ হতে জাত যে প্রথম তরঙ্গ সেখান থেকেই প্রাণের আবির্ভাব। তাই সমস্ত প্রকার তরঙ্গকে অতিক্রম করে মহাস্থিরে মিশে যাওয়ার জন্য যে কর্ম তাই প্রাণকর্ম। সেই তরঙ্গও কর্মপদবাচ্য। তাই যোগী সেই প্রাণকর্মকে ধরে কর্মাতীত বা নিস্তরঙ্গে মিশে যাওয়ার জন্যে চেষ্টা করে। একারণেই গীতায় বলা হয়েছে—হে অর্জুন, তুমি গুণাতীত হও। অর্থাৎ যেখানে গুণ নেই, তরঙ্গ নেই, সেই অবস্থায় যাবার চেষ্টা করো। কারণ যেখানে গুণ, সেখানেই তরঙ্গ এবং সেখানেই প্রকাশ; এইসবের ঊর্ধ্বে তোমায় যেতে হবে। তাই ক্রিয়াবান বলেন :—

আমার পূজা সৃষ্টি ছাড়া
গঙ্গাজলের নাইকো ছড়া,
ফুল লাগে না রাশি রাশি
হারিয়ে গেছে কোশা-কুশি।

সরে গেছেন কালী-তারা
আমি আত্ম দেখে আত্মহারা,
আমার পূজা সৃষ্টি ছাড়া
গঙ্গাজলের নাইকো ছড়া ॥
ঠাকুর দেবতা গেছি ভুলি
এবার শূন্য সাথে কোলাকুলি,
যুক্ত মুক্ত ত্রিবেনীতে
এবার আমি ডুব মারি।
হারিয়ে যাওয়ার কথা ভেবে
নিজের পূজা নিজেই করি,
আমার পূজা সৃষ্টি ছাড়া
গঙ্গাজলের নাইকো ছড়া ॥

"সত্যিকার বিশ্বাস নিয়ে তোমরা যদি আমার শরণাপন্ন হও তাহলে যত দূরেই আমি থাকি না কেন উপস্থিত না হয়ে উপায় কি? ক্রিয়া যে করে আমি তার কাছে উপস্থিত থাকি" ॥ ৩৭ ॥

এই ক্রিয়াসাধন করতে হলে শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং বিশ্বাস এই তিনটি অবশ্য থাকা চাই। ক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা, গুরুবাক্যে বিশ্বাস এবং ঈশ্বরে ভক্তি এই তিনটিই পাথেয় এবং যার ভেতরে এই তিনটি যত দৃঢ় তিনি সাধনায় তত বেশী অগ্রসর হতে পারেন। এই জগৎসংসারে কর্ম ছাড়া যখন কিছুই লাভ করা যায় না তখন কর্ম ব্যতিরেকে এই তিনটিকেও লাভ করা অসম্ভব। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে যদি এই ক্রিয়াসাধন করা যায় তবেই শুদ্ধাভক্তি আসে। কারণ যতই সাধন করা যায় ততই আত্মজ্যোতি দর্শনে যোগী তন্ময়তা প্রাপ্ত হয় এবং আরো অধিক দর্শন লাভের ইচ্ছা জাগে, এই ইচ্ছা যতই দৃঢ়ীকৃত হয় ততই ভক্তির উদয় হয়। এই প্রকারে যতই আত্মজ্যোতি দর্শন হতে থাকে ততই আত্মসত্তা যে আছেন এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসও উৎপন্ন হয়। অতএব সত্যিকারের বিশ্বাস এবং ভক্তি সম্পূর্ণরূপে আত্ম-কর্মসাপেক্ষ এবং প্রত্যক্ষ দেখাদেখির ওপর নির্ভর করে। এইপ্রকারে যতই প্রত্যক্ষ অনুভূতি বাড়তে থাকে ততই বিশ্বাস ও ভক্তি অধিক হয়। শরীরের মধ্যে পবিত্র থেকে পবিত্রতম যে স্থান কূটস্থ সেখানে যতই অবস্থান করা যায় ততই এগুলি আপনা

হতে উদিত হয়। এগুলি লাভের জন্য অন্য কোনো মানসিক প্রস্তুতি বা চেষ্টার প্রয়োজন নেই, সম্পূর্ণ প্রাণকর্মসাপেক্ষ। যে যত বেশী দৃঢ়রূপে, নিশ্চল অবস্থায় কূটস্থে অবস্থান করতে পারে তার কাছে তত বেশী এগুলি প্রকাশিত হয়। এই প্রকারে কূটস্থে অবস্থান করাকেই শরণাপন্ন অবস্থা বলে। তাই যোগিরাজ বলছেন—সত্যিকার বিশ্বাস নিয়ে তোমরা যদি আমার শরণাপন্ন হও । অর্থাৎ কূটস্থদর্শন এবং কূটস্থে অন্তত কিছু সময়ের জন্য অবস্থান না করা পর্যন্ত যেহেতু সত্যিকার ভক্তি ও বিশ্বাস আসা সম্ভব নয়, তাই তোমরা প্রথমে ক্রিয়ার মাধ্যমে ওই কূটস্থরূপী পবিত্রধামে বসবার চেষ্টা করো। বসতে পারলেই সত্যিকার বিশ্বাস আসবে এবং আমার শরণাপন্ন হবে। যদি এইভাবে আমার শরণাপন্ন হতে পারো তবে যত দূরেই আমি থাকি না কেন উপস্থিত না হয়ে উপায় কি? কারণ ওই কূটস্থই আমার অবস্থানস্থল এবং আমি কূটস্থময়। যোগিরাজ নিজে সাধনার মাধ্যমে তাঁর জীবাবস্থার উর্ধ্বে অর্থাৎ প্রাণের চঞ্চলাবস্থার অতীতে পৌঁছে স্বয়ংই কূটস্থ হয়ে গেছেন। অর্থাৎ যা কূটস্থ তাই তিনি, একে উপনীত হয়েছেন। জীব যতক্ষণ ওই কূটস্থে স্থিতিলাভ করতে না পারে ততক্ষণ সে কূটস্থ হতে দূরে থাকে। কিন্তু যোগিরাজের অবসানস্থল যেহেতু ওই কূটস্থ এবং জীব বর্তমানে কূটস্থ হতে দূরে থাকায় এক দূরত্বের ব্যবধান বজায় থাকে। কিন্তু যখন ওই ক্রিয়াবান্ আবার কূটস্থে উপনীত হয় তখন ওই দূরত্বের ব্যবধান ঘুচে যায়। অর্থাৎ চঞ্চলতা প্রযুক্ত তোমার সঙ্গে আমার যে দূরত্বের ব্যবধান বর্তমানে আছে তাকে রহিত কর, রহিত করতে পারলেই তুমি কূটস্থে স্থিতিলাভ অবস্থা পাবে এবং তখন আপনা হতেই আমাকে পাবে, কারণ সেখানে আমি সদাই বর্তমান। এ কারণেই যোগিরাজ বলতে সমর্থ হয়েছিলেন যে তোমাদের কূটস্থের মধ্যেই যখন আমি সর্বদা আছি, তখন এই হাড়মাংসের দেহটাকে দেখতে আসার কোন্ প্রয়োজন? আমি কূটস্থরূপে সর্বদা সঙ্গে আছি। এইরূপভাবে আমার দেহ সব। শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত ক্রিয়া করুন। যোগিরাজের মতাদর্শে শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস ইত্যাদি কোনো বাজারের জিনিস নয় যে পয়সা দিয়ে কেনা যায়। এগুলি অর্জন করতে হয়, তাই এগুলি কর্ম বা ক্রিয়াসাপেক্ষ। এ কারণেই ভক্তি ভক্তি করলে ভক্তিলাভ হয় না এবং শরণাপন্ন হলাম মনে করলেই শরণাপন্ন হওয়া যায় না। তাই তিনি পুনরায় বলেছেন—ক্রিয়া যে করে আমি তার কাছে উপস্থিত থাকি। অর্থাৎ যে আত্মক্রিয়া করে সেই কূটস্থে অবস্থান করতে সক্ষম হয় এবং তখনই তাঁর দর্শন পাওয়া সম্ভব। এর থেকে বোঝা যায় যোগিরাজ তাঁর নশ্বর দেহ ত্যাগ করে গেলেও কূটস্থরূপে তিনি সদা বিরাজমান। ঈশ্বরের অবস্থানস্থল কোথায়? এবং কোথায় তাঁকে খুঁজতে হবে, এর উত্তরে গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন

—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।" (১৮/৬১) অর্থাৎ ভগবান্ বলছেন যদিও তিনি পঞ্চভূতে অবস্থিত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতসহ সকল পদার্থে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত, কারণ প্রধান ওই পাঁচভূত হতেই জগতের সবকিছুর উৎপত্তি, তথাপি ওই সবকিছুর মধ্যে তাঁকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ বহুর মাঝে খুঁজতে গেলে নিজেকেও বহু হতে হয়। তাই তিনি নিশ্চিত করে হৃদয়দেশে খুঁজতে বলেছেন, যেখানে তাঁর বিশেষ অবস্থান। অতএব এই বিশেষ অবস্থানস্থল হৃদযদেশটি কোথায়? হৃদয়দেশ বলতে সকলেই বোঝেন বুকের মধ্যস্থলকে। কিন্তু যৌগিক মতে হৃদয়দেশ বলতে বুকের মাঝখানকে বোঝায় না। হৃদয়দেশ বলতে এই দেহরূপ মন্দিরের এমন একটি জায়গাকে বোঝায় যেখানে সবকিছুর ভারসাম্য অবস্থিত। সেই স্থানটি হোলো আজ্ঞাচক্ররূপী কূটস্থ, কারণ এই কূটস্থের ঊর্ধ্বে অব্যক্ত এবং নীচে ব্যক্ত। অতএব কূটস্থই হোলো ব্যক্ত এবং অব্যক্তের সন্ধিস্থল। তাই ভগবান্ বলেছেন প্রাণের চঞ্চলতাপ্রযুক্ত কূটস্থের নীচে ব্যক্ত হওয়ায় সমুদয় ভূতগণ ক্ষর বা নশ্বর পুরুষ এবং কূটস্থচৈতন্য হতে ঊর্ধ্বে স্থিরত্ব জন্য অক্ষর বা অবিনাশী পুরুষ (গীতা ১৫/১৬)। এক্ষেত্রে শ্রীভগবান্ যেমন নিশ্চিত করে অক্ষর বা অবিনাশী পুরুষের অবস্থানস্থল ওই কূটস্থকেই বলেছেন তেমনি অবিনাশী শ্যামাচরণও তাঁর অবস্থানস্থল ওই কূটস্থকেই বলেছেন। কারণ কূটস্থ অবিনাশী, শ্রীভগবান্ অবিনাশী এবং শ্যামাচরণও অবিনাশী। অতএব যা কূটস্থ, তাই ভগবান্, তাই শ্যামাচরণ।

———

"যখন ছয় চক্রেতে মন না দিয়া আপনা আপনি
ক্রিয়া হইবে তখনই সবকিছু বলিতে পারিবে" ॥ ৩৮ ॥

যোগিরাজ প্রদর্শিত এই ক্রিয়াযোগকে ষটচক্রের ক্রিয়া বলে যা অষ্টাঙ্গযোগের অন্তর্গত। আবার এই ষটচক্রের ক্রিয়া বা অষ্টাঙ্গযোগকেই রাজযোগ বলে। অতএব যা রাজযোগ, তাই ক্রিয়াযোগ এবং তাই ষটচক্রের ক্রিয়া বা অষ্টাঙ্গযোগ। অষ্টাঙ্গযোগ হোলো যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। যম অর্থে সংযম। জীবনের সবদিকে সংযমী হতে হবে। ব্রহ্মচর্য্য এই যমের অন্তর্গত। বাহ্যভাবে বীর্যধারণকে ব্রহ্মচর্য্য বলা হয়, যদিও যৌগিকমতে ব্রহ্মে বিচরণ করাকেই অর্থাৎ ব্রহ্মে সংযুক্ত হয়ে থাকাকেই সঠিক ব্রহ্মচর্য্য বলা হয়। কিন্তু যেহেতু যম হোলো অষ্টাঙ্গযোগের প্রথম সোপান সেহেতু এক্ষেত্রে বীর্যধারণকেই ব্রহ্মচর্য্য বলা উচিত।

বীর্যধারণরূপ ব্রহ্মচর্য্য পালন না করতে পারলে শরীর ও মন সুস্থ সবল থাকে না, তাই দীর্ঘযোগাভ্যাস করা সম্ভব হয় না। অতএব দীর্ঘযোগাভ্যাসের জন্য সুস্থ সবল দেহ প্রয়োজন, কারণ দেহ সুস্থ হলেই মন সুস্থ হয়। তাই শরীররূপ ক্ষেত্র, যাকে চাষাবাদ করলে (প্রাণকর্ম) আত্মসাক্ষাৎকার হয় তাকে সুস্থ রাখা একান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয় অঙ্গ নিয়ম। নিয়ম অর্থে নিয়মিত জীবনযাপন করা। উচ্ছৃঙ্খল জীবনে ঈশ্বর সাধন সম্ভব নয়, কারণ উচ্ছৃঙ্খল জীবন স্থিরত্বাভিমুখে অগ্রসর হতে পারে না। তৃতীয় অঙ্গ আসন। আসন অর্থে মেরুদণ্ড সোজা করে, সমকায় অবস্থায় দীর্ঘ সময় বসে সাধন করার অভ্যাসক্ষমতা অর্জন করা কারণ এই অবস্থাতেই সমাধি আসে। তাই সমাধি অবস্থাতেও যাতে শরীর সোজা ও নিশ্চল থাকে তার জন্য প্রতিদিন অভ্যাস করা। এই তিনটি অঙ্গের দ্বারা শরীর ও মন সাধনোপযোগী হয় এবং এই দেহকে প্রাণায়ামের দ্বারা চাষ করার সঠিক ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এই প্রকার প্রস্তুত ক্ষেত্রে প্রাণায়ামরূপ কর্ষণক্রিয়া শুরু করার জন্য চতুর্থ অঙ্গ হোলো প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম মেরুদণ্ডে অবস্থিত ছয়চক্রকে ধরেই করতে হয়। অন্তর্মুখী এই প্রাণায়াম করার সময় যাতে ছয়চক্রে লক্ষ্য থাকে সেইভাবে করতে হয়, তাই একে ষটচক্রের ক্রিয়া বলে। এই প্রকার উত্তম ১২টি প্রাণায়াম করতে পারলে পঞ্চমঅঙ্গ প্রত্যাহার অবস্থা আসে। তখন মন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ধাবিত না হয়ে অন্তর্মুখী হয়। এই অন্তর্মুখী প্রাণায়ামের দ্বারা মুখ্য প্রাণ এবং অপান বায়ু যতই নিরুদ্ধাবস্থা বা স্থিরাবস্থা লাভ করে ততই প্রত্যাহার অবস্থা দৃঢ় হয়। যতই দৃঢ় হতে থাকে ততই ষষ্ঠঅঙ্গ ধারণা জন্মায়। ধারণা অর্থে আত্মবিষয়ক ধারণা। আত্মা যে আছেন এ বিষয়ে আত্ম-জ্যোতিদর্শনে সঠিক ধারণা জন্মায়, যদিও তখনও আত্মদর্শন হয়নি। আবার এই ধারণা দৃঢ় হতে হতে আত্মদর্শনে তন্ময়তাপ্রাপ্তে সপ্তম অঙ্গ ধ্যান উৎপন্ন হয়। তখন 'ধ্যানাবস্থিত তদগতেন মনসা' এই অবস্থা প্রাপ্তে অষ্টম অঙ্গ সমাধি উৎপন্ন হয়। ক্রিয়াযোগ এই প্রকারে অষ্টাঙ্গযোগ বা ষটচক্রের ক্রিয়াকেই বোঝায়। এখানে যোগিরাজ বলছেন যখন ছয়চক্রে মন না দিয়ে আপনাআপনি ক্রিয়া হবে তখন সবকিছু বলতে পারবে। অর্থাৎ প্রাণায়াম করবার সময় মন স্বভাবতই চঞ্চল ও কর্মক্ষম থাকে। কিন্তু সে যাতে এদিক ওদিক পালিয়ে না যায় তার জন্য শরীরের মধ্যে প্রধান যে প্রাণের স্রোতপথ সেই মেরুদণ্ডকে ধরেই করতে হয় এবং এই মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে ছয়চক্র বিরাজিত যথা মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। মন যতক্ষণ কর্মক্ষম থাকে ততক্ষণ ছয়চক্র অবশ্যই বর্তমান। কিন্তু আরো অধিক প্রাণায়াম করতে থাকলে যতই বায়ুর স্থিরাবস্থা আসে ততই মন নিরুদ্ধ হতে থাকে। এই প্রকারে নিরুদ্ধ হতে হতে এমন এক অবস্থার উদয় হয় যখন মন

তার সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, সে অবস্থায় মন আর ছয়চক্রে থাকে না। তাই যোগিরাজ বলছেন মনের এই প্রকার 'ভোঁ' অবস্থায় যখন ছয়চক্রে মন নেই অথচ দীর্ঘ প্রাণায়াম অভ্যাস করার দরুন আপনাহতেই ভেতরে ভেতরে প্রাণায়াম হচ্ছে তখন সবকিছু বলতে পারবে অর্থে এই অবস্থায় উপনীত হলে যা বলবে তাই সঠিক হবে, কারণ এই অবস্থাপন্ন যোগীই কূটস্থে স্থায়ী স্থিতিলাভ করতে পারেন। কূটস্থই হোলো এই নিখিল বিশ্বকে দেখার দর্পণ বিশেষ। সেই দর্পণে তখন তাঁব স্থিতিলাভ হওয়ায় নিখিল বিশ্বের আসল স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়।

"জত্তা প্রিয়োগে ওত্তা মজুরি মিলেগা" ॥ ৩৯ ॥

এ জগতে যাঁরা মহান্ মহান্ বৈজ্ঞানিক তাঁদের লক্ষ্য হোলো এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর সম্মিলনের দ্বারা তৃতীয় শক্তি উৎপাদন করা এবং এর মাধ্যমে জাগতিকভাবে মানুষেব অশেষ কল্যাণ সাধিত করা। এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকগণ বস্তুর অন্তর্গতে বা গুণের অন্তর্গতে সীমাবদ্ধ থাকেন, গুণাতীতের বিষয়ে তাঁদের পক্ষে গবেষণা সম্ভব নয়। কিন্তু যোগী হলেন বৈজ্ঞানিকের ওপরে বৈজ্ঞানিক। তাই যোগীর লক্ষ্য হোলো বস্তু ও গুণের অতীতে পৌঁছে জন্ম-মৃত্যুরূপ প্রবাহের অতীতে কেমন করে যাওয়া যায় তার উপায় নির্দ্ধারণ করা। বৈজ্ঞানিকের লক্ষ্য যেমন মানুষের মঙ্গল করা, যোগীর লক্ষ্যও তাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ গুণগত বস্তুর দ্বারা মানুষের যে কল্যাণ করেন তাতে মানুষ ইহজীবনে অনেক সুখে থাকতে পারে। এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকেব উদ্দেশ্য হোলো ইহজীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রাপ্তি। সুখ বৈজ্ঞানিকও চান, যোগীও চান। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হোলো গুণগত সুখ এবং গুণাতীত সুখ। যোগী চান গুণাতীত সুখ। এই মৌল পার্থক্যের দরুন যোগীকে বলা হয় বিজ্ঞানীর ওপরে বিজ্ঞানী। তাই যোগীর গবেষণার মূল বিষয় হোলো প্রাণসত্তাকে কেন্দ্র করে, কারণ যোগী জানেন প্রাণশক্তিই মূলশক্তি। তাই তিনি মূলশক্তিকে ধরে শক্তিরও অতীতে যেতে চান। প্রাথমিক অবস্থায় যদিও যোগীর লক্ষ্য থাকে সুখপ্রাপ্তি, তথাপি যখন যোগী 'নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্চতে' অবস্থায় চলে যান তখন সুখও থাকে না দুঃখও থাকে না, সে এক নির্গুণ কালাতীত অবস্থা। এই অবস্থা কি উপায়ে লাভ করা যায় সেকথা বলতে গিয়ে বিজ্ঞানীর ওপরে বিজ্ঞানী শ্যামাচরণ বলেছেন সঠিক কর্মের মাধ্যমেই অর্থাৎ প্রাণকর্মের মাধ্যমেই ওই অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় এবং তিনি নিজ জীবনে ওই অবস্থায় উপনীত হয়ে প্রমাণ করে দেখালেন, কাজেই এটা তাঁর কথার কথা নয়। বাস্তব জীবনে দেখা যায় যেমন কর্ম করা হয় তেমনি ফল লাভ হয় আবার যতটুকু কর্ম করা যায় ততটুকুই

ফল লাভ হয়। এটা যেমন সকল কর্মের নিয়ম তেমনি প্রাণকর্মেরও নিয়ম হোলো যেমন করা যাবে এবং যতটুকু করা যাবে ততটুকুই স্থিরত্বফল লাভ হবে এবং যতটুকু স্থিরত্বফল লাভ হবে ততটুকুই আত্মসাক্ষাৎকার হবে, এর অন্যথা হবার উপায় নেই কারণ এটাই কর্মের ধর্ম। কর্মের ধর্মকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। এই প্রকারে যতই অধিক ও উত্তম প্রাণকর্ম করতে থাকবে ততই অনন্ত অবিনাশী আত্মার মহান্ রূপ দর্শনে যোগী তন্ময়তাপ্রাপ্তে শেষে যখন আমিহারা অবস্থায় অনন্ত মহাশূন্যরূপী ব্রহ্মে নিরালম্বে স্থায়ী স্থিতিলাভ করবেন তখন কিছুই থাকবে না। এ অবস্থায় আমি নেই, আত্মজ্যোতি নেই, আত্মা নেই, কোনোপ্রকার দর্শন নেই, কেবল অনন্ত শূন্য। এটাই যোগীর শেষ গন্তব্যস্থল। এই অবস্থায় থাকাটাকেই যোগী সুখ বলেন, যদিও এ অবস্থায় সুখ-দুঃখের অনুভূতি থাকে না। তাই মানবদরদী শ্যামাচরণ বলেছেন এইপ্রকার পরমকল্যাণ ও সুখলাভের জন্য হে প্রিয় মানুষ তোমরা সদাই এই বিজ্ঞানসম্মত অমর প্রাণকর্মে নিযুক্ত হও, এটাই তোমার একমাত্র কর্ম, আর জাগতিক সুখলাভের জন্য সকল কর্মই অকর্ম এটা নিশ্চয় জেনো।

"নির্ম্মল জ্যোত মন দেখতা হয় লেকন উহ ন লয়
হুয়া—ওহা যাকে অভি নির্ব্বাণ নহি হুয়া" ॥ ৪০ ॥

মানুষ যখন ঈশ্বর সাধনার উদ্দেশ্যে প্রথম প্রথম যোগসাধন শুরু করে তখন তার কাছে এই সাধন নিরস মনে হয়, কারণ তখন সে প্রায় কিছুই দেখে না। আবার সেই মানুষই যখন আরো অধিক ও উত্তম প্রাণকর্ম করতে থাকে ততই তার কিছু কিছু জ্যোতিদর্শন হয়। এই জ্যোতিদর্শনে তার মনে আনন্দ উৎপন্ন হতে থাকে এবং আরো অধিক জ্যোতিদর্শনের আশায় উঠে পড়ে লাগে এবং আরো অধিক ও উত্তম প্রাণকর্মে প্রবৃত্ত হতে হতে নির্মল আত্মজ্যোতি দর্শন হয়। এই জ্যোতি কিন্তু আত্মা নন, এটা তাঁর প্রকাশ মাত্র। এই জ্যোতিদর্শনে আত্মা যে আছেন এ বিষয়ে যখন নিশ্চিত ধারণা জন্মায় তখন যোগী আরো অধিক প্রাণকর্মের দ্বারা মূল আত্মদর্শনে তন্ময় হন। কিন্তু এই যে দেখাদেখি তা কতক্ষণ? যতক্ষণ মন বর্তমান। মনই দেখবার কর্তা। অতএব মন যতক্ষণ দেখে ততক্ষণ দ্বৈতভাব অবশ্যই বর্তমান থাকে। কারণ যে দেখছে এবং যাকে দেখছে এই দুইসত্তা বর্তমান। তাই যোগিরাজ বলেছেন দ্বৈতই মহাদুঃখের মূল। যতক্ষণ দুই আছে ততক্ষণ সুখদুঃখ অবশ্যই আছে। কিন্তু যখন দুইএর অভাব, যখন আর দেখাদেখি থাকে না তখন সুখ দুঃখের অনুভূতি

কোথায় ? তাই তিনি আত্মসাধন করতে করতে বুঝতে পারলেন এই যে আত্মজ্যোতি দেখছি অতএব এখনও পর্যন্ত মন নিরুদ্ধ হয়নি এবং মন নিরুদ্ধ না হওয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাসের অভ্যন্তর গতি এখনও আছে, যদিও বাহ্যশ্বাস নেই। তথাপি এই অভ্যন্তর গতি থাকায় অগতিরূপ যে নির্বাণ অবস্থা তা এখনও লাভ হয় নি। অতএব ওই যে জ্যোতি দেখছি সেই জ্যোতিতে এখন নিজেকে মিলিয়ে দিতে হবে এবং যখন মিলিয়ে দিতে পারবো তখন নিজেই ওই জ্যোতিতে রূপান্তরিত হবো অর্থাৎ আমি এবং জ্যোতি এক হবো। এই অবস্থালাভটাই এখন আমার প্রয়োজন। নির্বাণ অর্থে সম্পূর্ণরূপে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিহীন অবস্থা, এই অবস্থাকেই অগতি বলে। এই অগতি অবস্থা লাভের জন্য আরো অগ্রসর হতে হতে বলেছেন—"শূন্য ভবনমে লয় হো জানা।" সম্পূর্ণরূপে গতিবিহীন অগতিরূপ যে শূন্যভবন সেখানে লয়প্রাপ্তি হতে হবে, সেই ভবনের মধ্যে মিলে মিশে একাকার হয়ে নিজেকেই শূন্য হতে হবে, কারণ ওই শূন্যভবনই আসল। সেই শূন্যভবনে মিলবার চেষ্টা করতে গিয়ে প্রথমে যে নির্মল জ্যোতিদর্শন হচ্ছে তাতে আগে মিলতে হবে। সেই জ্যোতিতে যখন তিনি মিলে গেলেন তখন তিনি জানালেন—'অব হম নির্মল জ্যোতমে সমায় গয়ে'। এখন আমি নির্মল জ্যোতির মধ্যে মিশে গেলাম অর্থাৎ ওই জ্যোতি এবং আমি এক হয়ে গেলাম। এর পূর্বে যতক্ষণ আত্মজ্যোতি দেখছিলাম অর্থাৎ আমার মন দেখছিল, ততক্ষণ আমি দ্বৈতে ছিলাম। দ্বৈতে ছিলাম বলেই যত দুঃখ ছিল। দেখাদেখি যতক্ষণ ছিল তার পরে না দেখাও ছিল। কারণ দেখাদেখি থাকলেই না দেখাও থাকবে। তাই সবসময় যে আত্মজ্যোতি দেখছি তা হতে পারে না, কখনও দেখছি আবার কখনও দেখছি না এই দুই অবস্থা ছিল। যদি বলি দেখছি তবে কিছুক্ষণ পর দেখছি না এটাও হবে। তাই যখন আত্মজ্যোতি দেখছি তখন আনন্দ বা সুখ বর্তমান। কিন্তু যখন দেখছি না তখন নিরানন্দ ও দুঃখ বর্তমান। অতএব মন যতক্ষণ দেখে ততক্ষণ আনন্দ এবং যখন দেখে না তখন নিরানন্দ। এই দুই অবস্থা অবশ্যই থাকে। তাই দেখাদেখি থাকলেই না দেখারূপ অবস্থাও বর্তমান থাকে। কাজেই আমাকে এমন জায়গায় যেতে হবে যেখানে কিছু নেই, অতএব দেখাদেখিও নেই। একখণ্ড কয়লাকে যদি প্রজ্বলিত আগুনে ফেলে দেওয়া হয় ক্ষণকাল পরে সে যেমন আর কয়লা থাকে না, গনগনে আগুনে রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ নিজেই আগুন হয়ে যায়, সেরকম আমিও এখন ওই আত্মজ্যোতিতে মিশে গিয়ে জ্যোতিই হয়ে গেলাম। অতএব এখন আর আমার আমি নেই, এখন আমি জ্যোতিই হয়ে গেছি। "বড়া দরওয়াজা খুলা—জয়সা নলকা জল গঙ্গামে মিলনেসে গঙ্গা হো জাতা হয় ওয়সা শ্বাসা বায়ুকে সূক্ষ্ম ভকামে মিলনেসে একাকার হো জাতা হয়—এহি ব্রহ্ম হয়—আদি

ব্রহ্ম সচ্চা—আপহি আপ ভগবান রূপ হয়—অব বড়া মজা হয়।" প্রধান দরজা খুলে যেমন মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়, তেমনি এই দেহরূপ মন্দিরে প্রবেশ করতে গেলে যে প্রধান দরজা (হৃদয়গ্রন্থি) তা খুলে গেল। এই প্রধান দরজা খুলে যাওয়ার পর আমার কি অবস্থা হোলো? ঠিক যেমন নদের জল গঙ্গায় মিশে গেলে গঙ্গা হয়ে যায় আমারও এখন এই অবস্থা হোলো। যে শ্বাস দেহমন্দিরে খণ্ড খণ্ড হয়ে চলছিল বলেই অখণ্ড অবস্থায় পৌঁছতে পারছিলাম না, খণ্ডে বা দ্বৈতে থাকতে বাধ্য ছিলাম, এখন প্রাণকর্ম করতে করতে সেই খণ্ড শ্বাস এসে মিশে গেল অখণ্ডরূপী নির্মল মহাশূন্যে। এখন সব একাকার হয়ে গেলো, লয় হয়ে গেলো। এখন বুঝলাম এই অবস্থাটাই আদি ব্রহ্ম এবং আদি ব্রহ্মই সম্পূর্ণ সৎ। এই আদি শূন্য ব্রহ্মে যখন মিশে গেলাম তখন আমিও ব্রহ্ম হলাম। এই অবস্থাটাই ভগবান্ পদবাচ্য। তাই এই অবস্থার মধ্যে যখন মিলে মিশে একাকার হয়ে গেলাম তখন আমি নিজেই ভগবান্ হলাম। ভগবান্ যিনি চিদানন্দময়, যিনি কখনও কোনো অবস্থাতেই আনন্দ হতে বিচ্যুত হন না, এখন আমি নিজেই ভগবান্ হওয়ায় আমারও চিরআনন্দ অবস্থা হোলো। এই অবস্থায় মিলে যাওয়ার পূর্বে যখন এই দেহে শ্বাসের গতি ছিল, সেই গতির উৎসস্থলে পৌঁছে দেখলাম যে ওই শ্বাস আসে কোথা হতে? দেখলাম "শূন্যকে ভিতরসে হওয়া আতা হয় ইহ মালুম হোনে লগা।" পঞ্চভূতের চতুর্থ ভূত যে বায়ুতত্ত্ব, যা শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে সকল জীবদেহে বর্তমান তার উৎপত্তিস্থল হোলো পঞ্চম মহাভূত শূন্য। সেই শূন্য থেকেই হাওয়ার উৎপত্তি আবার শূন্যেই মিলে যায়। ক্ষিতি তত্ত্ব হতে বায়ুতত্ত্ব পর্যন্ত এই চার মহাভূত এখন আমার সম্পূর্ণ অধীন। এই চার ভূতকে অতিক্রম করে পঞ্চম মহাভূত শূন্যে যখন এসে মিশলাম তখন দেখলাম এখান থেকেই জীবের শ্বসনক্রিয়া চলে। কারণ পঞ্চ মহাভূতের গুণগত সমষ্টিফলই জীবের এই বর্তমান দেহ। এটাই হোলো দেহতত্ত্বের বিজ্ঞান। এখন আমি দেহতত্ত্বের বিজ্ঞানেরও অতীতে পৌঁছে, পাঁচ মহাভূতের অতীতে পৌঁছে শূন্য ব্রহ্মে এসে উপস্থিত হলাম তাই "আজ অভয় পদ দর্শন হুয়া—য়ানে মহাস্থির হুয়া, মোক্ষ হুয়া—ফির উহ শূন্য ঘরমে রহকরকে সবকুছ দেখে সব-কুছ করে। যেতনা ইন্দ্রিয় লয় হোতা হয় ওহি শ্বাসামে।" প্রাণের চঞ্চল অবস্থাকেই জীবন বলে। এখন আমি সমস্ত প্রকার চঞ্চলতার অতীতে পৌঁছে জীবন-দর্শনের অতীতে পৌঁছে যাওয়ায় আজ অভয়পদ দর্শন হোলো অর্থাৎ মহাস্থির হলাম। মহাস্থির ঘরে পৌঁছতে পারলাম বলেই মোক্ষ হোলো অর্থাৎ জন্মমৃত্যুরূপ প্রবাহের অতীতে পৌঁছে মহাস্থির ঘরে অবস্থান করলাম। এই মহাস্থিরে না যাওয়া পর্যন্ত মোক্ষ হয় না। এখন থেকে সর্বদার জন্য এই মহাশূন্যরূপী স্থিরঘরে অবস্থান করে এ দুনিয়ার সবকিছু দেখি ও করি। এই স্থির ঘরে অবস্থান করে

আরো দেখলাম যে সমস্ত ইন্দ্রিয় এসে মিশে যায় ওই স্থির শ্বাসে। এই স্থির ঘরে উপনীত হয়ে এই দেহ এবং জগৎ সবকিছুর মূল রহস্যকে বুঝতে পারলাম। বুঝলাম যে এই জগৎ, এই দেহ, সমস্ত ইন্দ্রিয় এমন কি শ্বাস পর্যন্ত সবার উৎপত্তি স্থল এই স্থিরমহাশূন্য। আবার ঘুরে ফিরে সবাই এসে এখানেই মিশে যায়। তাই এই অবস্থাটাই আদি, সৎ ও ভগবান্। এই আদি অবস্থায় মিশে যাওয়ায় এখন আমিও আদি, সৎ ও ভগবান্। "অব ন আনা ন-জানা।" এখন যেহেতু আর কোনো তরঙ্গ নেই, সমস্ত প্রকার তরঙ্গের অতীতে পৌঁছে যেহেতু ভগবান্ হয়েছি অতএব এই ভবসংসারে আসা যাওয়া থেকে সমস্ত প্রবাহের অতীতে গেলাম। এখন আর আমার আসাও নেই যাওয়াও নেই। হে পৃথিবীর মানুষ তোমাদের মঙ্গল কিসে হয় তা তোমরা নিজেরাই জানো না। তাই তোমাদের যখনই যখনই মঙ্গল করার, হিত করার, আনন্দ দেবার প্রয়োজন হবে তখন তোমাদের কাছে আমি নিজেই আসবো। কিন্তু যেহেতু আমার কোনো ইচ্ছা নেই, যেহেতু আমার সমস্ত ইচ্ছা শেষ হয়ে গেছে, তাই আমার তোমাদের কাছে আবার আসাটা হবে অনিচ্ছার ইচ্ছা। যদিও আমার কোনো কর্ম নেই তথাপি তোমাদের মঙ্গল করাটাই আমার একমাত্র কাজ। হে প্রিয় মানুষ, তোমার সঙ্গে আমার এইটুকুই পার্থক্য যে আমি উৎসস্থলে পৌঁছে গেছি, তুমি এখনও পারনি। তুমি এখনও পথ চলছ, আমার চলার শেষ। তাই তুমি এখনও ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, আমার বিশ্রাম। তোমাকে আরো কিছুকাল চেষ্টা করতে হবে, আমার চেষ্টার শেষ। আমি উৎসস্থলে পৌঁছে যাওয়ায় সেখানকার সবকিছু জেনেছি, তুমি এখনও পারোনি। সেজন্য হতাশ হয়ো না। আমি তোমাদের যে রাস্তার কথা বলেছি, কারণ ওই রাস্তা ধরেই আমি এসেছি, ওই রাস্তা ধরেই তোমরা উৎসস্থলে চলে এসো। যদি তুমি ক্লান্ত হওয়ায় দ্রুত চলতে না পার ক্ষতি নেই, কচ্ছপের গতিতে এসো, কিন্তু থেমো না, আস্তে হলেও চলতে থাকো তাহলে এক সময় নিশ্চয় পৌঁছে যাবে। তোমার আমার উৎসস্থল একই, তাই এখানে এসে যখন তুমি পৌঁছবে তখন তোমাকে আমিই প্রথম অভিনন্দন করে, আদর করে ডেকে নেবো। কখন তুমি আসছ তার জন্য প্রতীক্ষায় রইলাম। আমি এখানে পৌঁছে জেনেছি এ বড় আনন্দের জায়গা, চিরনির্মল। তোমাদের সকলকে একদিন না একদিন এখানে আসতেই হবে, তবে আর দেরী করছ কেন? তোমরা যাতে আসতে পার, যাতে তোমাদের কষ্ট কম হয় তার জন্য সকল ব্যবস্থা ত করে দিয়েছি, কেবল তোমরা একটু চলতে শেখ, এগিয়ে এসো। যখন এখানে আসবে, তখন তুমি আর আমি এক হয়ে যাবো।

"উত্তম প্রাণকর্ম্ম করিতে থাকিলে আপনা
হইতেই অজ্ঞান দূরীভূত হইবে" ॥ ৪১ ॥

ঈশ্বরলাভের জন্য বহুপ্রকার সাধন ব্যবস্থা আছে। এইসব নানা প্রকার সাধন ব্যবস্থা কোনো না কোনো মহাত্মা করেছেন মানুষের মঙ্গলের জন্য। যদিও সকল সাধনার উদ্দেশ্য হোলো আত্মসাক্ষাৎকার, তথাপি এইসকল সাধন পথকে শাস্ত্রকারেরা মহাধর্ম বলেন নি। তাঁরা মহাধর্ম বলতে একটি সাধনকেই বলেছেন, তা হোলো প্রাণায়াম—প্রাণায়ামো মহাধর্ম। যোগিরাজও সকল মানুষকে এই প্রাণায়াম সাধন করতে বলেছেন এবং তিনি নিজেও এই প্রাণায়াম সাধন করে অতি অল্প সময়ে কৃতার্থ হয়েছেন।

অজ্ঞানতার আবর্তে থাকায় জীব জ্ঞানলাভ করতে পারে না। এই অজ্ঞানতাকে অবশ্যই দূর করা প্রয়োজন। একে দূর করতে গেলে প্রথমেই জানতে হবে অজ্ঞান কাকে বলে, কোথা থেকে আসে, কতক্ষণ থাকে এবং কি প্রকারেই বা দূর করা যায়। একে দূর করার বিষয়ে বলতে গিয়ে যোগিরাজ বলেছেন উত্তম প্রাণায়াম করলে অজ্ঞান দূর হয়। এব থেকে জানা গেল অজ্ঞানকে দূর কবার উপায়টা। কিন্তু অজ্ঞানটা কি, কোথা থেকে আসে এটাতো জানা গেল না। অজ্ঞান হোলো জীবের সাথী, একটা অবস্থা মাত্র। সেই অবস্থাটা হোলো প্রাণের চঞ্চলতা। এই চঞ্চলতাই জীবেব জীবন এবং বর্তমান অস্তিত্ব। তাই যেহেতু এটা বর্তমান অস্তিত্ব অতএব এই অস্তিত্ব যতক্ষণ আছে ততক্ষণ অজ্ঞান বর্তমান। তাই জীব কিছুতেই অজ্ঞানকে দূর করতে পারে না। প্রাণের এই চঞ্চলদিকটাই অজ্ঞান এবং স্থির দিকটাই জ্ঞান। তাহলে অজ্ঞান দূর হবে কখন, যখন প্রাণ স্থির হবে। অতএব সর্বাগ্রে স্থির হওয়া প্রয়োজন। প্রাণের এই চঞ্চল দিকটা হতেই সকল ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি সবকিছু উৎপন্ন হয়। এমনকি এই দেহ, জগৎ সংসার সবকিছুই এই চঞ্চল দিক্ হতেই জাত। অতএব অজ্ঞানও চঞ্চল দিক্ হতে জাত। তাই যতক্ষণ প্রাণের চঞ্চলতা আছে ততক্ষণ অজ্ঞান থাকবে। যোগিরাজের মতে উত্তম প্রাণায়াম করতে থাকলে দেহাভ্যন্তরস্থ উনপঞ্চাশ বায়ু ধীরে ধীরে স্থির হবে। যখন সকল বায়ু স্থির হবে তখন আপনাহতেই সমস্ত প্রকার চঞ্চলতা, কম্পন, স্পন্দন সবই স্থির হতে হতে মহাস্থিরের সঙ্গে যুক্ত হবে বা মিশে যাবে। এইপ্রকারে যোগী যতই স্থিরত্বাভিমুখে অগ্রসর হবে ততই তার অজ্ঞানের দিক্ কমতে থাকবে এবং জ্ঞানের দিক্ বাড়তে থাকবে। এই প্রকারে যখন জীব সম্পূর্ণ স্থির হবে তখন অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়ে পূর্ণজ্ঞানের প্রকাশ হবে। অতএব চঞ্চলতাই অজ্ঞান এবং স্থিরত্বই জ্ঞান। তাই

যোগিরাজ সকলকে বলেছেন উত্তম প্রাণকর্ম্ম করতে থাক, তাহলে অজ্ঞান আপনা হতেই চলে যাবে। জ্ঞান এবং অজ্ঞান এই দুটো অবস্থা তোমাদের ভেতর আছে। কেবল চঞ্চলতায় থাকার দরুন জ্ঞানের সন্ধান পাচ্ছো না। অতএব অজ্ঞানকে দূর করাটা সম্পূর্ণরূপে প্রাণকর্মসাপেক্ষ, এর অন্য কোনো উপায় নেই। তাই তোমরা কোনোদিকে না তাকিয়ে উত্তম প্রাণকর্ম করতে থাক, এটাই তোমার একমাত্র কাজ। এই কাজকে না করে অন্য সকল কাজ করাটা সম্পূর্ণরূপে অকাজ বলে গণ্য।

"উল্টো লিখে আয়না দিয়ে দেখলে সোজা দেখায়,
তদ্রূপ দেহস্থ বায়ুকে উল্টাইলেও স্বরূপ দেখায়" ॥ ৪২ ॥

জীবের বর্তমান অস্তিত্বটাই হোলো উল্টো। অথচ জীব অজ্ঞানবশতঃ এই উল্টো-দিকটাকেই সোজা দিক্ বলে মনে করে। গীতাতে শ্রীভগবান্ বলেছেন—"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।" (গীতা ২/২৮)। জীবের মূলশক্তিই হোলো প্রাণশক্তি। এই প্রাণের তিনটি অবস্থা। আদিতে স্থির, অন্তে স্থির এবং মধ্যে চঞ্চল। তাহলে আদি ও অন্তে স্থির হওয়ায় একটা অবস্থা এবং মধ্যে চঞ্চল হওয়ায় আর একটা অবস্থা। অতএব প্রাণের মূলতঃ স্থির ও চঞ্চল এই দুটি অবস্থা। গীতাতেও ভগবান্ সেই কথাই বলেছেন যে ভূতসকল আদিতে অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত এবং নিধনেও অব্যক্ত। তাহলে বোঝা গেল প্রাণের মূল অবস্থাটা হোলো স্থির। সেই স্থির প্রাণ চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ায় সব কিছুর উৎপত্তি। যেহেতু জীব সব কিছুর মধ্যে গণ্য তাই তার বর্তমান অস্তিত্বটাও চঞ্চলতার অন্তর্গত। কিন্তু স্থির প্রাণ ব্যতীত চঞ্চল প্রাণের কোনো অস্তিত্ব নেই, কারণ স্থিরত্বই মূল। কূটস্থের ঊর্ধ্বে সহস্রার পর্যন্ত প্রাণের ওই স্থির অবস্থা বর্তমান। কূটস্থের নিচে প্রাণ অধিকতর চঞ্চল হতে হতে মেরুদণ্ডকে কেন্দ্র করে স্রোতবৎ নিম্নাভিমুখী হয়ে বহুধা বিভক্ত অবস্থায় সর্বদেহে বর্তমান। অতএব চঞ্চলতার উৎসস্থল বা মূল যে স্থিরত্ব তা কূটস্থের ঊর্ধ্বে অবস্থিত। কিন্তু জীব সেই স্থিরত্বকে জানে না যা তার আসলস্বরূপ। সে ভাবে তার এই চঞ্চলতাটাই সঠিক বা আসল। তাই তার বর্তমান অস্তিত্বটাই হোলো উল্টো। তাই জীব যদি কোনো প্রকারে তার এই অবস্থাটাকে উল্টে নিতে পারে তাহলেই সে নিজেকে পাবে, স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। যেমন একটা ইংরাজী অক্ষর 'B' তাকে যদি উল্টোভাবে লেখা যায় এবং সেই লেখাটি আয়নার সামনে ধরলে সোজা দেখায় জীবেরও ঠিক সেই অবস্থা। প্রাণের স্রোতধারা যেমন ওপর থেকে নীচে নেমে এসেছে তেমনি তার শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিও

নিম্নাভিমুখী ও বহির্গতি। এই দেহস্থ বায়ুকে, যা বহুধা বিভক্ত হয়ে সর্বদেহে অবস্থিত, তাকে যদি প্রাণকর্মের দ্বারা উল্টে নিয়ে নীচের থেকে ওপরে উঠিয়ে পুনরায় তার উৎসস্থলরূপ স্থিরবায়ুতে নিয়ে যাওয়া যায় অর্থাৎ একে মিলিয়ে দেওয়া যায় তাহলেই জীব তার আপনস্বরূপকে জানতে পারে। এই অবস্থাটার কথা বলতে গিয়ে মহাত্মা তুলসীদাস বলেছেন—'উল্টা জপতি রাম'। এর আর একটা প্রচ্ছন্ন কাহিনী পাওয়া যায় যে রত্নাকর রাম উচ্চারণ করতে না পারায় 'মরা-মরা' জপ করতে করতে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছিলেন এবং বাল্মিকী মুনি নামে খ্যাত হয়েছিলেন। এগুলির দ্বারা উল্টা বায়ুর কর্ম করাকেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান কালে এই আত্মসাধন এক গড্ডালিকা প্রবাহে পর্য্যবসিত হয়েছে।

"ওষ্ঠ কণ্ঠ দন্ত প্রকৃতিতে বায়ুর জোর প্রাণায়ামে পড়িলে জ্ঞানের স্বানুভব হওয়ার নাম ভক্তি" ॥ ৪৩ ॥

সাধারণ মানুষ ভক্তি বলতে কি বোঝে? ঈশ্বর সাধন করতে ভাল লাগা, ঈশ্বর কথা শুনতে ভাল লাগা, ঈশ্বর কথা শুনতে শুনতে চোখ দিয়ে জল গড়ানো, ভাবের আবেগে কোন কোন সময় দুহাত তুলে নৃত্য করা, কোন কোন সময় ভাবাবেগে তন্ময় হয়ে থাকা ইত্যাদি অবস্থাগুলিকে সাধারণ মানুষ ভক্তি বলে মনে করে। এগুলি সবই মনধর্ম বা বায়ুধর্ম। জীবশরীরে প্রাণ চঞ্চল থাকায় যে মুখ্য প্রাণবায়ু বর্তমান সেই প্রাণবায়ু আবার উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত হয়ে জীবশরীরে সকল কর্ম করে থাকে। এই উনপঞ্চাশ বায়ুর এক একটি দ্বারা আবার বহু প্রকার কর্ম সাধিত হয়। যেমন কানে শোনা একটা বায়ুর কর্ম। কানের মধ্যে সেই বায়ু যদি কর্মক্ষম থাকে তবেই কানে শোনা যায়। নচেৎ গোটা কান থাকা সত্ত্বেও কানের বায়ু কর্মহীন হওয়ায় বধির রূপে গণ্য হয়। এইভাবে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয়, রিপু সকলেই বায়ুদ্বারা পরিচালিত। এমনকি মনও বায়বী শক্তি দ্বারা পরিচালিত। যেমন কোনো কারণে মনে খুব আনন্দ হোলো, অমনি জীব আনন্দিত হোলো। যে কার্য্যকারণের দ্বারা মনে আনন্দ অনুভব হোলো, সেই কার্য্যকারণের মাধ্যমে কি আনন্দরূপী কোনো বস্তু শরীরের ভেতরে প্রবেশ করল? তাতো নয় তাহলে আনন্দরূপী অবস্থাটা ভেতরেই ছিল সুপ্তাবস্থায়। ওই কার্য্যকারণের মাধ্যমে মনের ভেতর এক ঘর্ষণ ক্রিয়া হওয়ায় যে বায়ুর দ্বারায় আনন্দ অবস্থা উদিত হয়, সেই বায়ু, যা স্তিমিত ছিল তা কার্য্যকরী হওয়ায় আনন্দরূপী অবস্থাটা উদিত হল। আবার কিছুক্ষণ পর ওই বায়ু কর্মহীন হওয়ায় অপর

কোনো কার্য্যকারণের মাধ্যমে যে বায়ুর দ্বারা দুঃখ উৎপন্ন হয় সেই বায়ু চালু হল। তখনই মনে দুঃখরূপী অবস্থার উদয় হোলো এবং জীব দুঃখিত হোলো। এইভাবে দেখা যায় যখন যে বায়ুর প্রকোপ অধিক হয় জীব তখন সেই বায়ুর অধীনে চলে যায় ও তার অধীনস্থ হয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়। লোভ, ক্রোধ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা ইত্যাদি সবই এই বায়বী শক্তি দ্বারা পরিচালিত। যেমন সন্তান কোনো ভাল কাজ করলে মা আনন্দিত হন, আবার ওই সন্তানই মন্দ কাজ করলে মা দুঃখিত হন। তাহলে সন্তানের কাজের মাধ্যমে মায়ের মনে যে ঘর্ষণ ক্রিয়া হোলো এবং তাতে মায়ের মনে যখন যে বায়ু কার্য্যকরী রূপ নিলো, মায়ের মনে তখন সেই অবস্থার উদয় হোলো। ভক্তিও এই প্রকার বায়বী শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। চোখের জলের মাধ্যমে যে ভক্তির উদয় হয় তাও এই বায়বী শক্তি দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় কখনই স্থায়ী ভক্তিরূপে বা শুদ্ধাভক্তিরূপে গণ্য হতে পারে না। কারণ যে বায়ু কোনো কারণে কর্মক্ষম হওয়ায় চোখ হতে জল গড়িয়ে আসে, সেই বায়ু যতক্ষণ কর্মক্ষম থাকবে ততক্ষণই জল গড়াবে, কিন্তু যখন ওই বায়ু স্তিমিত হবে তখন জল গড়াবে না। অতএব সুখ, দুঃখ, প্রেম, ভক্তি ইত্যাদি সবই উনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে এক এক বায়ুর দ্বারা পরিচালিত হয় এবং যতক্ষণ সেই বায়ু কর্মক্ষম থাকে ততক্ষণই এদের অস্তিত্ব। এরা সবাই দেহের ভেতরে আছে কিন্তু কখনও সুপ্ত কখনও জাগ্রত অবস্থায়।

যোগিরাজের মতে যে ভক্তি স্থায়ী তাই শুদ্ধাভক্তি। এই স্থায়ী ভক্তিলাভ প্রাণকর্মসাপেক্ষ। কর্মছাড়া যখন কিছুই লাভ হয় না তখন কর্মছাড়া স্থায়ীভক্তি বা শুদ্ধাভক্তি লাভও সম্ভব নয়। সেই কর্ম হোলো প্রাণকর্ম। এই প্রাণকর্ম করতে থাকলে ক্রমে ক্রমে উনপঞ্চাশ বায়ু স্তিমিত হতে হতে যতই মুখ্য প্রাণবায়ুর দিকে মিলিত হতে থাকে এবং যখন প্রায় সেই একে মিলিত হবার উপক্রম হয় এই অবস্থায় যখন প্রাণকর্মে অধিক জোর পরে তখন আপনাহতেই দাঁতে দাঁত লেগে যায, কারণ চোয়ালের বায়ু থেমে যায়, ঠোঁটের বায়ু থেমে যাওয়ায় কম্পনরহিত হয় ও ঠোঁটে ঠোঁট বসে যায়। কণ্ঠের বায়ুপ্রাণায়ামের চাপে পড়ে থেমে যাওয়ায় নিলকণ্ঠ অবস্থা হয়, তখন বাকরহিত অবস্থা হয়। এই অবস্থাগুলি প্রাপ্তে শরীর নিশ্চল হয় ও কূটস্থে স্থায়ী স্থিতি হওয়ায় স্বানুভব হয়। স্ব যুক্ত অনুভব=স্বানুভব। স্ব অর্থে নিজে। দেহ বিনাশী, কিন্তু দেহী অবিনাশী। এই দেহিই যে আমি এই প্রকার জ্ঞানের অনুভবকেই স্বানুভব বলে। যোগিরাজ বলছেন এই প্রকার স্বানুভব যে অবস্থায় উদয় হয় সেই অবস্থাটার নামই ভক্তি অর্থাৎ এই প্রকার স্বানুভব অবস্থাকেই ভক্তি বলে। এই প্রকার ভক্তি আরো দৃঢ় হলে সত্যকার জ্ঞানের উদয় হয় এবং সেই জ্ঞান দৃঢ় হলে জ্ঞানেই পরিসমাপ্তি হয় অর্থাৎ ব্রহ্মের সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু এই প্রকার

স্বানুভব অবস্থালাভের পূর্বে যেগুলিকে তোমরা ভক্তি বল তা মোটেও ভক্তি নয়, সেগুলি অস্থায়ী হওয়ায় এক একটি ভাববিশেষ।

"ওঁ জ্যোতরূপ—এহি জ্যোত শরীরমে ব্যাপক হো জায়গা তব সব দেখেগা আউর বোলনেকা তবিয়ত ন চাহেনেপর" ॥ ৪৪ ॥

শূন্য ব্রহ্ম সর্বত্র বর্তমান। যিনি ব্রহ্ম তিনিই আত্মসত্তা আবার তিনিই প্রাণসত্তারূপে সকল জীবদেহে এবং সর্বভূতে সমানভাবে অবস্থিত। একই প্রাণসত্তা সবকিছুতে থাকা সত্ত্বেও সবকিছুর সঙ্গে আমরা নিজেকে যুক্তাবস্থা দেখি না। সবকিছুর সঙ্গে নিজেকে পৃথক বলে মনে হয়, অথচ একই প্রাণসত্তা আমার ভেতর এবং সবকিছুর ভেতর বর্তমান। কিন্তু প্রাণে প্রাণে যুক্তাবস্থা বোঝা যায় না। কেন এমন পৃথক অবস্থা হোলো? এর মূল কারণ একই প্রাণসত্তা সর্বত্র থাকা সত্ত্বেও তরঙ্গের পার্থক্য অনুসারে আলাদা বলে মনে হয়। তাই একই প্রাণসত্তায় যুক্ত থাকা সত্ত্বেও অপর বস্তুর যে গুণাগুণ, কর্মক্ষমতা ইত্যাদি জানা যায় না। তাহলে যোগিগণ অপর বস্তুর গুণাগুণ, কর্মক্ষমতা ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে কখন জানতে সক্ষম হন? যোগী যখন প্রাণকর্মের দ্বারা নিজ দেহস্থ প্রাণসত্তাকে নিশ্চল বা তরঙ্গহীন করতে পারেন তখনই অপর বস্তুর ভেতর যে একই প্রাণসত্তা বিরাজমান এবং তার গুণাগুণ জানতে পারেন। কারণ তখন যোগী স্থিরত্বলাভ করায়, তরঙ্গহীন হওয়ায় অপর বস্তুর মধ্যেও যে স্থিরত্ব বর্তমান তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। এই দেহই ওঁকার। যোগী প্রাণকর্ম করতে করতে আত্মজ্যোতি দর্শনে যখন তন্ময় হন তখন এই দেহবোধ তিরোহিত হয়ে এই দেহই আত্মজ্যোতিতে রূপান্তর হয়। তখন এই দেহ, আমি এবং আত্মজ্যোতি মিলে মিশে একাকার হয়ে আত্মজ্যোতিই হয়ে যায়। এ অবস্থায় আত্মজ্যোতি ছাড়া আর কোনো পৃথক সত্তা থাকে না তখন যোগী সর্বত্র একই আত্মসত্তা দেখেন এবং সকল বস্তুর গুণাগুণ জানতে পারেন। যেমন একটা গাছের পাতা। পাতাটি কি কি বস্তু দ্বারা রচিত, কোন্ গুণাগুণ কতখানি পরিমাণে তার ভেতর অবস্থিত, ওই পাতাটির দ্বারা জীবের কি কি কল্যাণ সাধিত হতে পারে ইত্যাদি সবই তিনি তখন জানতে পারেন। তাই যোগীকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ বৈদ্য (চিকিৎসক)। যোগী সর্বত্র একই প্রাণসত্তাকে দেখেন বলে সম্পূর্ণরূপে জীবকল্যাণে তিনিই সমর্থ। যোগী ব্যতীত আর সকলেরই আংশিক, খণ্ড বা দ্বৈতজ্ঞান থাকায়, তা তিনি যত বড় মহান্ ব্যক্তিই হোন না কেন, আংশিকভাবে, সাময়িকভাবে জীবকল্যাণ করতে পারেন। সেই মহান্ ব্যক্তির সর্বত্র

একই প্রাণসত্তা বিরাজমান, এই অখণ্ডজ্ঞান না থাকায় জীবের প্রকৃত কল্যাণ করতে সমর্থ নন। তাই যোগিরাজ বলছেন—ওঁকাররূপী এই আত্মজ্যোতি সর্বশরীরে ব্যক্ত হয়ে পরিপূর্ণ অবস্থালাভ হলে অর্থাৎ যখন 'সর্বং প্রাণময়ং জগৎ' অবস্থালাভ হয় তখন দূর-নিকটের সকল বস্তু দেখা যায় এবং তার সকল প্রকার গুণাগুণ জানা যায়। এই অবস্থায় যদিও ইচ্ছার নাশ হয়ে যায়, ইচ্ছা থাকে না, গলে যায় তথাপি অপর বস্তুর বিষয়ে সব কিছু বলা যায়। যেমন অপর মানুষের মনের মধ্যে কোন ইচ্ছার উদয় হয়েছে, সে কি বলতে চায়, তার ভেতরের প্রতিটি তরঙ্গ তখন যোগী জানতে পারেন। এমন কি সে ব্যক্তি যত দূরেই থাকুক না কেন তার সঙ্গে প্রাণের যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ায় তারও মঙ্গল করা সম্ভব। তাই দেখা যায় মহান্ মহান্ যোগিগণ কত অলৌকিক খেলা দেখাতে পারেন। কিন্তু তাঁরা এদিকে পারতপক্ষে দৃষ্টি দেন না। কারণ তাঁরা জানেন, এদিকে দৃষ্টি দিলেই আর অসীমের সঙ্গে মেশা যাবে না, উৎসস্থলে পৌঁছোনো যাবে না। তাই তাঁরা এই অলৌকিক দিকটাকে সাধারণতঃ এড়িয়ে চলেন।

জগতের সকল বস্তুই মূল পাঁচতত্ত্ব (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) হতে জাত এবং সকল বস্তুতে ওই পাঁচতত্ত্ব বর্তমান। এই মানব দেহতেও পাঁচ চক্রে ওই পাঁচতত্ত্ব অবস্থিত। মূলাধারে ক্ষিতিতত্ত্ব, সাধিষ্ঠানে জলতত্ত্ব, মণিপুরে তেজস্তত্ত্ব, অনাহতে বায়ুতত্ত্ব, কণ্ঠে ব্যোমতত্ত্ব এবং তার ঊর্ধ্বে তত্ত্বাতীত। যোগী যখন মূলাধার হতে ক্রমান্বয়ে পাঁচ চক্রকে অতিক্রম করে আজ্ঞাচক্রে অবস্থান করেন, তখন তিনি নিম্নোক্ত পাঁচ চক্রের সকল প্রকার গুণাগুণ অর্থাৎ পঞ্চভূতের সকল গুণকে জানতে সমর্থ হন। এরপরেই যোগী আত্মজ্যোতিতে মিলে মিশে যাওয়ায় সকল গুণ ও শক্তির অধিকারী হন। এই প্রকার যোগী অনন্ত শক্তির অধিকারী হওয়ায় যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। সকল শক্তির উৎসই হোলো মহাপ্রাণ। যোগী যখন খণ্ড প্রাণকে অখণ্ড প্রাণে বা মহাপ্রাণে মিলিয়ে দিতে পারেন তখন তিনিও মহাশক্তিধর। যেমন জল যতক্ষণ পাত্রের মধ্যে ততক্ষণ তার শক্তি সীমিত। কিন্তু সেই জল যখন সমুদ্রে মিশে যায় তখন তার অনন্ত শক্তি হয়। যোগীরও এই অবস্থা হয়।

"মুক্ত যে পুনর্ব্বার ক্রিয়ার পর অবস্থার পর থাকিয়াও মুক্ত কারণ তাঁহার পুনরাবৃত্তি হুইতে থাকে না, সকলেতেই ব্রহ্ম দেখে ব্রহ্মে আটকিয়া বিনা প্রয়াসে থাকে। ইহা না হইলে অপুরুষার্থ" ॥ ৪৫ ॥

মুক্তি চাই মুক্তি চাই সবাই বলে। কিন্তু মুক্তিটা যে কি সে সম্বন্ধে সঠিক ধারণা খুব কম মানুষেরই আছে। মুক্তাবস্থা কাকে বলে এটা জানতে গেলে প্রথমে জানা দরকার বন্ধনটা কি। বন্ধনটাই জীবের বর্তমান অস্তিত্ব, তাই বর্তমান অস্তিত্বকে না জেনে পরবর্তী অস্তিত্বকে সরাসরি জানতে যাওয়া বৃথা। প্রত্যেক জীবই যেন খাঁচার পাখী। সকলেই যেন একটা অবস্থার ফেরে পড়ে আটকে আছে, কেউই আর সেই অবস্থার বা আপন গণ্ডীর বাইরে যেতে পারছে না। ঠিক যেমন একটা খাঁচার ভেতর অনেক পাখী আটক আছে। সকলেই চায় কেমন করে বাইরে যাবো এবং অসীম নীলাকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়াব। বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য পাখীগুলো সদাই সুযোগ সন্ধানে থাকে। তা'র মধ্য থেকে কোন একটা পাখী সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারায় বেরিয়ে এসে নিজে মুক্তাবস্থা লাভ করে অনন্তে উড়ে বেড়ায় এবং অবশিষ্ট পাখীগুলোকে বলে তোমরাও সুযোগের সদ্ব্যবহার করো। তখন ওই মুক্ত পাখীটা অবশিষ্ট পাখীগুলোর বন্ধনদশা ঘোচাবার জন্য কাতর হয়। এরকম মনুষ্য সমাজে যিনি মুক্ত হতে পেরেছেন তিনিও অবশিষ্ট মানুষদের বন্ধনদশা ঘোচাবার জন্য কাতর হন। তাই তিনি সদাই চেষ্টা করেন, উপদেশ দেন কেমন করে তারা মুক্ত হতে পারে। কারণ মুক্তাবস্থার যে আনন্দ তা তিনি লাভ করায় অপরের দুঃখে কাতর হন।

তাহলে জীবের বন্ধন অবস্থাটা কী? বন্ধন অবস্থা হোলো জীবের বর্তমান চঞ্চল অবস্থা। চঞ্চল অবস্থায় থাকার দরুন সে কিছুতেই গুণাতীত হতে পারে না। এই চঞ্চল অবস্থাই তাকে আরো বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, রিপু, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার ইত্যাদির দ্বারা অক্টোপাসের মতো আরো দৃঢ়ভাবে আটকে রাখে এবং জগতের রূপ, রস, গন্ধের দ্বারা মোহিত করে রাখে। এই অবস্থাগুলোর বিষয়ে জীবের সঠিক জ্ঞান না থাকায় এরা যে কত বড় শত্রু ও ছলনাকারী তা বুঝতে পারে না এবং না পারায় এদেরই দ্বারা পরিচালিত হয়। তাই বেশীর ভাগ মানুষ মুক্তাবস্থা লাভের চেষ্টাই করে না। হঠাৎ যদি কোনো মানুষের মধ্যে কখনও সেই স্পৃহা জাগে তবে তার আন্তরিকতা ও চেষ্টার অভাব থাকায় বেশীরভাগই সফসকাম হতে পারে না। যার চেষ্টার ত্রুটি নেই, যে সদাই এই মায়াজালের বাইরে যেতে চায়, যার কাছে এই

মায়াজাল বিষবৎ মনে হয়, আর ভালো লাগে না, সেই ব্যাক্তিই মুক্তাবস্থা লাভ করতে পারে। সে ব্যাক্তি সংসারেই থাকুক অথবা যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তার চেষ্টার অভাব কখনও হবে না এবং মুক্ত হবেই। তাহলে মুক্তাবস্থা হোলো ওই চঞ্চলতার অতীতে চলে গিয়ে নিশ্চল হওয়া। তাই চঞ্চলতাই বন্ধন, স্থিরত্বই মুক্ত। তাই যোগিরাজ বলছেন—তোমার এই চঞ্চলতায় থাকার দরুন সকল প্রকার কর্ম আছে। কিন্তু ক্রিয়া করতে করতে যখন সকল প্রকার কর্মের অতীতে চলে যাবে, যখন সম্পূর্ণরূপে নিশ্চল অবস্থা লাভ করবে তখন তুমি নিশ্চয় মুক্ত হবে। কারণ তখন তুমি সব কিছুতেই ব্রহ্ম দেখে বিনা প্রয়াসে ওই স্থিরঘরে কূটস্থে সদাই আটকিয়ে থাকতে পারবে। তখন তোমাকে আর যেহেতু পুনরায় চঞ্চলাবস্থায় ফিরে আসতে হবে না অতএব আর তোমায় দ্বৈতাবস্থায় অবতরণ করতে হবে না। এক স্থিরঘরে থাকার দরুন আর দ্বৈতাবস্থা থাকবে না, কারণ দ্বৈতাবস্থায় অবতরণ করলেই দুঃখ। এই প্রকার স্থির ঘরে কূটস্থে আটকিয়ে থাকাটাই পুরুষার্থ এবং না থাকাটাই অপুরুষার্থ।

“মরণে গুরু যো জয়সা ভাওএ সোই ওয়সা হোয়।
আপ সৎ চিত্তানন্দ হয় আপরূপ হয়”॥ ৪৬ ॥

কথিত আছে ভরত রাজা অন্তিম মুহূর্তে তাঁর অসহায় পালিত হরিণ শিশুটির কি দশা হবে এই চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করেছিলেন। তাই তিনি পরবর্তী জন্মে হরিণ হয়ে জন্মেছিলেন। এখানে যোগিরাজও সে কথাই বলছেন দেহত্যাগ করবার সময় যে যা চিন্তা করে পরবর্তী জীবনে সে তাই হয়।

সমুদ্রের তরঙ্গের যেমন শেষ নেই, চিন্তারও তেমনি শেষ নেই। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি সদাই চঞ্চল থাকায় মন চঞ্চল হয় এবং মন চঞ্চল বলেই একের পর এক চিন্তারূপ তরঙ্গ চলতে থাকে। মন হোলো সকল ইন্দ্রিয়ের অধিপতি, তাই চিন্তা মনের অধীনে কাজ করে। মন চঞ্চল বলেই চিন্তা কখনও কোনো একটা বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকে না। সে সদাই নূতন নূতন চিন্তায় ব্যস্ত। চিন্তা ও ভাবনা প্রায় একই কথা। জীব শরীরে চিন্তা সর্বদাই আছে, এমনকি দেহত্যাগের সময়েও এই চিন্তা থাকে। চিন্তা একটা বায়ুপ্রবাহ। যে বায়ুর দ্বারা চিন্তা উৎপন্ন হয় সেই বায়ু জীব শরীরে সদাই চঞ্চল, তাই চিন্তাও সদাই বর্তমান। আবার ওই বায়ুকে প্রাণকর্মের দ্বারা যদি রোধ করা যায় তাহলেই চিন্তামণি অবস্থা লাভ হয়। ওই চিন্তামণি অবস্থাটা

যে কি তা জীবের জানা না থাকায় জীব সদাই চিন্তাযুক্ত। আর চিন্তাযুক্ত বলেই প্রকৃতপক্ষে সে যে সৎ চিত্তানন্দ ও নিজরূপ এটা জানে না।

গীতার অষ্টম অধ্যায়ের দশ থেকে তেরো শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলেছেন—প্রয়াণকালে স্থিরচিত্তে ভক্তিযুক্ত হয়ে যোগবল দ্বারা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণকে ধারণপূর্বক যিনি স্মরণ করেন তিনি সেই দিব্য পরমাত্মস্বরূপ পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন। সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বার সংযত করে, বাহ্য বিষয় গ্রহণ না করে, মনকে নিরালম্বে স্থির করে, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণকে সম্পূর্ণরূপে স্থাপন করে একাক্ষর ব্রহ্মনামরূপ ওঁকার ক্রিয়া করতে করতে আমাকে (কূটস্থকে) স্মরণপূর্বক যিনি দেহত্যাগ করেন তিনি পরমগতি লাভ করেন। তাহলে এটা বোঝা গেল যে মন বা চিন্তার দ্বারায় চিন্তারূপ তরঙ্গকে রোধ করা বা চিন্তাশূন্য হওয়া যায় না। যদিও কাঁটা দিয়েই কাঁটাকে তুলতে হয় ঠিকই কিন্তু তাই বলে চিন্তা বা মনন শক্তির দ্বারা চিন্তাশূন্য বা মনোশূন্য হওয়া সম্ভব নয়। তাই চিন্তা বা মনের উৎসস্থল যে প্রাণের তরঙ্গ যা অন্তর্মুখী শ্বাস-প্রশ্বাস গতিরূপে সদাই জীবদেহে বর্তমান তাকে ধরেই অর্থাৎ অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করেই চিন্তাশূন্য বা মনোশূন্য অবস্থা লাভ করা সম্ভব। প্রাণকর্মের দ্বারা জীবিতাবস্থাতেই যদি মনোশূন্য বা চিন্তাশূন্য অবস্থা লাভ করা না যায় তাহলে চঞ্চল গতির স্বাভাবিক কর্ম অনুসারে দেহত্যাগ সময়ে মনে নানা চিন্তা উদিত হবে, রোধ করবার কোনো উপায় থাকবে না। আমিই যে সৎ চিত্তানন্দ এটা মনে রেখে এই দেহেই দেহত্যাগের পূর্বে যদি ওই স্থিরাবস্থার উপলব্ধি হয় তাহলে দেহত্যাগ সময়ে মনোশূন্য অবস্থায় কূটস্থে দৃষ্টি স্থির রেখে দেহত্যাগ করা যায় এবং তখন এই প্রকার যোগীকে চিন্তারূপ তরঙ্গ আক্রমণ করতে পারে না এবং তখন স্থিরত্বের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায়, সমস্ত প্রকার প্রবাহের অতীতে যাওয়ায় অগতিরূপ যে পরম গতি তা প্রাপ্ত হয়, একথাই যোগিরাজ বলেছেন। মূলতঃ তুমি যে স্থির, বর্তমানে হয়ে আছো চঞ্চল, এটাই তোমার মূল থেকে অর্থাৎ আদি অবস্থা থেকে বিচ্যুত অবস্থা তা তুমি ভুলে গেছো। তাই তোমার কর্তব্য হোলো তোমার উৎসস্থলরূপ মূলরূপী স্থিরঘরে, যেখান থেকে এসেছিলে চঞ্চল হয়ে সেখানেই ফিরে যাওয়া। যতক্ষণ চঞ্চলতায় ছিলে ততক্ষণ তোমার কাছে চিন্তা, ভাবনা, মন ইত্যাদি সবই ছিলো। কিন্তু যখন তুমি স্থির ঘরে এলে, যখন নিজেই নিজেতে ফিরে এলে তখন কেবল তুমিই থাকলে আর কেউ নেই। এই তুমিটাই সঠিক তুমি, শাশ্বত তুমি, নির্মল ও একমাত্র তুমি। তখন তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। তোমার এই তুমিকে জানাই পরমপুরুষার্থ।

"সেওয়ায় ভগবানকো জো কোই কাম করে সো বড়া খরাব আদমি হয়—সব মন লুট জায় পর উসপর নজর ন করে— জো ভগবানকো হামেসা ধ্যান করে উসকো কাম উহ করতা হ্যায়" ॥ ৪৭ ॥

সবাই ভাবে এই দেহটাই আমি। কি করলে আমার সুখ হবে, আমার ভাল হবে, আমি ভাল থাকব এইভাবে সকলেই এই দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দের দিকে ব্যস্ত। কিন্তু এটা কেউ ভাবে না যে এই দেহের পরেও আর এক আমি আছি, যে আমি সত্য আমি, অবিনাশী আমি। খুব কম মানুষই যার এই 'সত্য আমির' দিকে লক্ষ্য আছে, সত্য আমিকে জানতে চায়। এই সত্য আমিকে না জানতে চেয়ে দেহগত 'মিথ্যা আমির' দিকে যে সকলের টান বর্তমান তার একটা কারণও আছে। তার কারণ হোলো জীবের বর্তমানে প্রাণের যে চঞ্চল অবস্থা। জীব বর্তমানে প্রাণের চঞ্চল অবস্থায় থাকার দরুন, চঞ্চলতার ফেরে পড়ে মিথ্যা আমিতে থাকতে বাধ্য হয়। যেমন গরম বস্তুতে মিথ্যা অগ্নি বোধ হয়। এই মিথ্যা আমিকে কাটিয়ে উঠে সত্য আমিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে চেষ্টা করতে হবে কি উপায়ে প্রাণের চঞ্চলতা রহিত হয়। এই চঞ্চলতায় থাকায় জীবের দেহবোধ বর্তমান থাকে এবং এই বিনাশী দেহের সকল প্রকার কর্ম চালু থাকায় ইন্দ্রিয় ও রিপুগণও কার্যকরী থাকে। তাই জীব সদাই দেহের সেবায় ব্যস্ত এবং দেহকেই আমি বলে মনে করে। এই দেহের সেবার জন্য জীব যত প্রকার কর্ম করে যোগীর কাছে সে সবই অকর্মরূপে গণ্য। দেহের ভেতরে যিনি দেহীরূপে আছেন সেই দেহীই প্রকৃত আমি, ঈশ্বর আমি। সেই দেহীর সেবা না করে যদি কেউ দেহের সেবায় ব্যস্ত থাকে তবে সে লোক কখনই ভালো হতে পারে না একথাই যোগিরাজ বলেছেন। তাঁর একথা বলার উদ্দেশ্য হোলো যে হে প্রিয় মানুষ তোমরা জন্ম জন্ম ধরে দেহের সেবা অনেক করেছো, এবার তোমরা দেহীর সেবা করো, নিজের সেবা করো। যা করলে তোমার সঠিক মঙ্গল হবে, ভবরোগ ঘুচে যাবে। এই দেহ পঞ্চভূতের দ্বারা তৈরী। তুমিই তোমার এই দেহরূপ মন্দির রচনা করে তারই ভেতর তুমি অবস্থান করছ। সেকথা ভুলে গিয়ে তুমি তোমার এই অনিত্য অবস্থান স্থলটাকেই তুমি বলে ভাবছ। চঞ্চলতাই মহামায়া, সেই মহামায়া তোমাকে গ্রাস করায় এই ভুল তোমার হয়েছে। আকাশের চাঁদ একটাই, তরঙ্গায়িত জলে যেমন বহু দেখায় তেমনি তুমিও কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদির ফেরে পড়ে বহু হয়েছ, কারণ এরা তোমায় যখন যেভাবে চালায় তুমি সেভাবেই চলো, তাই তুমি এক হওয়া সত্ত্বেও বহুরূপে দুলছ। এই

দোলায়মান অবস্থাকে থামাবার জন্য যে কর্ম (প্রাণকর্ম) তাই তোমার সঠিক কাজ, তোমার নিজের সেবা, ঈশ্বর সেবা। এই সেবা না করে যদি তুমি অন্য কর্ম করো, সব সময় দেহের সেবায় ব্যস্ত থাকো তাহলে তুমি কখনই ভাল লোক হতে পারবে না। কারণ দেহের কর্ম কখনই ভাল কর্মরূপে গণ্য হয় না, দেহীর কর্মই প্রকৃত ভাল কর্ম। এই দেহীর কর্ম দ্বারাই অর্থাৎ যা তোমার নিজের কর্ম তার দ্বারাই তুমি নিত্যে বা নিজেতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। কিন্তু দেহের কর্ম দ্বারায় কখনই পারবে না। তাই যে ব্যক্তি নিজের কর্ম (প্রাণকর্ম) বাদ দিয়ে দেহের কর্মে ব্যস্ত সে কখনই ভালো লোক হতে পারে না। এই প্রকারে নিজের কর্ম করতে করতে যখন বর্তমান চঞ্চল মনের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে চলে যায়, মনেতে মন অবস্থান করে, মন্মনা অবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যখন বর্তমান চঞ্চল মনের দিকে আর বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই—প্রাণকর্ম করতে করতে যখন এই রকম উন্মনী অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন কোনোদিকে এমনকি দেহের দিকেও খেয়াল না থাকায় প্রকৃত ধ্যানাবস্থা হয়। এই প্রকার উন্মনী ধ্যানাবস্থা যিনি সর্বদা ভগবানে লাগিয়ে রেখেছেন অর্থাৎ যিনি সর্বদা কূটস্থে আটকিয়ে আছেন তাঁর সকল কর্ম তখন ঈশ্বরই করে থাকেন, তাঁকে আর কিছুই করতে হয় না। তখন তাঁর আর কোনো কর্ম থাকে না, তাঁর সকল কর্ম তখন শেষ হয়। এই অবস্থায় যোগী নিজেই নিজেতে থাকায় সকল কর্ম আপনা হতেই হয়। তখন সঙ্কল্প বিকল্পের নাশ হওয়ায় কোনো প্রকার চেষ্টা থাকে না, তাই তাঁকে চেষ্টা করে আর কিছুই করতে হয় না। এ এক অদ্ভুত অবস্থা, যাঁর হয় তিনিই জানেন।

সাধারণ মানুষ জীবে দয়া বা জীব সেবা বলতে মনে করে দীন দুঃখী আতুরের সেবা করা, ক্ষুধার্তকে অন্ন দেওয়া ইত্যাদি। এভাবে যে প্রকৃত ঈশ্বরের বা নিজের সেবা হয় না, এ জ্ঞান না থাকায় তারা এসব কাজ করে থাকে। এই প্রকারের জীবসেবা কখনই নিষ্কাম হতে পারে না তাই তাদের মধ্যে অহংভাব আপনা হতেই আসে এবং আসতে বাধ্য। আমি কত সেবাপরায়ণ, আমার এই সেবার জন্য সমাজ আমাকে মান্য করে ইত্যাদি বোধগুলি আপনা হতেই মনের মধ্যে উকিঝুঁকি দেয় এবং দিতে বাধ্য। তবে এটা ঠিক যে এই প্রকার সেবার দ্বারায় সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয় এবং করাও উচিত। কিন্তু এই প্রকারে জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করলে ঈশ্বর সেবা কখনই সম্ভব নয়। কারণ দেহটাতো আর ঈশ্বর হতে পারে না। ক্ষুধা, রোগ, অভাব এগুলি দেহের ধর্ম, দেহীর ধর্ম নয়। তাই দেহের সেবা করলে দেহীর সেবা কখনই হয় না। যেমন জীর্ণ মন্দিরের সংস্কার করলে মন্দিরস্থ দেব-দেবীর সেবা হয় না। তবে শাস্ত্রে যখন আছে জীবে দয়া করলে

ঈশ্বর সেবা হয় তা কখনই ভুল হতে পারে না। এখানে বুঝতে হবে জীব কাকে বলে, তাকে দয়া করাটাই বা কি এবং যে দয়া করলে ঈশ্বর সেবা হয় এই তিনটে জিনিস যদি জানা যায় তবেই সঠিক কর্ম সম্ভব। প্রাণের চঞ্চল অবস্থাকেই জীবন বলে। এই জীবন যতক্ষণ বর্তমান ততক্ষণই সে জীবরূপে গণ্য। যখন প্রাণ চঞ্চলহীন তখন জীবনও নেই জীবও নেই। তাহলে জীবে দয়া বলতে প্রাণের ওই চঞ্চল অবস্থার প্রতি দয়া প্রদর্শন করা, যা করলে প্রাণের চঞ্চল অবস্থা রহিত হয়ে স্থির হবে এবং নিজস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। এই কর্মটা হোলো প্রাণকর্ম এবং এই একমাত্র প্রাণকর্মের দ্বারাই জীবভাব বা জীব অবস্থার প্রতি দয়া বা সেবা করা যায়। আর এই প্রকার সেবা করলে অর্থাৎ একমাত্র প্রাণকর্ম করলে তবেই ঈশ্বর সেবা হয়। এই সেবা সকলের করা উচিত। তাই যোগিরাজ বলছেন এই প্রাণকর্মরূপ সেবা ব্যতিরেকে আর যতপ্রকার সেবা বা কর্ম করনা কেন তা কখনই ঈশ্বর সেবা না হয়ে দেহের সেবাই হবে এবং এই প্রকারে দেহের সেবা যে করে সে কখনই ভাল লোক হতে পারে না, কারণ সে সদাই চঞ্চলতায় অবস্থান করে। স্থিরত্বই হলেন ঈশ্বর এবং তিনিই প্রকৃত ভাল আর ওই স্থিরত্ব ব্যতিরেকে সব কিছুই মন্দ। তাই স্থিরত্বে যাতে পৌঁছোনো যায় তার সেবা না করে যে ব্যক্তি সদাই চঞ্চলতার সেবায় ব্যস্ত সে সর্বদাই মন্দের সেবায় রত, একথা নিশ্চয় জেনো। অতএব স্থিরত্বের সেবা করো, স্থিরত্বে যাতে পৌঁছোতে পারো তার চেষ্টা বার বার করো, হতাশ হয়ো না, এটাই তোমার মনুষ্য জীবনের একমাত্র কাজ।

"জ্যোতকে ভিতর নিলা নিলাকে ভিতর এক সফেদ
বিন্দি দেখা উসকে ভিতর আদমি ওহি বহুত
কিসম কে হিন্দু ইংরেজ হোতা হয়" ॥ ৪৮ ॥

হিন্দু, খ্রীষ্ট, ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদি বহু প্রকার ধর্ম আমাদের এই পৃথিবীতে আছে এবং সেই সব ধর্মের অনুগত যে সব মানুষ তাদের হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মীয় বলা হয়। এসব ধর্মগুলোকে উপলক্ষ্য করে নানাজাতি গড়ে উঠেছে। এসব ধর্মগুলো কোনো না কোনো মহাপুরুষ স্থাপন করে গেছেন অতএব এদের উৎপত্তিকাল পাওয়া যায়। কিন্তু যাকে আমরা হিন্দু ধর্ম বলি আসলে সেটা কিন্তু হিন্দু ধর্ম নয়, আসলে এই ধর্ম হোলো বৈদান্তিক। প্রত্যেক ধর্মের একটা করে প্রধান শাস্ত্র গ্রন্থ আছে। খ্রীষ্ট ধর্মে বাইবেল, ইসলাম ধর্মে কোরাণ,

বৌদ্ধ ধর্মে ত্রিপিটক, হিন্দু ধর্মে বা বৈদান্তিক ধর্মে বেদ। সকল ধর্মের স্থাপিত কাল যেমন পাওয়া যায় তেমনি সেইসব ধর্মের প্রধান শাস্ত্র গ্রন্থের রচনাকালও পাওয়া যায়। কিন্তু বেদভিত্তিক যে বৈদান্তিক ধর্ম সেই বেদের রচনাকাল পাওয়া যায় না। বরং বলা হয়েছে বেদ অপৌরুষেয়, এর কখনো বিনাশ নেই। বেদ অর্থে জ্ঞান, জ্ঞানের কখনো বিনাশ হতে পারে না। এমনকি এই পৃথিবীর বিনাশ হলেও পুনঃসৃষ্টিতে এই বেদ জ্ঞানের পুনরাবির্ভাব হয়। তাই বেদ অপৌরুষেয়। যীশুখ্রীষ্ট হতে খ্রীষ্টধর্ম, হজরত মহম্মদ হতে মুসলিম ধর্ম, বুদ্ধদেব হতে বৌদ্ধধর্ম এভাবে সকল ধর্মেরই স্থাপয়িতা পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে আরো অনেক মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়ে সেসব ধর্মগুলোকে সমৃদ্ধশালী করেছেন। বৈদান্তিক ধর্মে যেমন কাল নিরূপণ করা যায় না তেমনি এর স্থাপয়িতা পাওয়া যায় না। বেদ গ্রন্থাকারে হওয়ার পূর্বেও এই বেদ ছিলো শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতিরূপে। তাই বেদজ্ঞান হোলো চরম সত্যকে বা পরিণামসত্যকে জানা। অতএব সেই পরিণাম সত্য (ব্রহ্ম) যেমন অবিনাশী, বেদও তেমনি অবিনাশী। ব্রহ্মের যেমন জন্ম নেই বেদেরও তেমনি জন্ম নেই। আবার জন্ম না থাকায় নাশও নেই। এই বেদ বা বৈদান্তিক ছাড়া আর যত প্রকার ধর্ম পৃথিবীতে প্রচলিত আছে সেগুলির যেহেতু আবির্ভাবকাল আছে অতএব তিরোভাব অবশ্যম্ভাবী। তাই দেখা যায় বৈদান্তিক ধর্ম ছাড়া আর সকল ধর্মের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রচার প্রয়োজন হয়। যা অবিনাশী শাশ্বত তার কখনো প্রচার প্রয়োজন হয় না। যেমন সূর্যের প্রচার নিষ্প্রয়োজন তেমনি বেদ জ্ঞানেরও প্রচার নিষ্প্রয়োজন। তাই এই সনাতন বৈদিক ধর্মের প্রচার কখনও দেখা যায় না। এই সনাতন বৈদিক ধর্ম হোলো মানব ধর্ম। তাই সনাতন ধর্মে কখনও জাতিভেদ দেখা যায় না। যা দেখা যায় তা হোলো গুণগত পার্থক্যের দরুন বর্ণভেদ। পরবর্তীকালের মানুষ সনাতন ধর্মের এই উচ্চ আদর্শ থেকে কালপ্রভাবে বিচ্যুত হয়ে গুণগত বর্ণভেদটাকেই জন্মগত অধিকার সূত্রে জাতিভেদরূপে পরিণত করেছে। মানব সভ্যতার জ্ঞানের এই অবনতির জন্য আজ দেশে এত হানাহানি। এরজন্য দায়ী পরবর্তীকালের মানুষের অপরিণত জ্ঞান। সনাতন বৈদিক ধর্ম অনুসারে জাতি একটাই, তা হোলো মানবজাতি এবং ধর্ম একটাই তা হোলো মানবধর্ম যাকে অধ্যাত্ম ধর্মও বলা হয়। এই অধ্যাত্ম ধর্মের উদ্দেশ্য হোলো এবং লক্ষ্য হোলো জীব যেখান থেকে এসেছে আবার সেখানে পৌঁছে যাওয়া। কেমন করে সেই উৎসস্থলে পৌঁছান যায় এটাই সনাতন বৈদান্তিক ধর্মের মূলকথা। এই সনাতন ধর্মের ঋষিরা সকলেই জানতেন যে জাতিভেদ প্রথা জন্মগত অধিকার সূত্রে স্থাপিত হলে ভবিষ্যতে মঙ্গলদায়ক হবে না, তাই তাঁরা প্রাণধর্মকেই মহাধর্ম বলেছেন যা পশু পাখী কীট

পতঙ্গ হতে সর্বজীবে বর্তমান। তাঁদের এই উদার দৃষ্টির মধ্যে সঙ্কীর্ণতার স্থান ছিলো না যা বর্তমানকালে অন্যান্য বহু ধর্মের মধ্যে দেখা যায়। তাই তাঁরা শিক্ষা দিয়েছেন গুণগত পার্থক্যগুলিকে আত্মসাধনার মাধ্যমে কাটিয়ে উঠে গুণাতীত নির্গুণ অবস্থায় একে স্থিতিলাভ করবার জন্য। তাঁদের এই মহান্ উদ্দেশ্যের মধ্যে সঙ্কীর্ণতার স্থান কোথায়? পরবর্তীকালে এই বিশাল পৃথিবীতে বহু সভ্য মানব সমাজ গঠিত হয়েছে এবং সেই সব সমাজে এক এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়ে মানুষকে জ্ঞানের আলো দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই সব মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরবর্তীকালের মানুষেরা এক এক ধর্ম স্থাপন করেছেন। সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও অধ্যাত্ম জ্ঞানের দ্বারা বিচার করলে দেখা যায় যে এগুলো কখনই আলাদা আলাদা ধর্ম হতে পারে না। কারণ এগুলো সবই এক একটা খণ্ড জ্ঞানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। যদিও ওইসব ধর্মের স্থাপয়িতা মহাপুরুষগণের উদ্দেশ্য ছিল সেই একক জানা এবং তাঁরা নিজেরা জেনে কৃতার্থ হয়েছেন বটে, তথাপি সেসব পথের পরবর্তীকালের অনুসরণকারীগণ সেই একে না থাকতে পারায় আলাদা আলাদা ধর্মরূপে গণ্য করেছেন। কাজেই আলাদা হলেই সঙ্কীর্ণতা আসে, ভেদাভেদ জাগে এবং তখন তাকে আর ধর্মরূপে গণ্য না করে সম্প্রদায়রূপে গণ্য করা উচিত। তাই এগুলোকে আর ধর্ম বলে মানা যায় না, এগুলো এখন সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে। এগুলো এখন সম্প্রদায় হওয়ায় সঙ্কীর্ণতার আবর্তে প্রথিত হওয়ায় সারা পৃথিবীর মানব সমাজে আজ এত হানাহানি। আজ এসব সম্প্রদায়ের উন্মাদগণ ভুলে গেছে যে তারা একই মনুষ্য জাতি এবং তাদের ধর্ম একটাই। যেখানে দুই সেখানেই দ্বন্দ্ব, কিন্তু যেখানে এক মনুষ্যধর্ম, প্রাণধর্ম তা দ্বন্দ্বাতীত। সেখানে দ্বন্দ্বের স্থান আসতে পারে না। এই ধর্ম শাশ্বত ধর্ম এবং সর্বজীবে এক ধর্ম। তাই ঋষিগণ কখনই ভেদাভেদের অবকাশ রাখেননি, এখানেই তাঁদের মহত্ত্বের পরিচয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম ঋষি শ্যামাচরণও তাঁর সাধনার মাধ্যমে এই উপলব্ধিই করেছেন। তিনি সাধনা করতে করতে আত্মজ্যোতিদর্শনে তন্ময়প্রাপ্ত হয়ে দেখলেন যে ওই আত্মজ্যোতির মধ্যে এক নীল অপরূপ জ্যোতি। আবার সেই নীল জ্যোতির মধ্যে আত্মসূর্যরূপী এক সাদা বিন্দু। তিনচক্র মধ্যস্থ এই বিন্দুই হোলো সকল জীবের উৎপত্তিস্থল ও গন্তব্যস্থল। এখান থেকেই সকল জীব স্বতন্ত্র প্রাপ্ত হয়ে চঞ্চলতার ফেরে পড়ে এসেছে আবার চঞ্চলতার অবসানে, স্বাতন্ত্র্যতার অবসানে এখানেই ফিরে যাবে। এই প্রকার স্বাতন্ত্র্যতা প্রাপ্ত হওয়ায় এবং চঞ্চলতার আবর্তে হাবুডুবু খাওয়ায় কেউ বলছে হিন্দু, কেউ বলছে খ্রীষ্টান, কেউ বলছে মুসলমান, কেউ বলছে বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি। আসলে এগুলো স্বাতন্ত্র্যতা প্রাপ্ত হওয়ায় কোনোটাই

ধর্মরূপে গণ্য নয়, কারণ সকলেরই মূল সেই এক চিরসুন্দর অবিচ্ছেদ্য প্রাণসত্তায় গ্রথিত। তাই বিভিন্ন ধর্মরূপে কিছুই দেখা যায় না। বিন্দুরূপী ওই যে মহাপুরুষ পুরুষোত্তম তিনিই নানাত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় হিন্দু খ্রীষ্টান মুসলমান বৌদ্ধ জৈন ইত্যাদি বহু হয়েছেন কিন্তু মূলে তিনি একই। এই একের জ্ঞান যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ সবই বৃথা, মনুষ্য জন্ম অপূর্ণ থেকে যায়। তাই দেখা যায় এই অন্যতম ঋষির মধ্যে নানাত্বের ভাব দূরীভূত হয়ে একে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন বলেই সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুগণ, বহু মুসলমান—যেমন আমির খাঁ, রহিমুল্লা খাঁ, আবদুল গফুর খাঁ প্রভৃতি বহু খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী সাহেব—যেমন হাজারীবাগের পুলিস সুপার স্পেন্সর সাহেব ইত্যাদি বহু ধর্মের ও বর্ণের মানুষ তাঁর চরণ আশ্রয় করেছিলো, শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলো। সর্ব ধর্ম সমন্বয় বলতে যদি কিছু থাকে তবে তা এই মহাপুরুষের জীবনে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়েছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, কারণ তিনি সম্পূর্ণরূপে অদ্বৈতে অর্থাৎ স্থিরত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন।

"কেহই ম্লেচ্ছ নহে, মনই ম্লেচ্ছ।" ॥ ৪৯ ॥

ম্লেচ্ছ শব্দের অর্থ অসভ্য বা পাপী। ম্লেচ্ছাচার—কদাচার বা গর্হিত আচার। এই গর্হিত আচরণ বা পাপ আচরণ করাকেই ম্লেচ্ছাচার বলা হয় এবং সাধারণ অর্থে যারা গর্হিত আচরণ করে তারাই ম্লেচ্ছ বলে গণ্য। এই অর্থে সমাজে যারা নীচ জাতি বলে গণ্য, যাদের আচরণ বা কর্ম সভ্য সমাজের সঙ্গে মেলেনা তাদের ম্লেচ্ছ বলা হয়। সনাতন বৈদিক মতে যারা তমোগুণ প্রধান, যাদের কর্ম নিন্দিত তাদের ম্লেচ্ছ বলা হয়। এই ম্লেচ্ছতা জন্মগত অধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হতে হবে এমন স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু কালবশে মানুষের উন্নত আধ্যাত্মিক চিন্তার অভাবে এবং কর্মের পার্থক্য অনুসারে ম্লেচ্ছ জাতিরূপে একটা শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে। ম্লেচ্ছের পুত্র ম্লেচ্ছই হবে এমন কারণ দেখা যায় না। বরং দেখা যায় ম্লেচ্ছের পুত্র অনেক সময় শিক্ষা দীক্ষা আচরণ এমনকি অধ্যাত্মপথে অনেক উন্নত অবস্থা লাভ করে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন। কাজেই উন্নত গুণাগুণ ও কর্মের স্তরভেদ অনুসারে এইসব পার্থক্য দেখা যায়। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে ম্লেচ্ছ স্বভাবকেই ম্লেচ্ছ বলা হয়। এই ম্লেচ্ছ স্বভাব আসে কোথা হতে, এর উৎসস্থলটাই বা কি এবং কে মানুষকে ম্লেচ্ছে পরিণত করে? অনেক সময় দেখা যায় উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করেও মানুষ ম্লেচ্ছ স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এমনকি তেমন মানুষ লোক চক্ষের অন্তরালে ম্লেচ্ছ

আচরণ করেও সমাজে বন্দিত হয়। তাহলে তাদের কেন ম্লেচ্ছ বলা হবে না? বর্তমানকালে এই প্রকার ম্লেচ্ছ আচরণশীল মানুষই অধিক দেখা যায়। সৎ আচরণ, সৎ চিন্তা, সৎ কর্মে নিযুক্ত ও ঈশ্বর পরায়ণ মানুষ বর্তমানকালে বড়ই বিরল। তাই 'খাও দাও মজা লোটো' এই প্রকার মানুষের সংখ্যাই অধিক। এই প্রকার মনোবৃত্তির [redacted] কর্মের মধ্যে আবার ভাল এবং মন্দ এই দুই প্রকারভেদ আছে। যে চঞ্চল মন মন্দ কর্ম করায় তাই ম্লেচ্ছ রূপে গণ্য। গীতায় ভগবান্ বলেছেন বিযুক্তবুদ্ধি বুদ্ধিই নয়। অর্থাৎ জীবের যে বর্তমান চঞ্চল বুদ্ধি তা যতক্ষণ স্থিরবুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হতে না পারে এই প্রকার যে বুদ্ধি সে বুদ্ধি বুদ্ধিই নয়। তাহলে বোঝা গেল জীবের মন প্রাণকর্মের দ্বারা যতক্ষণ স্থির মনে মিলিয়ে দিতে না পারে ততক্ষণ সেই মন অসৎকর্মে রত থাকতে বাধ্য করে। আবার প্রাণকর্ম করে এই চঞ্চল মনকে যদি স্থিরমনে মিলিয়ে দেওয়া যায়, যখন আর চঞ্চল মন নেই, কেবল স্থিরমনই বর্তমান তখন আর ম্লেচ্ছতা কোথায়! তখন মন তরঙ্গহীন হওয়ায় এটা চাই ওটা চাইরূপ কর্ম আর থাকে না। এই প্রকার স্থিরত্বলাভের পূর্বে যে চঞ্চল মন সেই জীবকে নানাকাজে ব্যস্ত রাখে, অভাববোধ জাগিয়ে তোলে এবং কর্মে আবদ্ধ করে। মানবিক দিক্ থেকে এই কর্ম আবার দুই প্রকার—ভাল ও মন্দ। এই মনই মানুষকে চরমতম মন্দ কাজ করাতে পারে, আবার এই মনই মানুষকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়ে দিতে পারে। মনের এই যে দুই বিভাগ তার মধ্যে মনের যে দিকটার দ্বারায় মন্দ কাজ সাধিত হয় সেই দিকটাকেই যোগিরাজ বলেছেন ম্লেচ্ছ। আবার মনের যে দিকটায় ভাল কর্ম সাধিত হয়, এমন কি ঈশ্বর সাধন এবং পরে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ পর্যন্ত সেদিকটা ম্লেচ্ছ নয়। তাই যোগিরাজ সকলকে সাবধান করে দিয়ে বলছেন মনের এই ম্লেচ্ছ দিকটাকে সর্বপ্রকারে পরিহার কর, সংযত রাখ। সংযত রাখতে না পারলে তুমি যতই উচ্চবর্ণের মানুষ হও না কেন ম্লেচ্ছ হয়ে যেতে পারো। কিন্তু মনের এই ম্লেচ্ছ দিকটাকে সত্যিকারের সংযত রাখতে হলে বিনা সাধনায় সম্ভব নয়। প্রাণকর্মরূপ সাধনদ্বারাই এই ম্লেচ্ছ মনকে সংযত করা যায়। কারণ প্রাণ চঞ্চল বলেই তো মন চঞ্চল, আবার এই চঞ্চল মন হতেই ম্লেচ্ছ মন আসে। তাই প্রাণকর্মের দ্বারা যতই চঞ্চল প্রাণকে থামানো যায় ততই ম্লেচ্ছ মনও আপনা হতে থেমে যায়। এই প্রকারে থামতে থামতে অর্থাৎ প্রাণকর্ম করতে করতে প্রাণ যখন সম্পূর্ণরূপে স্থির হয় ম্লেচ্ছ মনও তখন আপনা হতেই স্থির মনে মিশে যায়। মন তখন কর্মহীন হওয়ায় আর ম্লেচ্ছকর্ম থাকে না। তাই যোগিরাজ কেমন করে এই ম্লেচ্ছ মনকে থামানো যায় তার বিজ্ঞান সম্মত পথনির্দেশ দিয়ে বলেছেন প্রাণকর্মের মাধ্যমে সকল প্রকার কর্ম ও তরঙ্গের অতীতে

পৌঁছে অবস্থান কর, সেটাই তোমার পরমধাম। সেই পরমধামে গেলে আর ভাল মন্দ নেই, পাপ পুণ্য নেই, ম্লেচ্ছ অম্লেচ্ছ নেই, চির বিশ্রাম।

"যে জাবাব সে জাক বএ তুই আপন কর্ম্ম করেজা—
তোর হবে ভাল শেষে তুই স্থির ঘরে চলে জা" ॥ ৫০ ॥

এ দুনিয়ায় কত কিছু ঘটে তার কতটুকু খবর আমরা পাই ? যতটুকু পাই, তার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে সেই সব সুখ দুঃখের ভাগী হই। এইসব ঘটনার মধ্যে আবার ভাল মন্দ দুটো দিক্ আছে। আমার সামনে যদি কোনো ভাল ঘটনা ঘটে তবে তাতে আনন্দিত হয়ে কত আনন্দই প্রকাশ করি। আবার এই আমারই সামনে যদি কোনো মন্দ ঘটনা ঘটে তবে তাতে নিরানন্দ হয়ে কত দুঃখ প্রকাশ করি। আনন্দ এবং নিরানন্দ এই উভয়বিধ ঘটনার যেটা যখন ঘটে তখন কি আনন্দ বা নিরানন্দরূপ কোনো বস্তু বাইরে থেকে আমার ভেতর প্রবেশ করে ? এমনত দেখা যায় না। তাহলে আনন্দ বা নিরানন্দ এ দুটো আমার ভেতর এলো কোথা থেকে ? বাইরে থেকে যখন প্রবেশ করে না তখন নিশ্চয় এই দুই ব্যাপার আমার ভেতরেই আছে। বাহ্য ঘটনার মাধ্যমে আমারই ভেতর যখন যে ঘর্ষণ ক্রিয়া শুরু হয় তখন সেই দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু ঘর্ষিত হওয়ায় সেই অনুভব জেগে ওঠে। যখন আনন্দরূপ বায়ু ঘর্ষিত হয় তখন আনন্দ অবস্থা জাগ্রত হয় এবং যখন নিরানন্দরূপ বায়ু ঘর্ষিত হয় তখন নিরানন্দ জাগ্রত হয়। এই প্রকারে আমরা কখনও আনন্দ কখনও নিরানন্দের দোলায় দুলতে থাকি এবং তাতেই মোহিত হই। কিন্তু এর কোনোটাই যে আমি নই, আমার নয়, এগুলো যে অনিত্য, এগুলোর সঙ্গে আমি জড়িত নই এদিকে আমাদের খেয়াল থাকে না। খেয়াল না থাকার দরুন অনেক সময় হায় হায় করতে হয়। একথা আমরা কখনই ভাবি না যে এগুলো দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু ধর্ম। সৌভাগ্যবশে যদি কোনো মানুষের এদিকটাতে খেয়াল পড়ে তখন সে এগুলোর অসারতা ও অনিত্যতা বুঝতে পারে এবং এর সঙ্গে জড়িত না হয়ে বিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করে। কিন্তু এগুলোকে পরিত্যাগ করতে হলে বিনা সাধনায় হবার নয়। যতই প্রাণকর্মরূপ সাধন করা যায় ততই দেহাভ্যন্তরস্থ উনপঞ্চাশ বায়ু স্থির হয়ে মুখ্য এক প্রাণবায়ুতে মিশে যায় তখন এরা আর কেউ থাকে না।

তাই যোগিরাজ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এর মূল কারণটাকে ধরে জগৎবাসীকে জানালেন যে, যে যা খুশী করুক বা বলুক সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে তোমার যা আপন-

কর্ম তাই তুমি করতে থাক। এই আপনকর্ম বা নিজের কর্মটা কি? আমরা সাধারণতঃ চঞ্চল মন ও বুদ্ধির দ্বারায় সবকর্ম করে থাকি। এই চঞ্চল মন ও বুদ্ধি যেহেতু ইন্দ্রিয়, অতএব এদের মাধ্যমে যেসব কর্ম করা হয় তা আপনকর্ম নয়। এগুলো পরধর্ম হওয়ায় অপরের কর্মবলে গণ্য। গীতাতে ভগবান্ এই আপনধর্ম ও পরধর্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে—স্বধর্মে রত থেকে যদি নিধন হয় সেও ভাল কিন্তু পরধর্ম সর্বদাই ভয়াবহ। এই পরধর্ম হোলো ইন্দ্রিয়-ধর্ম। কারণ এই ইন্দ্রিয়গণই দেহের মধ্যে থেকে সর্বদাই ঈশ্বর সাধনে বাধা দেয়। আর স্বধর্ম হোলো যা ইন্দ্রিয়ধর্ম নয়, যা ঈশ্বর সাধনে অনুকূল বা সহায়কারী। অতএব স্বধর্ম বা আপনধর্ম হোলো প্রাণধর্ম, যাকে প্রাণকর্ম বলে এবং জীব শরীরে সদাই হচ্ছে এবং যার ওপরে নির্ভর করে জীব জীবিত আছে। একেই বলা হয় নিষ্কামকর্ম। অতএব যা নিষ্কামকর্ম তাই স্বধর্ম বা আপনকর্ম। অতএব স্বধর্ম, আপনকর্ম, নিষ্কামকর্ম এবং প্রাণায়াম বা প্রাণকর্ম একই কর্ম। তাই যোগিরাজ বলছেন জগতের দিকে তাকিও না, সবই পরধর্মে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ধর্মে ব্যস্ত। তুমি কেবল প্রাণকর্মরূপ আপনকর্ম করতে থাক তাহলে নিশ্চয় তোমার ভাল হবে, মঙ্গল হবে কারণ তুমি ধীরে ধীরে স্থির ঘরে চলে যাবে। এই স্থির ঘর যেখান থেকে তুমি চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ায় জীবরূপে এসেছিলে আবার শিবরূপে সেই স্থির ঘরে ফিরে যাও, কারণ ওটাই তোমার উৎসস্থল, নিজের ঘর। চঞ্চলতার দরুন এতদিন তুমি ইন্দ্রিয়দের সাথে পরবাসে ছিলে, তাই তুমি তোমার স্থিররূপ আপন স্বরূপকে ভুলে গিয়েছিলে; এবার ফিরে যাও তোমার স্ব-স্বরূপে। এখানে তিনি ভগবান্ বা ঈশ্বরকে লাভ করার কথা বলেননি। তিনি কেবল বলেছেন তোমার যে আপন স্বরূপের বিচ্যুতি ঘটেছিল কেবল সেটারই পরিবর্তন করো, তাহলে তুমিই যে শাশ্বত অনাদি পরমপুরুষ তা তুমি জানতে পারবে এবং তাই তুমি হয়ে যাবে। চঞ্চলতাই মহামায়ারূপে তোমার সামনে যে আবরণ সৃষ্টি করেছিলো, প্রাণকর্মের দ্বারা কেবল তাকে সরাও তাহলে তুমিই যে স্বচ্ছ নির্মল আত্মানন্দস্বরূপ তা আপনাহতেই জানতে পারবে। অতএব এই প্রাণকর্মই তোমার একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত আপনকর্ম, তাই তুমি করতে থাক এবং অপরের কর্মরূপ যে ইন্দ্রিয়কর্ম তা পরিত্যাগ কর।

"প্রেমের ঘর কোথায় বল দিকিন।
প্রেম কি অমনি মেলে
মেহনত কর কিছুদিন" ॥ ৫১ ॥

প্রেম ও ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরসাধন করতে হয় এবং এদেরই মাধ্যমে যে ঈশ্বরলাভ হয় একথা আমরা শুনি। সকল মহাত্মা এই উপদেশই দিয়ে থাকেন যে প্রেমভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরলাভ অতীব সহজ। সকল মহাত্মাদের উপদেশ অনুসারে প্রেমভক্তির মাধ্যমে হয়তো ঈশ্বরলাভ সহজ হয় ঠিকই কিন্তু প্রেমভক্তিকে কি উপায়ে লাভ করা যায় তার কোনো পরিষ্কার নির্দেশ কোথাও পাওয়া যায় না। এখানে প্রেমভক্তি লাভ করাটাই প্রথম কথা এবং দ্বিতীয় কথা হোলো যদি প্রেমভক্তি লাভ করা যায় তবেই ঈশ্বরলাভ সহজ হয়। অতএব প্রথম প্রয়োজন যে প্রেমভক্তি লাভ করা তা কেমন করে পাওয়া যেতে পারে? এই প্রেমভক্তি তো হাটে-বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। আবার প্রেম ভক্তি ছাড়া ঈশ্বরলাভও সম্ভব নয়। এই প্রেমভক্তি লাভের জন্য বিজ্ঞানসম্মত দিকটাকে দেখতে গেলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে বস্তুকে কখনও দেখিনি সে বস্তুর প্রতি আকর্ষণ কিভাবে সম্ভব? অতএব প্রেমভক্তির মাধ্যমে যে ঈশ্বরকে পেতে চাই সেই ঈশ্বর কেমন তা অন্তত সম্পূর্ণ না পারলেও খানিকটা অবশ্যই জানা চাই। যদি ঈশ্বরসত্তা সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান হয় তাহলে প্রেমভক্তি লাভ করাটা সহজ হয়। তাহলে ঈশ্বরীয় প্রেমভক্তি লাভের পূর্বে ঈশ্বরীয় অনুভব কিছুটা অবশ্যই দরকার। যেমন সন্তানহীনের সন্তানপ্রেম হয় না। আবার সেই ব্যক্তিরই যখন সন্তান হোলো তখন সন্তান লাভের সাথে সাথেই কি পূর্ণ সন্তানপ্রেম জন্মায়? তা হয় না। যতই সে প্রতিদিন সন্তানকে লালন পালন করে ততই তার মনের অজ্ঞাতে সন্তানপ্রেম আপনাহতেই লাভ হয় এবং সেই সন্তানকে পরে কিছুদিন না দেখতে পেলে থাকতে পারে না। তাহলে এখানে সন্তানপ্রেম নির্ভর করে সন্তানকে দেখাদেখির ওপর। সেরকম ঈশ্বরপ্রেম নির্ভর করে ঈশ্বরকেও দেখাদেখির ওপর। ঈশ্বরসত্তার যতই দর্শন হতে থাকে ততই ঈশ্বরপ্রেম বাড়তে থাকে। তাই যোগিরাজ বলছেন, ঈশ্বরপ্রেম লাভ করতে হলে তোমাকে কিছু পরিশ্রম করতে হবে অর্থাৎ কিছু কর্ম করতে হবে, কারণ বিনা কর্মে কিছুই লাভ করা সম্ভব নয়। সেই কর্মটা হোলো প্রাণকর্ম। প্রেম ভক্তি ভালবাসা এ সবই তোমার ভেতর আছে কিন্তু যেখানে আছে সেখানে যতদিন তুমি পৌঁছতে না পারছ ততদিন প্রেম ভক্তি লাভ করা খুবই কঠিন। সেই প্রেমের ঘর কোথায়, যেখানে গেলে তাকে লাভ করা যায়? সেই ঘরটি হোলো কূটস্থ। অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যতই

যাওয়া যায় ততই যেমন সবকিছুর প্রকাশ হয়, তেমনি যতই মনকে প্রাণকর্মের মাধ্যমে গুটিয়ে নিয়ে কূটস্থ অভিমুখে যাওয়া যায় ততই প্রেম ভক্তি লাভ হতে থাকে এবং শেষে যখন যোগী কূটস্থে স্থায়ীরূপে স্থিতিলাভ করেন তখন প্রেম ভক্তিতে মাতোয়ারা হন। যোগী যতই প্রাণকর্মরূপ সাধন প্রতিদিন করতে থাকেন ততই প্রতিদিন কিছু না কিছু আত্মজ্যোতি দর্শন হতে থাকে। আত্মজ্যোতি দর্শন যতই বাড়তে থাকে ততই যোগী ঈশ্বরীয় প্রেমে মাতোয়ারা হন এবং শেষে যখন আত্মজ্যোতিতে ডুবে যান তখন তিনি প্রেম ভক্তির মধ্যেও ডুবে যান। অতএব আত্মজ্যোতি দর্শনের পূর্বে প্রেম ভক্তি লাভ করাটা বাতুলতা মাত্র। তাই যোগিরাজ বলছেন প্রথমে ক্রিয়া করার অভ্যাস করতে থাক এবং যতই করতে থাকবে প্রেম ভক্তি আপনাহতেই লাভ হবে। এই প্রকারে প্রেম ভক্তি যতই লাভ হবে এবং বাড়তে থাকবে ততই তুমি ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাবে। তাই বলা হয় বিনা প্রেমে ঈশ্বরলাভ সম্ভব নয় এবং এই প্রেম ভক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রাণকর্মসাপেক্ষ।

"দম পর দম অল্লা—দমকে পরে জো দম
রয় সো অল্লা য়ানে স্থির ঘর" ॥ ৫২ ॥

একই পুকুর থেকে কেউ নেয় জল, কেউ নেয় ওয়াটার, কেউ নেয় পানি ইত্যাদি তেমনি একই ব্রহ্ম, তাকে কেউ বলে ভগবান্, কেউ বলে গড্, কেউ বলে আল্লা ইত্যাদি। এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণ একই, সেই এক কারণকে যে যেমন আপন পরিভাষায় ব্যক্ত করে। স্থান কাল পাত্র ভেদে ভাষাগত বা আচরণগত পার্থক্য হতে পারে কিন্তু সকলের মূল কারণ একই। এই দুনিয়ায় যা কিছু বর্তমান সবই সেই এক হতে নির্গত, একেই অবস্থিত এবং পরিণামে একেই লয়। সেই এক বহুরূপে পরিচিত হওয়ায় সীমাবদ্ধ হন। তাই বলে সেই এক স্বয়ং কিন্তু সীমাবদ্ধ নন, সীমাহীন। সেই এক স্থিররূপে, মহাশূন্যরূপে সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। সেই সীমাহীন অনন্ত নিশ্চলরূপে আছেন বলেই এই সীমা, জীব-জগৎ ও সকল বস্তুর অস্তিত্ব বিদ্যমান। সেই সীমাহীন একের একাংশ চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ায় সবকিছু বিদ্যমান। আবার তিনি যখন সেই একাংশ চঞ্চলতা রহিত হন তখন কিছুই থাকে না, কেবল স্থিররূপে তিনিই থাকেন। তাই তিনিই সবকিছুর মূল, আদি বা খোদ।

যোগিরাজ বলছেন শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে যে দম সর্বদা জীবদেহে অবস্থিত, প্রাণকর্ম করতে করতে এই দম থেমে গিয়ে বেদম হবে অর্থাৎ দমবিহীন অবস্থা হবে সেই

অবস্থাই আল্লা বা স্থিরঘর, নিশ্চল ব্রহ্ম। অতএব যা নিশ্চল ব্রহ্ম, তাই আল্লা, তাই গড, কারণ সেই অবস্থাই সবকিছুর মূল কারণ বা উৎসস্থল। এই অবস্থায় যোগী যখন উপনীত হন তখন তাঁর কাছে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ইত্যাদি ভেদাভেদ থাকে না। কিন্তু এই অবস্থালাভের পূর্বে যতকিছু ভেদাভেদ। মূলে যখন অদ্বৈত তখন ভেদজ্ঞান কোথায়? কিন্তু আজ আমরা পৃথিবীতে ধর্মের নামে যে সব নানা সম্প্রদায় দেখি এ সবই দ্বৈতে অবস্থিত হওয়ায় এত ভেদজ্ঞান এবং এই ভেদজ্ঞান থাকার দরুনই যত মতপার্থক্য ও হানাহানি। আমার প্রাণ তোমার প্রাণ সবার প্রাণ একই প্রাণ। সর্বজীবে একই প্রাণ। পৃথিবীর মানুষের কাছে এটাই সনাতন ধর্ম। এই প্রাণধর্ম কেবল ভারতের হিন্দু ধর্মের কথা নয়, পরন্তু সকল মানুষের ধর্ম, সকল জীবের ধর্ম তাই সনাতন ধর্ম পৃথিবীর ধর্ম, আত্মধর্ম। যে মানুষ নিজের প্রাণের প্রতি লক্ষ্য রাখে সে নিজের প্রাণকে ভালবাসে এবং নিজের প্রাণকে ভালবাসলেই সবার প্রাণকে, জগতের প্রাণকে ভালবাসতে পারে। তখন এ ধর্ম বড়, ও ধর্ম ছোট, এ শত্রু, ও মিত্র ইত্যাদি ভেদাভেদ রহিত হয়। অতএব সকলের উচিত প্রাণের সাধনা করা এবং মহাপ্রাণের জ্ঞান লাভ করা। তাই ঋষি উদাত্তকণ্ঠে বলেছেন—সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ।

"সূর্য্যই কালী সোই কালী হম সোই হম" ॥ ৫৩ ॥

ভারতীয় সাধন মতে ঈশ্বর সাধনার যতগুলো ধারা আছে তার মধ্যে শক্তি সাধনাও একটা বিশেষ ধারা। এই সাধন মতে ব্রহ্মের যে শক্তি সেই শক্তির সাধনা করা হয় এবং তার প্রধান উপাস্য দেবী হলেন কালী। তাই এই সাধনাকে শাক্ত সাধনা বলা হয়। এই সাধন মতে দুর্গাও এক প্রধান দেবীরূপে উপাস্য। তবে কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশ মহাদেবী বিশেষরূপে পূজিত হন, যাকে দশমহাবিদ্যা বলে। মোটকথা ব্রহ্মের শক্তিই এই ধারামতে উপাস্য। এই দশ মহাবিদ্যা হলেন চঞ্চল প্রাণের দশ অবস্থার প্রতীক যথা—প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান, নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। আবার এই দশ প্রাণের প্রতীক মা দুর্গার দশটা হাত। এই দশ প্রাণের দ্বারা জীব সমস্ত কর্ম করে থাকে ও জ্ঞান আহরণ করে। এই ধারামতে যিনি মহামায়া তিনি কালী বা শক্তি এবং ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্ন। এই সাধন মতকে তন্ত্রসাধনও বলা হয়। বেদের মধ্যেও এই তন্ত্র বা শক্তি সাধনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সাধন মতে যেহেতু ব্রহ্ম ও শক্তিকে অভিন্ন ধরা হয় অতএব শক্তিই এই সাধনার শেষ

গন্তব্যস্থল। তাই এই সাধন সাকারবাদী ও দ্বৈতবাদীর অন্তর্গত। ভারতীয় সনাতন সাধন মতে যে পাঁচটা প্রধান উপধারা আছে তা হোলো বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য। এই পাঁচটা উপধারাকে যদিও দ্বৈতমতের সাধন বা সাকারবাদী বলা হয়, তবুও এদের মূল লক্ষ্য হোলো অদ্বৈত। কারণ সর্বমতে অদ্বৈতই হোলো চূড়ান্ত বা শেষ অবস্থা। কিন্তু কালবশে অবক্ষয়ের প্রভাবে এই পাঁচটা ধারাই বর্তমান কালে সম্পূর্ণরূপে সাকারবাদী এবং দ্বৈতমতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এটাই এখন শেষ কথারূপে ধরা হয়। তন্ত্রমতে ব্রহ্ম গৌণ, শক্তি মুখ্য কিন্তু সনাতন সাধন মতে নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্মই হোলো মূলকথা। হাতে যেমন পাঁচটা আঙ্গুল, দেহে যেমন পঞ্চপ্রাণ, তেমনি সনাতন আত্মসাধনার পাঁচটা উপধাবা। তাই এই পাঁচটা উপধারা মতে সাধকের সংখ্যাই অধিক দেখা যায়, পরন্ত মহাশূন্যরূপী নিরাকার পরব্রহ্মের সাধক কম দেখা যায়। এই পাঁচটা উপধারামতে উপাসকদের সাধক বলা হয় এবং নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসকদের যোগী বলা হয়। এই পাঁচটা মতের সাধকগণ সগুণ উপাসক এবং যোগিগণ নির্গুণ উপাসক। যোগীর মতে ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্ন নয়। সাধক বলেন জল এবং তরঙ্গ যেমন অভিন্ন, আগুন এবং তেজ যেমন অভিন্ন, তেমনি ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্ন। যোগী বলেন পাঞ্চভৌতিক কোনো বস্তু বা দ্রব্যের দ্বারা ব্রহ্মের উপমা চলে না, কারণ সবকিছুই ব্রহ্ম হতে জাত কিন্তু ব্রহ্ম কোনো কিছু থেকে জাত নয়। সবকিছুর মধ্যে শূন্যব্রহ্ম আছে, কিন্তু শূন্যব্রহ্মে কিছু নেই। এ জগতের সবকিছুই সগুণ কিন্তু ব্রহ্ম নির্গুণ। অতএব নির্গুণের উপমা কখনই সগুণ দ্বারা সম্ভব নয়। নির্গুণের উপমা নির্গুণই, ব্রহ্মের উপমা একমাত্র ব্রহ্মই। এ জগতের সবকিছুই চঞ্চল হতে জাত, কিন্তু ব্রহ্ম সদা নিশ্চল ও অপরিবর্তনীয়। অতএব নিশ্চলের উপমা চঞ্চলের দ্বারা সম্ভব নয়। সেই সদা নিশ্চল ব্রহ্মের একাংশ চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ায় সেই চঞ্চলতা থেকে এই জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি কিন্তু ব্রহ্মের বাকী অনন্ত অবস্থা সদা নিশ্চল। তাই বলা হয়েছে 'নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্চতে' এবং 'একাংশেন স্থিতো জগৎ। এখানে মূল রহস্য হোলো স্থিরব্রহ্মের একাংশ চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ায় এই যে জগতের সৃষ্টি তার মধ্যেও সেই স্থিরত্ব বর্তমান। কারণ ওই স্থিরত্বই মূল বা আদি হওয়ায় চঞ্চলতার মধ্যেও অবশ্যই স্থিরত্ব বর্তমান থাকে, কারণ স্থিরত্ব না থাকলে চঞ্চলতার উৎস কোথায়? অতএব যোগীর মতে চঞ্চলতা না থাকলেও স্থিরত্ব বর্তমান থাকে কিন্তু স্থিরত্ব না থাকলে চঞ্চলতার কোনো অস্তিত্ব থাকে না। যোগীর মতে ব্রহ্মের ওই একাংশ চঞ্চলতাই মহামায়া ও শক্তি। এই শক্তি কখনই পূর্ণ হতে পারে না, কারণ অনন্ত স্থিরব্রহ্মের একাংশকে কখনই পূর্ণ বলা যায় না। অতএব যোগীর মতে ব্রহ্ম ও শক্তি আপাতত অভিন্ন মনে হলেও আদি

বা মূল উৎসস্বরূপে ভিন্ন। ব্রহ্মের সেই একাংশ যতক্ষণ চঞ্চল ততক্ষণই এই জগতের অস্তিত্ব। এই চঞ্চলতাই যেহেতু শক্তি সেহেতু যখন চঞ্চলতা রহিত তখন অবশ্যই শক্তিহীন বলতে হবে। যখন ব্রহ্মের চঞ্চলতা নেই তখন শক্তি কোথায়? অতএব ব্রহ্ম এবং শক্তি অভিন্ন নয়। তাই যোগী শক্তির উপাসনা না কোরে একেবারে সরাসরি স্থির ব্রহ্মে মিলিত হবার চেষ্টা করেন। এই স্থির ব্রহ্মের সাধনা, যাকে আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা বলা হয় তা অতি উচ্চকোটীর সাধনা হওয়ায় এ পথের সাধক বড় কম পাওয়া যায়। তাই সঠিক যোগীর সংখ্যা বড়ই বিরল। এটাই হোলো গীতা ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য জ্ঞান।

সাকারবাদী ও দ্বৈতবাদী সাধকের শেষ গন্তব্যস্থল হোলো আপন আপন ইষ্ট অনুসারে দেবদেবী দর্শন ও সেই দর্শনে মাতোয়ারা হয়ে থাকা। কিন্তু যোগীর গন্তব্যস্থল হোলো শূন্যরূপী স্থিরব্রহ্মে স্থায়ী স্থিতিলাভ করা ও লয় হওয়া। গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন—ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন। বেদ এমনকি সকল দেব-দেবীও গুণের অন্তর্গত, অতএব হে অর্জুন তুমি এসবের অতীতে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করবার চেষ্টা করো। এমনকি তন্ত্রশাস্ত্রও সেকথাই বলেছেন—

রজোভাবস্থিতো ব্রহ্মা
সত্ত্বভাবস্থিতো হরিঃ।
ক্রোধভাবস্থিতো রুদ্র
স্ত্রয়োদেবা স্ত্রয়োগুণা॥ (জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র)

সত্ত্ব, রজ, তম এই তিনগুণ সকল জীব শরীরে সর্বদাই বর্তমান এবং জীব এই তিন গুণের অধীন। এই তিন গুণই তিন দেবতা। রজগুণ ব্রহ্মা, সৃষ্টিকর্তা; তমগুণ মহেশ, নাশকর্তা এবং সত্ত্বগুণ বিষ্ণু, স্থিতি বা পালনকর্তা। প্রাণের এই তিন গুণ যেমন সকল জীবশরীরে বর্তমান তেমনি বিশ্ব প্রকৃতিতেও বর্তমান। এ দুনিয়ার সবকিছুই এই তিন গুণের অন্তর্গত। এই তিন গুণ জীবশরীরে কিভাবে অবস্থিত সে সম্বন্ধে গীতা বলেছেন—

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥ (গীতা ১৪/১৮)

নাভির নীচে জঘন্যরূপী তমোগুণ, নাভি থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত শরীরের এই মধ্যস্থানে রজগুণ, কণ্ঠ হতে আজ্ঞা পর্যন্ত দেবভাবাপন্ন সত্ত্বগুণ এবং আজ্ঞাচক্রের ঊর্ধ্বে গুণাতীত বা নির্গুণ। জীব যখন যে গুণের অধীনে থাকে তখন তার মন সেই স্থানে অবস্থান করে এবং তাতেই মোহিত থাকে। এইভাবে সত্ত্ব হতে তম এবং তম হতে সত্ত্ব এই ঊর্ধ্বাধগতি সর্বদাই জীবশরীরে চলছে, তাই আজ্ঞাচক্রের ঊর্ধ্বে গুণাতীত স্থানে

জীবের মন কিছুতেই যায় না। সাধকগণ তম এবং রজ এই দুই গুণকে অতিক্রম করে সত্ত্বগুণে স্থায়ী স্থিতিলাভকেই চরম স্থান মনে করেন। এর অতীতে যে নির্গুণ স্থান তা দ্বৈতবাদী এবং সাকারবাদী সাধকের পক্ষে অগম্য। সাধক সত্ত্বগুণে অবস্থান করায় সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠাত্রী যে সব দেব-দেবী তার দর্শন হয়ে থাকে। যোগী বলেন এইসব দেব-দেবীগণ যেহেতু সত্ত্বগুণের অন্তর্গত অতএব দেব-দেবী দর্শনকে কোনো প্রকারেই গুণাতীত বলা যায় না। তাই যোগীর লক্ষ্য হোলো এমন জায়গায় স্থিতিলাভ করা যেখানে অবস্থান করলে আর দেব-দেবীও নেই, কেবল শূন্যরূপী নির্গুণ ব্রহ্ম। এই অবস্থায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী কেউ নেই। হিন্দুরা এই তিন গুণকে তিন দেবতারূপে মেনে থাকেন। অন্য ধর্মাবলম্বীরা ওই তিন দেবতা মানেন না, কিন্তু সকলেই তিন গুণকে স্বীকার করেন, কারণ ওই তিন গুণ কোথায় নেই? তাই সকল দেব-দেবী যেহেতু এই তিনগুণের অন্তর্গত সেহেতু যোগীর মতে দেব-দেবীর দর্শনকে নির্গুণ অবস্থা কখনই বলা যায় না এবং দেব-দেবী দর্শনে গুণাতীত অবস্থায় পৌঁছান সম্ভব নয়। অথচ উৎসস্থলরূপ নিশ্চল ব্রহ্মে মিশে না যাওয়া পর্যন্ত জীবের রেহাই কোথায়? তাই অর্জুন বলেছেন নদী সকল যেমন সমুদ্রাভিমুখী হয়ে সমুদ্রেই প্রবেশ করে, তেমনি নরলোকগণ সর্বত্র দীপ্যমান তোমার মুখে প্রবেশ করছে। অতএব জীবের ধর্মও তার উৎসস্থলরূপ স্থির ব্রহ্মের দিকে ছুটে যাওয়া এবং পরিশেষে মিশে যাওয়া। তাই যোগিরাজ হলেন গীতা ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য জ্ঞানের পূর্ণ পরাকাষ্ঠা। আত্মসূর্য, কালী এবং তিনি নিজে মিলে মিশে একাকার হয়ে একে উপনীত হলেন, অদ্বৈতে নিরাকার ব্রহ্মে। তাই তিনি বলেছেন—যিনি আত্মসূর্য তিনি কালী তিনি আমি। যোগীর এইপ্রকার উত্তুঙ্গ অবস্থার কথা বলতে গিয়ে জনক বলেছেন—

যৎপদং প্রেপ্সবো দীনাঃ শক্রাদ্যাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
অহো! তত্র স্থিতো যোগী ন হর্ষমুপগচ্ছতি॥
(অষ্টাবক্র সংহিতা চতুর্থ প্রকরণম্ ২ শ্লোক)

যে পদকে পাবার জন্য সকল দেব-দেবী দীনভাবে অপেক্ষা করেন, আহাঃ! সেই পদকে ধীর যোগিগণ প্রাপ্ত হয়েও হর্ষপ্রাপ্ত হন না। এই দ্বৈত এবং অদ্বৈত বিষয়ে বহু মতামত এবং বিচার বিশ্লেষণ মানব সমাজে চালু আছে, কিন্তু কেউই প্রায় যৌগিক উপলব্ধির মাধ্যমে সঠিক বিচারে উপনীত হতে পেরেছেন এমন জানা যায় না। এই দ্বৈত এবং অদ্বৈত বিষয়ে যোগিরাজের যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা আছে 'পুরাণ পুরুষ যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী' গ্রন্থের ২০০ পাতা থেকে ২১১ পাতা এবং ৩২৭ পাতা থেকে ৩৪৩ পাতায়।

এই কালী দর্শন অথবা অন্য কোন দেব-দেবী দর্শন এইপ্রকার দেখাদেখি যতক্ষণ বর্তমান থাকে ততক্ষণ দ্বৈতাবস্থা এবং নিশ্চল ব্রহ্ম হতে দূরে। কিন্তু যখন সব মিলে মিশে একাকার, কালী দেখারও কেউ নেই, কালী বলারও কেউ নেই, এমনকি কালীও নেই তখন অদ্বৈত। তখন কেবল এক আমি বর্তমান। এই অবস্থালাভের পূর্বে যতক্ষণ পর্যন্ত মনের সামান্যতম অস্তিত্ব থাকে ততক্ষণই দেখাদেখি, কারণ মনই দেখে। অদ্বৈত নিশ্চল ব্রহ্মে মিশে যাওয়ার পূর্বে এই যে বিভিন্ন কালী দেখা, এই কালী কে? কাকে কালী বলে, কালীর মালা, কালীর খড়্গ, কালীর চরণ, কালীর জিহ্বা, কালী কত প্রকার ইত্যাদি বিষয়ে যোগিরাজের যে সব প্রত্যক্ষ দর্শন, উপলব্ধি ও জ্ঞান হয়েছিল তা তিনি তাঁর গোপন দিনলিপিতে লিখে রেখে গেছেন। এই কালী কে এবং কাকে কালী বলা হয়, এ বিষয়ে যোগিরাজ বলেছেন—'সূর্য্যহি কালীকা রূপ। সূর্য্য ওহি কালী—সূর্যকা রূপ আউর হমারা রূপ এক হয়'। আত্মসূর্যই কালীর রূপ। এই যে আত্মসূর্য দেখছি তিনিই কালী। এই আত্মসূর্যের রূপ এবং আমার রূপ একই অর্থাৎ যা কালীর রূপ তাই আমার রূপ; কালী এবং আমি একই, অভিন্ন। এই কালীর জিহ্বা কি? যোগিরাজ বলেছেন—'লোল জিহ্বা মালুম হুয়া কালীকা। ইহ জিহ্বা জব তালুমূলমে লপট জাতা হ্যায়। জিভ আউর উঠা আউর ইহ মালুম হোতা হায় কি নিদ ছোড দেনা। আউর বড়া মজা মালুম হুয়া আউর বাঁসুলিকা আওয়াজ আউর সাফ বজনে লগা'—জিহ্বা হোলো লালসার প্রতীক। জিহ্বার দ্বারা সকল স্বাদ বোঝা যায়। কালীর ওই লকলকে লালসাযুক্ত জিহ্বা কি, যার দ্বারা সকল জীবে লালসা উৎপন্ন হয় তা এখন বুঝতে পারলাম। বুঝতে পারলাম যে এই লালসার জন্যই জীব আবদ্ধ হয়। কিন্তু কখন বুঝলাম? যখন আমার এই বর্তমান জিহ্বা ওপরে উঠে তালুমূলে আটকে গেলো তখনই। লালসা এবং লোভ একই কথা। লোভ চরিতার্থ না হলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। এগুলো সবই সাধনার অন্তরায়। অতএব লোভ ক্রোধ ইত্যাদি এগুলোকে সর্বাগ্রে সংযত করা একান্ত প্রয়োজন। এগুলোকে সংযত করতে না পারলে কখনই আত্মরাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। এরই প্রতীকস্বরূপ মাকালীর জিহ্বা বহির্মুখী। কিন্তু এই লালসা লোভ ইত্যাদি সংযত হয় কি উপায়ে? যেমন কোন বস্তু লাভের জন্য লোভ হল। সেই লোভ কি বাইরের থেকে আমার মধ্যে প্রবেশ করল? তা নয়। লোভ আমার ভেতরেই আছে। কেবল সেই বস্তু লাভের ইচ্ছা মনে জাগ্রত হওয়ায় দেহাভ্যন্তরস্থ লোভরূপী অবস্থার প্রকাশ হোলো। অতএব লোভ আমারই ভেতর বর্তমান। তাই যোগিরাজ বলছেন এই লোভকে সংযত করতে হলে বাহ্য উপায়ে বা বাহ্য ত্যাগে সম্ভব নয়। যেমন যে বস্তুর প্রাপ্তির জন্য লোভ হল, সেই বস্তুকে যদি

গ্রহণ না করা হয় তবে তা বাহ্য ত্যাগ হল বটে কিন্তু মনে মনে সেই বস্তু লাভের লোভ রয়ে গেল। অতএব এইভাবে লালসা বা লোভ চরিতার্থতা হল না ঠিকই, তাই এই উপায়ে সঠিক ত্যাগ সম্ভব নয়। এই লালসা বা লোভ ত্যাগের যৌগিক উপায়স্বরূপ যোগিরাজ বলছেন যদি স্বীয় জিহ্বাকে ওপরে উঠিয়ে তালুকুহরে দুই নাসিকাছিদ্রের ওপরে রাখা যায় তাহলে লালসা লোভ ইত্যাদি আপনা হতেই জয় হয়। শুধু তাই নয় কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য এই ষড়্‌বর্গো আপনা হতেই জয় হয়। মাকালীর জিহ্বা যে বহির্মুখী, এর দ্বারা বোঝান হচ্ছে যে যোগীকে জিহ্বার কিছু কর্ম করতে হবে, যাতে করে জিহ্বা তালুকুহরে প্রবেশ করে। এই প্রবেশ করানোকেই খেচরী অবস্থা বলে। এই অবস্থা লাভ হলে সকল ইন্দ্রিয় ও রিপু আপনা হতেই দমিত হয়, এমন কি নিদ্রাও চলে যায়। এই অবস্থা লাভ হলে নিদ্রা জয় হবে অথচ শরীরের কোনো ক্ষতি হবে না এবং যোগী সারারাতব্যাপী প্রাণকর্মরূপ আত্মসাধনে নিরত থাকতে পারবে। এই অবস্থায় উত্তম প্রাণায়াম হয় এবং সেই প্রাণায়ামে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিস্বরূপ বাঁশির মতো আওয়াজ পরিষ্কার নির্গত হয়।

কালীর চরণ কাকে বলে, এ বিষয়ে যোগিরাজ বলেছেন—"কালীকা চরণ দেখা। কালীর নাম অর্থাৎ সূর্য্যের ধ্যান ও প্রাণায়াম কালীর পা এক ঐ পা দুই হইয়াছে বাঁ পা ও ডান পা অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য্য অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা। চরণ য়ানে দোনো শ্বাসা যয়সা চরণ এ স্থান ছোড়কে জাতা হয় ওএসাহি শক্তি শ্বাসাকা।" —কালীর চরণ দেখলায়। সেই চরণ কি? চরণ শব্দে যার দ্বারা ভ্রমণ বা বিচরণ করা যায়। মানুষ দুই পায়ের দ্বারা বিচরণ করে, ডান পা ও বাঁ পা। এই দুই পা হাড় মাংস ইত্যাদির দ্বারা গঠিত। প্রকৃত পক্ষে এই দুই পায়ের কি নিজস্ব কোনো ক্ষমতা আছে? যদি থাকত তাহলে মৃত মানুষের পাও চলত। তা যখন চলে না তখন এই দুই পায়ের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই অতএব প্রকৃতপক্ষে এই দুই পা সহ সারা শরীরটাকে যিনি চালাচ্ছেন তিনি হলেন ইড়া ও পিঙ্গলা। এই ইড়া ও পিঙ্গলায় শ্বাসের গতি থাকায় জীব জীবিত থাকে এবং এই দুইতে যতক্ষণ জীব অবস্থিত ততক্ষণ জীব দ্বৈতে থাকতে বাধ্য হয় এবং এই দ্বৈতে থাকার দরুন যতকিছু জান'জানি, দেখাদেখি সবই বর্তমান থাকে। এই দুইতে গতি আছে বলেই পা দুটি চলে। তাই প্রকৃতপক্ষে দুই চরণ হোলো এই ইড়া ও পিঙ্গলা। ইড়াকে বলা হয় চন্দ্র নাড়ী এবং পিঙ্গলাকে বলা হয় সূর্য নাড়ী। এই ইড়া নাড়ী বাঁ পা এবং পিঙ্গলা নাড়ী ডান পা। এই ইড়া ও পিঙ্গলায় যতক্ষণ গতি আছে ততক্ষণ জীবের পক্ষে অদ্বৈতকে জানা অসম্ভব। ইড়া তমগুণ, পিঙ্গলা রজগুণ। তাই বেশীর ভাগ

জীবই এই দুই গুণের অন্তর্গত থাকতে বাধ্য হয়। আবার উত্তম প্রাণকর্ম করতে করতে এই দুই এর গতি রহিত হয়ে যখন একে গতি হয় অর্থাৎ সুষুম্নাগামী গতি হয় তখন জীব তম ও রজগুণকে অতিক্রম করে সত্ত্বগুণে স্থিত হয়। কিন্তু এটাও গুণ এবং তখনও গতি বর্তমান থাকায় নিশ্চল অবস্থা লাভ সম্ভব হয় না। তাই যোগিরাজ বলছেন কালীর পা এক। কারণ নিশ্চল ব্রহ্ম হতে প্রথম জাত যে চঞ্চলতা সেই চঞ্চলতা দুইতে গতিপ্রাপ্ত না হওয়ায় এক পা। সেই এক পা অর্থাৎ প্রথম গতি যখন আরো অধিক হয় তখন দুই পা অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলায় এসে পড়ে। কিন্তু ওই এক পা অর্থাৎ সুষুম্নায় থাকলেও দেখাদেখি বর্তমান থাকে। দুইয়ে গতি থাকলে জগৎ দেখা এবং একে গতি থাকলে দেব-দেবী দেখা। যখন দুইয়ে গতি থাকে তখন সেই অবস্থার দরুন যা যা দর্শন ও জ্ঞান হওয়া সম্ভব তাই হয়। আবার যখন একে গতি হয় তখন যা যা দর্শন ও জ্ঞান হওয়া উচিত তাই হয়, এর অন্যথা হবার উপায় নেই। সাধক সাধনার মাধ্যমে ইড়া ও পিঙ্গলাকে অতিক্রম করে অর্থাৎ তম ও রজগুণকে অতিক্রম করে সুষুম্নায় অবস্থান করে এবং সুষুম্নায় থাকার দরুন সত্ত্বগুণে থাকে এবং সত্ত্বগুণে থাকায় দেব-দেবী দর্শন আপনা হতেই হয়। যে সমস্ত প্রধান দেব-দেবী তা এই সত্ত্বগুণেই অবস্থিত। সাধক তখন সেই সব দেব-দেবী দর্শনে, তাদের যা ক্ষমতা অর্থাৎ সত্ত্বগুণের যা ক্ষমতা তা তিনি লাভ করেন। এই অবস্থা লাভ পর্যন্তই সাধকের শেষ গন্তব্যস্থল। এর অতীতে অর্থাৎ সত্ত্বগুণের অতীতে যে নিশ্চল অনন্ত অবস্থা আছে তা সাধকের পক্ষে জানা সম্ভব হয় না। তাই সাধকের সাধনা এখানেই শেষ হয় এবং যেহেতু এই অবস্থাতেও কালী ইত্যাদি দেব-দেবী দেখাদেখি থাকে তাই সাধক দ্বৈতে থাকতে বাধ্য হন এবং ওই দ্বৈতকেই চূড়ান্ত বলে জানেন। যোগী কিন্তু এই অবস্থাকে চূড়ান্ত বলেন না। যোগীর কাছে এই সত্ত্বগুণেরও অতীতে, যখন আর সুষুম্নাতেও গতি নেই, একেবারে নিশ্চল নির্গুণ ব্রহ্ম সেই অবস্থাকেই চূড়ান্ত অবস্থা বলে। ওই অবস্থায় যোগী যখন উপনীত হন তখন তাঁর কাছে ইডা পিঙ্গলা না থাকায় সুখ দুঃখ নেই, জগৎবোধ নেই। আবার সুষুম্নায় গতি না থাকায় কোনো প্রকার দেব-দেবী দর্শন নেই, অতএব জানাজানি নেই, জ্ঞান নেই অজ্ঞান নেই, এককথায় কিছুই নেই, কেবল অনন্ত স্থির নিরাকার ব্রহ্ম। তখন নিজে না থাকায় সবই ব্রহ্ম, সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ। তখন কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় শিব, কোথায় কালী, সবই মিলে মিশে একাকার। এই অবস্থাকেই যোগী বলেন অদ্বৈত অর্থাৎ যখন দুই নেই, দুই বলারও কেউ নেই, জানারও কেউ নেই।

এই অবস্থা লাভের পূর্বে যে কালীর নাম বা স্মরণ হয় সেটা কি? এ বিষয়ে যোগিরাজ বলছেন উত্তম প্রাণায়াম করতে থাকলে আপনা হতেই যে আত্মসূর্য দর্শন

হয় এবং সেই আত্মসূর্য দর্শনে যে ধ্যানাবস্থার উদয় হয় এই অবস্থাটাই কালীর নাম অর্থাৎ প্রাণায়াম শুরু করা থেকে আত্মসূর্য দর্শনে তন্ময়তা প্রাপ্তিরূপ ধ্যানাবস্থায় উপনীত হওয়া পর্যন্ত এই অধ্যায়টাকে বলা হয় কালীর নাম। কিন্তু যোগী যখন এই অধ্যায়কে অতিক্রম করে স্থিরে রূপান্তরিত হন তখন আর কালীর নামও থাকে না, রূপও থাকে না, ধ্যানও থাকে না, সবই নির্গুণ নিরাকার হয়। তাই যোগিরাজ বলেছেন—'সূর্য্যকা রূপ আউর হমারা রূপ এক হয়।' —আত্মসূর্যের রূপ, কালীর রূপ এবং আমার রূপ সবই এক। এই একেই সব এবং সব কিছু ওই এক হতে নির্গত। 'ইহাঁ কালীজি বিরাজমান—খালি কালী নহি সবকোই য়ানে কুছ নাহি আউর সব কুছ—আহা ক্যা মজা হয়।'—এইখানে অর্থাৎ এই এক অবস্থায় কালী বিরাজমান। কেবল কালী কেন পরন্তু কালীসহ সকল দেব-দেবীই এইখানে অর্থাৎ এই অবস্থায় বিরাজিত। কারণ কালীসহ সকল দেব-দেবী এমনকি এই জীব জগৎও এই স্থির ব্রহ্ম হতে উৎপন্ন, আবার ঘুরে ফিরে সকলেরই এখানেই লয়। তাই বলছেন এখানে অর্থাৎ এই স্থির অবস্থায় কিছুই নেই, আবার সবকিছু আছে—আহা কি মজা অর্থাৎ চিরআনন্দ।

কালীর খড়্গ ও কালীর মালা কাকে বলে? খড়্গ হোলো অস্ত্র বিশেষ, যার কাজ অজ্ঞানকে ছেদন করা অর্থাৎ নাশ করা। যে কর্মের দ্বারা যোগীর জন্ম-জন্মান্তরের অজ্ঞান দূরীভূত হয়, সেই কর্মকে খড়্গ বলে। জ্ঞান অজ্ঞান কোনো বাইরের বস্তু নয় দেহের ভেতরেই অবস্থিত। জ্ঞান থাকলেই অজ্ঞান থাকবে, যেমন সুখ থাকলে দুঃখও থাকে। এই দুটি জীব শরীরে কতক্ষণ বর্তমান থাকে? যতক্ষণ প্রাণ চঞ্চল। কিন্তু স্থির প্রাণে জ্ঞান অজ্ঞান কেউ থাকে না। অতএব প্রাণকর্মরূপ খড়্গের দ্বারা প্রথমে চঞ্চলতাকে নাশ করতে হবে, তাহলেই স্থিরাবস্থায় সত্যকার জ্ঞানের উদয় হবে। তারপর সম্পূর্ণ স্থিরাবস্থায় জ্ঞান অজ্ঞান সহ সব কিছু নাশ হয়ে পূর্ণ অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত হবে। অতএব প্রাণকর্মরূপ খড়্গ সকলেরই চালনা করা উচিত। এরই প্রতীক মাকালীর হাতের খড়্গ। এই দেহই ধনুক এবং শ্বাস তীর। তাই লক্ষ্মণ ও অর্জুনের হাতে তীর ধনুক। এই প্রকারে অধ্যাত্ম জগতের সমস্ত তত্ত্বকে জানতে হবে, যা সকল মনুষ্য শরীরে আছে ও থাকবে। তাই এই অস্ত্র শাশ্বত।

কালীর গলায় যে মুণ্ডমালা দেখা যায় তাতে ১০৮টা নরমুণ্ড থাকে। এই ১০৮ নরমুণ্ড হোলো সাধকের মনের ১০৮ পশুবৃত্তি নিধনের প্রতীক। প্রত্যেক মানুষের ভেতর ১০৮ প্রকার পশুবৃত্তি থাকে, যাকে প্রবৃত্তিপক্ষ বলে। এই প্রবৃত্তিপক্ষই নিবৃত্তিপক্ষে প্রবেশ করতে দেয় না। এই প্রবৃত্তিপক্ষ আসে কোথা থেকে? এগুলো

কি বাইরের থেকে শরীরের ভেতর প্রবেশ করে? তা নয়। এরা সবাই এই দেহের ভেতরের থেকে বিরোধীতা করে। প্রাণ চঞ্চল বলেই এদের সবার অস্তিত্ব এবং যতক্ষণ প্রাণ চঞ্চল থাকবে ততক্ষণ এরাও থাকবে। কিন্তু যখন প্রাণ স্থির তখন এরাও কর্মহীন। এই কর্মহীনতাই নিধনের প্রতীক, তাই এদের মুণ্ড ছেদনরূপে দেখান হয়েছে। তাই যোগিরাজ বলছেন অনন্ত মহাকাশ যা অবিচ্ছেদ্য-ভাবে চলছে অর্থাৎ যে অনন্ত গতি সেই গতিই নিজের রূপ, কারণ গতি থেকেই রূপ আসে। এই অবিচ্ছেদ্য গতি যখন দেহরূপ ঘটে সীমাবদ্ধ হয় তখনই জীব এবং সেই জীবের ভেতরেই সমস্ত প্রকার বৃত্তি একে একে উদিত হয়। সেই বৃত্তির দুটো পক্ষ, একটা প্রবৃত্তিপক্ষ অপরটা নিবৃত্তিপক্ষ। প্রাণকর্মরূপ সাধনার দ্বারা যখন প্রবৃত্তিপক্ষ গলে যায়, যার প্রতীক কালীর মালা, তখন আপনাহতেই নিবৃত্তিপক্ষের উদয় হয়। এই নিবৃত্তিপক্ষও কিন্তু বৃত্তি। তবে এই পক্ষ মঙ্গলদায়ক। এই পক্ষে উপনীত হয়ে যোগী যখন আরো অধিক উত্তম প্রাণকর্মে রত থাকেন তখন এই পক্ষও আপনা হতে গলে গিয়ে অজর অমর ঘরের উদয় হয়, যে অবস্থায় গেলে চিরস্থির অবস্থ কে জানা যায়। সেই চিরস্থির অবস্থাই অপরিবর্তনীয় ও বিনাশহীন। ওই চিরস্থির অবস্থায় সর্বদার জন্য থাকতে হবে। ওই অবস্থায় যে আত্মসূর্যের (সহস্রাংশু) প্রকাশ হয় তা আমিই এবং যদি বিপরীতভাবে জানতে যাই তাহলে আমিই ওই সহস্রাংশু। অতএব যা আত্মসূর্য তাই আমি, সেই আমিই নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্ম। সবই মিলে মিশে একাকার। তখন কালীর হাতের জ্ঞানখড়্গ নেই, মুণ্ডমালা নেই, লোল জিহ্বা নেই, কালীর চরণ নেই, কালী নেই, আত্মসূর্য নেই। কেবল নিরাকার নির্গুণ একমাত্র আমিই বর্তমান। এই আমিই চিরস্থির আমি, শাশ্বত আমি, অবিনাশী আমি। এই প্রকার আমিতে আমি সম্পূর্ণরূপে মিশে যাওয়ার পূর্বে দুই বর্তমান থাকে। এই দুই বর্তমান থাকে বলেই কালী কৃষ্ণ শিব ইত্যাদি নানা প্রকার দেব-দেবী দেখা যায়। সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হলে আপনা হতেই দেব-দেবী দর্শন হয়ে থাকে। এ সবই দ্বৈতাবস্থায় হওয়ায় যোগীর মতে জন্মমৃত্যু তখনও থাকে, তবে তা সুদীর্ঘকাল পরে হয়। কিন্তু যখন স্থির আমি, অদ্বৈত আমি, যোগীর মতে তখন জন্মমৃত্যু কোথায়? এটাই যোগীর লক্ষ্য ও গন্তব্যস্থল। পুরুষোত্তম যোগিরাজ এই অবস্থায় উপনীত হতে পেরেছেন বলেই তিনি বলেছেন— 'হম হি ভগবান্, হম হি ব্রহ্ম'।

"চলার নামই সংসার" ॥ ৫৪ ॥

স্ত্রী পুত্র মাতা পিতা সহ একত্রে বসবাস, সুখে দুঃখে জীবন কাটান একেই সাধারণতঃ আমরা সংসার বলি। এই সংসারের উন্নতির জন্য কত না চেষ্টা করি। আরো ধনসম্পত্তি হোক, যশলাভ হোক ইত্যাদির জন্য কত চেষ্টা। এ সবের মাধ্যমে সংসারে আপাতত সুখশান্তি কিছু দিনের জন্য লাভ হয় বটে কিন্তু একথা আমরা কখনই ভাবিনা যে এগুলো সবই অনিত্য। সুখলাভের জন্য এ সংসারে আমরা যতকিছু লাভ করি একদিন সব ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে, অনেক সময় এসব চিন্তা মনে উদিত হয় বটে তথাপি সকলেই এই প্রকারে জাগতিক উন্নতির চেষ্টায় সদাই ব্যস্ত। তাই এই জাগতিক সংসার সর্বদাই দেহের সুখ ও মনের সুখ মেটাতেই ব্যস্ত, আত্মিক সুখ হয় না। তাই আমরা যাকে সংসার বলি যোগীর দৃষ্টিতে তা সংসার নয। যোগীর দৃষ্টিতে এটা হোলো সাময়িকভাবে মায়ার বন্ধন। তাই বলে যোগী কখনও এই সংসারকে ত্যাগ করতে বলেন না এবং নিজেও ত্যাগ করেন না। যোগী বলেন যতক্ষণ দেহ আছে ততক্ষণ এই সংসারেরও প্রয়োজন আছে। কারণ সংসারই এই দেহকে দিয়েছে এবং প্রতিপালন করেছে। সংসার না থাকলে অর্থাৎ আমার মাতাপিতা সংসারী না হলে এই দেহলাভ হোতো না এবং ঈশ্বর সাধনও করা যেত না। তাই এই সংসার মোটেও অবহেলিত নয়।

যোগীর দৃষ্টিতে চলার নামই সংসার অর্থাৎ যা চলছে সেটাই সংসার;-থেমে থাকাটা সংসার নয। এই চলা কি? জীব অনন্তকাল ধরে জন্মাচ্ছে এবং মরছে, আবার জন্মাচ্ছে ও মরছে। এই প্রকারে প্রতি জন্মের পর কিছুদিন একত্রে মিলেমিশে থাকা, যেটাকে তোমরা সংসার বলো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংসার হোলো এই অনন্ত অবিচ্ছেদ্য গতিময় অবস্থা, যে অবস্থার ফেরে পড়ে বারবার আসা যাওযা। সমুদ্র পাড়ি দিতে গেলে যেমন অনন্ত ঢেউকে অতিক্রম করে করে এগিয়ে যাওযা, তেমনি বারবার জন্ম-মৃত্যুকে অতিক্রম করে করে এগিযে যাওযা। দেহ আমিকে বাদ দিয়ে যে শাশ্বত আমি বারবার আসি যাই, এই আসা যাওযারূপ যে গতি, প্রকৃতপক্ষে এই গতিই হোলো সংসার। কারণ এই গতি না থাকলে আসা যাওয়া থাকে না। এই গতিই হোলো প্রাণের চঞ্চলতা। এই গতি অনন্ত যাকে মহাকাল বলে। এই মহাকাল গতি এক এক দেহে অবস্থান করায যখন খণ্ডতা প্রাপ্ত হয় তাকেই কাল বলে। কিন্তু তাই বলে এই কাল কখনও খণ্ডযুক্ত নয়, এই কাল মহাকালের সঙ্গে সর্বদা যুক্ত থাকার এও মহাকালরূপে গণ্য। তাই মহাকালরূপে এই অনন্ত গতিই

হোলো সংসার। অতএব এই সংসার কতদিন থাকবে? যতদিন প্রাণের চঞ্চলতা প্রযুক্ত জন্ম-মৃত্যুরূপ প্রবাহ থাকবে, এ সংসারে আসা যাওয়ার জন্ত যে গতি, সেই গতি যতদিন আছে সংসারও ততদিন আছে। স্থির ব্রহ্মের একাংশ চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ায় যে গতির উদয় হয়েছে এই গতিই সংসার এবং এই গতি থাকা পর্যন্ত সংসার থেকে রেহাই নেই। কিন্তু যখন যোগসাধনার মাধ্যমে প্রাণের এই অনন্ত চঞ্চলতাকে কাটিয়ে স্থির ব্রহ্মে মিশে যাওয়া যায়, তখন আর কোনো প্রকার গতি না থাকায সংসার নেই। তখন অগতি অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় অসংসার। এই' অগতি অবস্থা লাভের পূর্বে কেউ যদি এই জাগতিক সংসারকে পরিত্যাগ করে পাহাড়ে জঙ্গলে বা আশ্রমে গিয়ে মনে করে সংসার ত্যাগ করলাম, তবে তাতে সংসার ত্যাগ হয় না। কারণ তেমন ব্যক্তি যেখানেই থাকুক না কেন প্রাণের চঞ্চল অবস্থা বর্তমান। এই প্রকার সংসার ত্যাগে কোনো লাভ হয় না বরং নিজেকে বঞ্চিত করা হয় মাত্র। প্রাণের চঞ্চল অবস্থাই যেহেতু সংসার অতএব এই চঞ্চলতা যতদিন আছে ততদিন সংসার অবশ্যই আছে, তা সে যেখানেই থাকি না কেন। অতএব যোগীর দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে চঞ্চলতা রহিত অবস্থাই সংসার ত্যাগরূপ অবস্থা।

"বাজাসে জব জানয়র মস্ত হোয় তব আদমি
ওঁ মে ন মস্ত হোয তো গধা হয়" ॥ ৫৫ ॥

অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো সুরেলা বাদ্যধ্বনি শুনে জন্তু-জানোয়ারেরাও মোহিত হয, এমনকি মানুষও সুমধুর বাদ্য শুনে মোহিত হয়। যেমন কোনো বাদ্যযন্ত্রকে বাজালে তার থেকে ধ্বনি নির্গত হয়, কোনো যন্ত্রকে চালালে তার থেকে শব্দ নির্গত হয, তেমনি দেহরূপ মন্দিবে প্রাণ চঞ্চল থাকায একপ্রকার শব্দ নির্গত হয়, এই শব্দকে ওঁকার ধ্বনি বলে। বাদ্য এবং যন্ত্র থেকে যে শব্দ নির্গত হয় তা চঞ্চলতার কর্ম, তেমনি দেহের অভ্যন্তরে যে শব্দ হয় তাও প্রাণেব চঞ্চলতার কর্ম। যন্ত্র থেমে গেলে যেমন আর শব্দ হয না, তেমনি প্রাণের স্থিরাবস্থায় শব্দ থাকে না। অতএব শব্দ হোলো চঞ্চলতার কর্ম, তাই চঞ্চলতা যেখানে শব্দও সেখানে। কিন্তু বাইরের শব্দকে এই দুই কানে শোনা যায়, দেহাভ্যন্তরস্থ প্রাণের শব্দকে এই দুই কানে শোনা যায না। কাবণ কান স্বয়ং ইন্দ্রিয় হওযায় সে বাইরের শব্দ শুনতেই ব্যস্ত, প্রাণের সূক্ষতম শব্দ শুনতে পায় না। প্রকৃত পক্ষে কানের মাধ্যমে মনই শোনে। সেই মনও স্বযং ইন্দ্রিয় হওয়ায় এবং অধিক চঞ্চল হওযায় বাইরের শব্দই শোনে, সূক্ষতম প্রাণের শব্দ শুনতে পায না। যোগী যখন অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করতে থাকেন তখন

চঞ্চল মন স্থির হয়ে মনেতে মন অবস্থান করে তখন আপনাহতেই প্রাণের শব্দ শোনা যায়। এই দেহই ওঁকার। অতএব এই দেহের মধ্যে প্রাণের চঞ্চলতার দরুন যে শব্দ তাকেই ওঁকার ধ্বনি বলে, যেমন যন্ত্র থেকে নির্গত শব্দকে যন্ত্রধ্বনি বলে, তেমনি ওঁকাররূপী এই দেহ থেকে প্রাণের চঞ্চলতার দরুন নির্গত যে শব্দ তাকে ওঁকার ধ্বনি বলে। প্রাণকর্ম ব্যতিরেকে এই ওঁকার ধ্বনি কখনই শোনা সম্ভব নয় কারণ বিনা প্রাণকর্মে কখনই চঞ্চল মন নিরুদ্ধ হয় না। প্রাণ অধিক চঞ্চল থাকায় মন বুদ্ধি সবই দেহগত থাকে, তাই জীব বাইরের শব্দ শোনে ও তাতে মোহিত হয়। যোগী জানেন বাইরের সকল শব্দই ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য তা সে যত শ্রুতিমধুরই হোক না কেন। এই অনিত্য শব্দ কখনই নিত্যের সন্ধান দিতে পারে না, কারণ এই অনিত্য শব্দ সর্বদাই কারো না কারো দ্বারা হয়ে থাকে অথবা কোনো না কোনো বস্তুর ঘর্ষণে নির্গত হয়। কিন্তু এই দেহ থাক বা না থাক, প্রাণের চঞ্চলতার দরুন যে শব্দ যাকে ওঁকার ধ্বনি বলে তা মহাকালের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় অনন্ত অতএব ওঁকার ধ্বনি নিত্য শব্দ। তবে এই নিত্য শব্দও কতক্ষণ? যতক্ষণ প্রাণ চঞ্চল। নিশ্চল ব্রহ্মের একাংশ চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ায় এই জীব ও জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। তাই এই সমগ্র সৃষ্টির মধ্যেও প্রাণের সেই চঞ্চলতা থাকায় সব কিছুর মধ্যেও ওঁকার ধ্বনি বর্তমান। অতএব প্রাণের চঞ্চলতার দরুন যেমন এই দেহ মধ্যে ওঁকার ধ্বনি বর্তমান, তেমনি জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সকল সৃষ্টির মধ্যেও সেই একই ওঁকার ধ্বনি বর্তমান। তাই অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করতে থাকলে যখন মন নিরুদ্ধ হয় তখন বাহ্য দিকে দেহবোধ কমে গেলেও সূক্ষ্মভাবে দেহবোধ ও জগৎবোধ বর্তমান থাকে। এই দেহবোধ বা জগৎবোধ যতক্ষণ সূক্ষ্মভাবে থাকে ততক্ষণ ওঁকার ধ্বনি অবশ্যই থাকে। কিন্তু যখন দেহবোধ ও জগৎবোধ কিছুই নেই সবই স্থিরব্রহ্মে মিলে মিশে একাকার তখন ওঁকার ধ্বনি কোথায়? তাই যোগিরাজ বলছেন প্রাণকর্ম করতে করতে যখন এই প্রকার ওঁকার ধ্বনির উদয় হয় তখন সেই ধ্বনিতে সকলেরই তন্ময় হওয়া উচিত। ওই ওঁকার ধ্বনির সঙ্গে যতই নিরবিচ্ছিন্নভাবে তন্ময় হওয়া যায় এবং আরো অধিক উত্তম প্রাণকর্ম করা যায় তখন সকল ধ্বনির অতীতে সম্পূর্ণ স্থিরত্ব লাভ করে যোগী মহাশূন্যে বিলীন হন। অতএব যতক্ষণ ওঁকার ধ্বনি ততক্ষণও দ্বৈত বর্তমান, কিন্তু যখন ওঁকার ধ্বনি নেই এক মহাশূন্য তখন অদ্বৈত। যত সুমধুর বাদ্যধ্বনি বা সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি তার ভেতরেও ওঁকার ধ্বনি বর্তমান থাকে, কিন্তু ওই বাদ্যধ্বনি বা সঙ্গীত ধ্বনি ওঁকার ধ্বনিতে না থাকায় এগুলো ওঁকার ধ্বনি নয়। তাই এই সব স্থূল ধ্বনি শুনলে ওঁকার ধ্বনি শোনা হয় না, কারণ সকল স্থূল ধ্বনিই পঞ্চভূত হতে জাত, সরাসরি প্রাণ হতে জাত নয়। কিন্তু দেহাভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম

ওঁকার ধ্বনি সরাসরি প্রাণ হতে জাত। সকল জন্তুদের বিবেক না থাকায় তারা বাহ্য ধ্বনিতে মোহিত হতে পারে, যেমন সাপ বংশী ধ্বনিতে মোহিত হয়, কিন্তু তাই বলে মানুষের মোহিত হওয়া উচিত নয়। কারণ জন্তুরা চেষ্টা করলেও নিজ দেহাভ্যন্তরস্থ ওঁকার ধ্বনি শুনতে সক্ষম হয় না, কিন্তু মানুষ চেষ্টা করলেই ওঁকার ধ্বনি শুনতে পারে, কারণ মানুষের বিবেক আছে। যোগী যখন নিজ দেহাভ্যন্তরস্থ ওঁকার ধ্বনি শ্রবণে তন্ময় হন তখনই তিনি এ জগতের সকল ধ্বনি ও সৃষ্টির মূলে প্রাণের চঞ্চলতা প্রযুক্ত যে সূক্ষ্ম ওঁকার ধ্বনি বর্তমান তাও তিনি শুনতে পান। এই অবস্থাপন্ন যোগী সকল পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের মধ্যেও যে সূক্ষ্ম ওঁকার ধ্বনি, এমনকি একটি ধূলিকণার মধ্যেও যে ওঁকার ধ্বনি তা জানতে পারেন এবং সকলের সুখ দুঃখ অনুভব করতে পারেন। তখন যোগীর সর্বভূতে ও সর্বজীবে যে অনাদি অনন্ত ওঁকার ধ্বনি আছে তার জ্ঞান হয়। তাই যোগিরাজ সকল মানুষকে আহ্বান করে বলছেন যে জন্তুদের পক্ষে এই ওঁকার ধ্বনি শোনা সম্ভব নয় ঠিকই, কিন্তু তুমি ত মানুষ, তোমার বিবেক আছে, তুমি কেন এই জাগতিক ধ্বনিতে, পঞ্চভৌতিক ধ্বনিতে মোহিত হবে; একটু চেষ্টা করলেই সেই অনাদি ওঁকার ধ্বনি নিশ্চয়ই শুনতে পারো। অতএব হে প্রিয় মানুষ, তুমি উত্তম প্রাণকর্ম করার জন্য চেষ্টা করো তাহলেই সেই অনাদি অনন্ত ধ্বনি শুনতে পাবে তখন আর তোমাকে জগতের ধ্বনি অর্থাৎ পঞ্চভৌতিক ধ্বনি আকৃষ্ট করতে পারবে না। এভাবে প্রথমে নিজের দেহের ভেতরে প্রবেশ করে সেই ওঁকার ধ্বনিকে শোনো তাহলেই জগতের জন্য তোমার প্রাণ কাঁদবে আর তখনই তুমি হবে দয়ার মূর্ত প্রতীক। তাই যোগিরাজ বলেছেন—'ওঁকার ধ্বনির শোনরে সুর, যেথানে জ্যোতি প্রচুর'।

"সূর্য্যই ব্রহ্মরূপ হয় এবং সূর্য্যই জগত আধার
হয় ওহি অটল ছত্র—ওহি সূর্য্য ফির হম
নিরাকার ব্রহ্ম হোতে হয়—অব শ্বাসাকা চলনা
ও ন চলনা মালুম ন হোয়—বড়া মজা" ॥ ৫৬ ॥

সূর্য এক এবং আকাশে উদীয়মান এই সূর্যকেই সকলে সূর্য বলে জানে। এছাড়া আর কোনো সূর্য আছে একথা যোগী ব্যতীত আর কেউ জানেন না। বৈজ্ঞানিক মতে এই সূর্য গ্যাসীয় পদার্থ এবং এরও উৎপত্তি আছে। জাগতিক নিয়ম অনুসারে যারই উৎপত্তি আছে তার বিনাশও আছে। অতএব এই সূর্য অবিনাশী নয়, এরও একদিন

বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। বৈজ্ঞানিক মতে যদিও এই সূর্য হতেই বর্তমান পৃথিবীর উৎপত্তি। কিন্তু জগৎ বলতে কেবলমাত্র এই পৃথিবীকে বোঝায় না। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী, আকাশ, বাতাস সবকিছু মিলে যে অবস্থা তাকেই জগৎ বলে। অতএব যোগীর মতে এই জগতের যা উৎপত্তিস্থল সেটাই সূর্য অর্থাৎ আত্মসূর্য। শাস্ত্রের নানান জায়গায় ঋষিরা নানাভাবে এই সূর্যের কথাই বলেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সকল পণ্ডিত ও ভাষ্যকারগণ সেই সূর্য সম্বন্ধে আত্মসূর্যের কথা না বলে আকাশে উদীয়মান এই সূর্যের কথাই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যোগিরাজ বলেছেন আকাশের এই সূর্য যেহেতু অনিত্য এবং জগতের উৎপত্তিস্থলরূপে গণ্য নয়, অতএব শাস্ত্রোক্ত ওই সূর্য হোলো আত্মসূর্য, এবং সেই আত্মসূর্য নিত্য, শাশ্বত, অবিনাশী ও জগতের আধার স্থল। সেই আত্মসূর্য কেবল যোগিগণই দেখতে সক্ষম। গীতাতে অর্জুনও এই আত্মসূর্যের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন আকাশের এই সূর্যের মত যদি সহস্র সূর্য একসঙ্গে উদিত হয় তাহলে সেই মহান্ আত্মসূর্যের মত হতে পারে। এর থেকে বোঝা যায় যে গীতাতে আকাশের এই সূর্যের কথা বলা হয়নি, আত্মসূর্যের কথাই বলা হয়েছে। আকাশের এই সূর্যও পঞ্চভূতের মধ্যে গণ্য। এই সূর্য সম্বন্ধে শাস্ত্রকার আরও বলেছেন—দেবত্রয়ং স ভগবানংশুমালী দিবাকরঃ। সর্ব্বেষাং মহসাং রাশিঃ কালঃ কালপ্রবর্ত্তকঃ॥ অর্কমুদ্দিশ্য সততমস্মল্লোকনিবাসিনঃ। শ্রুতিং হ্যদাহরন্তীমাং সারাসারবিবেকিনঃ॥ এষো হ দেবঃ প্রদিশোঽনু সর্ব্বাঃ পূর্ব্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ। স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্‌জনাস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ॥ সদৈবমুপতিষ্ঠেরন্ সৌরৈঃ সূক্তৈরতন্দ্রিতাঃ। যে নমস্যন্ত্র তে বিপ্র বিপ্রা ভাস্করসন্নিভাঃ॥ [কাশীখণ্ডম্ ৯ অধ্যায়, শ্লোক ৫৯—৬২]

অর্থাৎ ভগবান্ সূর্য, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবময়, তিনি সমস্ত তেজরাশি এবং কালপ্রবর্ত্তক। এই লোক-নিবাসী সারাসার-বিবেচকগণ, সূর্যকে উদ্দেশ করে শ্রুতিবাক্য কীর্তন করেন। এই সূর্যদেব সমস্ত দিকে ব্যাপ্ত, এঁর জন্ম নেই, ইনি গর্ভে অবস্থান করেন, ইনিই জন্মগ্রহণ করেন, ইনিই জন্মগ্রহণ করবেন, ইনিই সমস্ত ব্যাপী অবস্থিত এবং এঁর মুখ সবদিকেই বর্তমান। যে ব্রাহ্মণ অনলস হয়ে সর্বদা সূর্য-সূক্তের দ্বারা সূর্যদেবের আরাধনা ও প্রণাম করেন তিনি সূর্যের ন্যায় হয়ে থাকেন। কাশীখণ্ড এই সূর্য সম্বন্ধে আরো বলেছেন—উন্মীল্য নয়নে যাবৎ স পশ্যতি তপোধনঃ। তাবদ্দদর্শ সহস্রাংশুসহস্রাধিকতেজসম্॥ [কাশীখণ্ডম্ ১৩ অধ্যায়, ১৪৩ শ্লোক]

অর্থাৎ তপস্বী অলকাপতি নেত্র (জ্ঞানচক্ষু বা কূটস্থ) উন্মীলন করে উদীয়মান সহস্র সূর্য অপেক্ষা অধিক দীপ্তিশালী তপোধন বিশ্বনাথকে দেখতে পেলেন। (বিশ্বের যিনি নাথ অর্থাৎ উৎপত্তিস্থলরূপ যে আত্মসূর্য)। সেই বিশ্বনাথ বর দিতে

চাইলে অলকাপতি বললেন যাতে আপনার চরণদর্শনে সমর্থ হই সেই প্রকার দৃষ্টি-সামর্থ প্রদান করুন। উমাপতি সেই দৃষ্টি-সামর্থ প্রদান করায় অলকাপতি নয়ন উন্মীলন করে প্রথমেই উমাকে দর্শন করলেন। যোগিরাজও এই প্রকার দর্শন করে বলেছেন—মহাদেব ও পার্ব্বতী দেখা, পার্ব্বতী হমে চুমা দিযা। শাস্ত্রকার আরও বলেছেন—অর্চ্চিতঃ সবিতা যেন তেন ত্রৈলোক্যমর্চ্চিতম্ ॥ অর্চ্চিতঃ সবিতাস্থতে সুতান্ পশু বসূনি চ। ব্যাধীন্ হরেদ্দদাত্যায়ুঃ পূরয়েদ্বাঞ্ছিতান্যপি ॥ অয়ং হি রুদ্র আদিত্যো হরিরেষ দিবাকরঃ। রবির্হিরণ্যগর্ভোঽসৌ ত্রয়ীরূপোঽয়মর্য্যমা ॥ রবেস্তু তোষণাতুষ্টা ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। ইন্দ্রাদয়োঽখিলা দেবা মরীচ্যাদ্যামহর্ষয়ঃ ॥ . মানবা মনুমুখ্যাশ্চ সোমপাদ্যাঃ পিতামহাঃ। [কাশীখণ্ডম্ ৩৫ অধ্যায, শ্লোক ১৬৪—১৬৮]

অর্থাৎ যিনি এই সূর্যের অর্চনা করেন, তিনি ত্রৈলোক্যে অর্চিত হন। সূর্যদেব আরাধিত হযে অর্চকের সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ করেন। এই আদিত্যদেবই রুদ্র, ইনিই বিষ্ণু, ইনিই হিরণ্যগর্ভ এবং ইনিই বেদত্রীত্রয়স্বরূপ। এই সূর্যের পরিতোষে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্রাদি দেবসকল, মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ, মনু প্রমুখ মানবগণ এবং সোমপাদি পিতামহগণ পরিতোষ লাভ করেন। আবার এই সহস্রাংশু দর্শন করে অর্জুন বলেছেন—

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যযঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ (গীতা ১১।১৮)

তুমি অক্ষর পরমব্রহ্ম, তুমিই একমাত্র জ্ঞাতব্য, তুমিই এই বিশ্বের প্রকৃত আশ্রয়-স্থল, তুমিই অব্যয ও শাশ্বত ধর্মগোপ্তা এবং তুমিই সনাতন পুরুষ এটাই আমার অভিমত। অর্থাৎ তুমিই কূটস্থ চৈতন্য ও স্থিরপ্রাণরূপ অক্ষর পুরুষ। তোমার ক্ষয নেই তাই তুমি অক্ষর। আবার কূটস্থের ঊর্ধ্বে সহস্রারে তুমিই অব্যক্তরূপী মহাপ্রাণ পরমব্রহ্ম ; একমাত্র জানবার বস্তু, তাই তোমাকে জানারূপ আত্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। অতএব তোমাকে জানলে আর জানবার কিছু বাকি থাকে না তাই তুমি একমাত্র জ্ঞাতব্য। তুমিই জগতের প্রধান আশ্রয় কারণ অব্যক্ত ব্রহ্মের যে স্থিরাবস্থা সেই স্থিরাবস্থার শেষ না থাকায় জগতের আধার স্বরূপ পরম আশ্রয় ও নিত্য অর্থাৎ স্থিরপ্রাণ। তুমিই শাশ্বত ধর্মগোপ্তা অর্থাৎ সনাতন ধর্মের পালক কারণ সনাতন ধর্মের যোগক্রিয়ার অভ্যন্তরে তুমিই গুপ্তভাবে নিহিত আছ যা গুরূপদেশরূপ উপায় দ্বারা একমাত্র এই রহস্য ভেদ করতে পারা যায়। আবার তুমিই সনাতন আদিপুরুষ কারণ তোমার আগেও কেউ নেই পরেও কেউ নেই, এটাই আমার অভিমত।

অতএব শাস্ত্রোক্ত এই সূর্য আত্মসূর্য, আকাশের সূর্য নয়। যোগিরাজও এই আত্মসূর্যকে বারবার বহুভাবে দেখেছেন এবং সেকথা তাঁর গোপন দিনলিপিতে নিভৃতে লিপিবদ্ধ করেছেন। আত্মসাধন করতে করতে যখন তাঁর শ্বাসের গতি চলছে কি চলছে না সে বিষয়ে কোনো খেয়াল নেই অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে যখন থেমে গেছে তখন তিনি এই আত্মসূর্য দর্শন করে বলেছেন এটাই জগতের আধার এবং সব কিছুর অচঞ্চল বা দৃঢ় আচ্ছাদন। এই আত্মসূর্যই ব্রহ্মের রূপ। সব কিছু এখান থেকেই উৎপত্তি এবং এখানেই লয়। ওই আত্মসূর্যই আমি এবং সেই আমি নিরাকার ব্রহ্ম। এই আত্মসূর্যই সবকিছুর মালিক। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কালী দুর্গা সহ সকল দেবদেবীর এখান থেকেই উৎপত্তি এবং এখানেই লয়। যোগিরাজ আরো বলেছেন—"সূর্য্যনারায়ণ মালিক—ওহি সূর্য্য মালিক—ওহি সহস্রাংশু হয়।" এই আত্মসূর্যই নারায়ণ। তাই নারায়ণ প্রণামে বলা আছে—সবিতৃ-মণ্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণ ইত্যাদি। তিনিই মালিক এবং তিনিই সহস্রসূর্যের কিরণ বিশিষ্ট। অর্জুনও সেকথাই বলেছেন। যোগিরাজ আরো বলেছেন—"আদিত্য সেরা পুরুষ হয়—অব সহজে আওএ যায"। এই সহস্রাংশুই সেরা পুরুষ অর্থাৎ প্রধান এখন তা চোখ বুঝলে সহজেই দর্শন হচ্ছে। এ অবস্থা এখন তাঁর সহজ স্বভাব-সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এই সহস্রাংশু দর্শনই বিশ্বরূপ দর্শন। এটাই শশিসূর্য্যনেত্রম্। এই বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জুনের মত বীর সাধকও অতি ভীত হয়েছিলেন, কিন্তু যোগিরাজ বলছেন চোখ বুঝলেই সহজেই তা দর্শন হয়, এমনই স্বাভাবিক অবস্থা তাঁর হয়েছিল অর্থাৎ এই বিশ্বরূপদর্শনে তিনি মোটেও ভীত হননি। যোগিরাজ এই আত্মসূর্যকে আবার অন্যভাবেও দেখেছেন, এ বিষয়ে তিনি বলেছেন—"সূর্য্য ও জ্যোত, ফির ওহি কারণবারি হোতা হয় উসিসে সব উৎপত্তি আউর উসিসে লয়। অব শ্বাসা ভিতর ভিতর জাতা হয় থোড়া বাহর ভি জাতা হয়। আজ মন সঙ্গ দেশেসে একদফা খবার গয়া ইসসে প্রভুকা দর্শন ও ধ্বনি আজন দেখনে সুনা—স্ত্রী পুরুষকা কাল হয় ইস্কে তরফ তাকনা নহি, ভুল করকে ভি চাহিএ না।"—এই আত্মসূর্য এবং তার জ্যোতিই সবকিছুর কারণবারি, সেই কারণবারি হতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি এবং তাতেই লয়। এখন শ্বাস ভেতরে ভেতরে চলছে, আবার সামান্য কিছু বাইরেও যাচ্ছে। প্রাণকর্ম করতে করতে এখন এমন অবস্থা হোলো যে আজ মন সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয়সঙ্গ রহিত হোলো, এই অবস্থায় প্রভুর দর্শন হোলো এবং ওঁকার ধ্বনির প্রকাশ হোলো। এই লয়স্থলই যোগীর কাছে ভীতিরূপে প্রকাশ হয়। এই অবস্থা স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের কাছে কালস্বরূপ। তাই এই কালস্বরূপের প্রতি কখনও তাকাবে না, ভুল করেও এই অবস্থাকে দেখবে না। প্রাণের যে স্থির অবস্থা তার দুটো দিক আছে—একটা বিষ্ণু

বা ব্যাপ্তি এবং অপরটা কালস্বরূপ নিধনকর্তা। তাই যোগিরাজ বলছেন এই কালস্বরূপ নিধনকর্তার প্রতি যেন যোগী কখনও দৃষ্টি না দেন। অবশ্য উভয় অবস্থাই যোগীর নিকট আসবে এবং উভয় জ্ঞানকেই লাভ করতে হবে, তথাপি যোগীর কর্তব্য ওই কালস্বরূপ নিধনকর্তার দিকে নজর না দেওয়া, নজর দিলেই কালগ্রাসে পতিত হতে হয়। অর্জুন এই কালগ্রাসের দিকে নজর দেওয়ায় ভীত হয়েছিলেন। তাই যোগিরাজ সকল যোগীকে এ বিষয়ে সাবধান করেছেন।

এই আত্মসূর্যই নারায়ণ। যোগী যখন সহস্রারে স্থিতিলাভ করেন তখন তিনি সহস্র সূর্য দর্শন করেন। এই সহস্র সূর্যই সহস্রকৃষ্ণ। যোগিরাজ এই সহস্রারে উপনীত হয়ে হাজার সূর্য দর্শন করে বলেছেন—"হাজার কিষুণ দেখা"। এই হাজার সূর্য যখন লুপ্ত হয়ে এক সূর্যে পরিণত হয় তখন তিনিই বৃহৎ কৃষ্ণ, তাই যোগিরাজ বলেছেন—"বৃহৎ কিষুণ দেখা"। এই বৃহৎ কৃষ্ণ যাকে বৃহৎ কূটস্থ বা বৃহৎ আত্মসূর্য বলা হয় তিনিই সবকিছুর মূল আধার, সব কিছুর উৎপত্তিস্থলরূপ কারণবারি ও সহস্রাংশু; আবার যখন আরো অধিক আত্মকর্ম করতে করতে সেই এক আত্মসূর্যও নেই, সবকিছু মিলেমিশে গিয়ে কেবল মহাশূন্যই বর্তমান, তাই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মই নিরাকার, নিশ্চল ও অদ্বৈত।

"পাঁচ ইন্দ্রিয়েঁাকো পরে মন য়ানে শ্বাসা—মনকে পরে বুদ্ধি য়ানে বিন্দি—বুদ্ধি সে পরে ব্রহ্ম নিরাকার শূন্য নির্ম্মল" ॥ ৫৭ ॥

ইন্দ্রিয়দের দুটো বিভাগ আছে—কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়। পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় যথা বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা, ত্বক। এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা মানুষ সব কর্ম করে থাকে এবং পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা সকল প্রকার জ্ঞান আহরণ করে। মনকেও ইন্দ্রিয় বলা হয়; তবে মন ওই দশ ইন্দ্রিয়দের পরিচালনা করে বলে মনকে ইন্দ্রিয়দের অধিপতি বলা হয়। পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় স্থূল, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় অপেক্ষা সূক্ষ্ম। যোগিরাজ বলছেন এই সূক্ষ্ম পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতীতে মনের অবস্থান। মনরূপী ইন্দ্রিয় এই কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় অপেক্ষা সূক্ষ্ম হওয়ায় তাদের ভেতরে ওতোপ্রোতভাবে থেকে তাদের পরিচালিত করে। এই মনকে যোগিরাজ বলেছেন শ্বাস। কারণ শ্বাসের অস্তিত্বে মনের অস্তিত্ব। শ্বাস-প্রশ্বাস যতক্ষণ আছে ততক্ষণ বর্তমান চঞ্চল মনও আছে; শ্বাস স্থির হলে আর বর্তমান মনের অস্তিত্ব থাকে না। তাই যোগিরাজ বলেছেন

মনই শ্বাস। যোগিরাজ আরো বলেছেন মনের পরে বুদ্ধি অর্থাৎ বিন্দু। কারণ শ্বাস স্থির হলেই মন স্থির এবং মন স্থির হলেই স্থির বুদ্ধির উদয় হয়। অতএব শ্বাস, মন এবং বুদ্ধি এই তিনটি জিনিস যখন থেমে যায়, তখন এই তিনের উৎপত্তিস্থল যে বিন্দু তা তখন কূটস্থে প্রকাশিত হয়। কূটস্থই হোলো এই তিনের উৎপত্তিস্থল ও মিলনস্থল। তাই যোগী যখন ওই বিন্দু দর্শনে স্থির হন তখন তিনি আপনা হতেই কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, চঞ্চল মন এবং বুদ্ধির অতীতে আপনা হতে স্থিতিলাভ করতে সমর্থ হন। এরপর যোগিরাজ বলেছেন সব কিছুর মিলনস্থান ওই যে বিন্দু, যাকে আবার স্থিরবুদ্ধি বলা হয় তারও অতীতে অর্থাৎ যখন আর বিন্দুও থাকে না তখন ব্রহ্ম। তখন কোনো কিছু দেখাদেখি, জানাজানি ইত্যাদি না থাকায় সেই ব্রহ্ম নিরাকার, নির্মল ও শূন্যস্বরূপ। শাস্ত্রও তাই বলেছেন—

স্পর্শনং রসনং চৈব ঘ্রাণং চক্ষুশ্চ শ্রোত্রম্।
পঞ্চেন্দ্রিয়মিদং তত্ত্বং মন সাধন্তমিন্দ্রিয়ম্ ॥ (জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র ২৮ শ্লোক)

স্পর্শ, রসনা, ঘ্রাণ, চক্ষু এবং কর্ণ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যে পঞ্চ তত্ত্ব তার পরে মনরূপী ইন্দ্রিয়।

এর থেকে বোঝা গেল যে যোগীকে সমস্তপ্রকার কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও বিন্দুর অতীতে যেতে হবে তবেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে। কারণ এরাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অন্তরায় স্বরূপ। যদিও এরা সবাই সেই শূন্যরূপী স্থিরব্রহ্ম থেকে জাত, তথাপি এরা ক্রমান্বয়ে অধিক চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ায় এরাই জীবকে চঞ্চল অবস্থায় থাকতে বাধ্য করে। ব্রহ্মের অস্তিত্বে এদের অস্তিত্ব ঠিকই, তথাপি এরা ব্রহ্ম নয়। এদের ভেতর সেই শূন্যরূপী স্থিরব্রহ্ম বর্তমান থাকেন, কিন্তু এরা কেউ ব্রহ্মে অবস্থিত নয়। তাই এরা যতক্ষণ কর্মক্ষম আছে, ততক্ষণ যোগী ব্রহ্ম থেকে দূরে আবার এদের অনুপস্থিতিতে ব্রহ্মের নিকটে। এইসব কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনের অতীতে অন্তর্মুখী আত্মকর্ম করতে করতে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই বুদ্ধিরূপা জননীস্বরূপা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম সত্যস্বরূপ স্থির বিন্দু প্রতিভাসিত হয় এবং যোগী তখন ওই স্থির বিন্দুতে স্থিতিলাভের চেষ্টা করেন। তাই যোগিরাজ বলেছেন— 'বিন্দুমে আটক রহনা কাম হয়।' মনের দুটো অবস্থা—চঞ্চল ও স্থির। জীব তার বর্তমান চঞ্চল মনকেই মন বলে জানে। এর অতীতে যে স্থির মন আছে তা জীবের অজানা। যোগীর কাছে সেই স্থির মনই প্রকৃত মন এবং চঞ্চল মন বিভ্রান্তকারী। এই বিভ্রান্তকারী মনেতে যখন যা উদয় হয়, জীব তাই করে। তাই যোগিরাজ বলেছেন— 'মনেতে যেটা হয় শরীরেও সেইটে হয়, মনের আবরণ গেলে শরীরের আবরণ যাইবে ক্রমশঃ।' অর্থাৎ মানুষ যখন হর্ষ, ক্রোধ, দুঃখ ইত্যাদি যখন যা প্রাপ্ত হয় তখন

সেই অনুসারে তার দেহেও প্রতিফলন হয়। কিন্তু যখন মনের আবরণ অর্থাৎ প্রাণকর্ম করতে করতে চঞ্চল মন যতই স্থিরত্ব অভিমুখে যায় ততই ওই সব আবরণ তিরোহিত হতে থাকে, শেষে যখন সবই তিরোহিত হয় তখন জ্ঞানরূপা বিন্দুর প্রকাশ হয়। একারণেই যোগিরাজ বলেছেন—'মন মে কুছ নহি, ধ্যান ধরো সবকুছ হয়। ধোকা দেনা, মানে মন যো খালি হয় উসকা দেকে মনমে যো পরমেশ্বরকা রূপ হো যানা—ইসিকো বাংলামে ফাকি দিয়ে নেয়া কহাতা হয়।' অর্থাৎ চঞ্চল মনে কিছুই হয় না, ধ্যানের মাধ্যমে অর্থাৎ প্রাণকর্মের মাধ্যমে সবকিছু লাভ করা যায়। তখন চঞ্চল মনকে শূন্যমনে মিলিয়ে দিয়ে নিজেই শূন্য হওয়া যায়। এই শূন্যই পরমেশ্বর, অতএব তখন নিজেই পরমেশ্বর হওয়া যায়। এই প্রকারে নিজের বর্তমান সমস্ত অস্তিত্বকে বিলুপ্তি ঘটিয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে দেওয়াটাই জীবনের পরমপুরুষার্থ ও কাম্য। আত্মকর্ম করতে থাকলে এই অবস্থালাভ আপনাহতেই হয়, তাই যোগিরাজ বলেছেন ফাকি দিয়ে এই অবস্থা লাভ করা যায়। ফাকি দিয়ে অর্থে প্রাণকর্মের দ্বারা বর্তমান চঞ্চল মনকে শূন্যমনে আপনাহতে মিলিয়ে দেওয়া। সেই মিলিয়ে দেওয়ার জন্যই যোগিরাজ বলেছেন—'জ্যোত কে বাদ মন নিরাকার রূপ। নির্মল রূপমে মনকো লয় করনা চাহিএ।' অর্থাৎ ওই বিন্দুর উদয়ে যে জ্যোতির প্রকাশ হয় সেই জ্যোতির অতীতে নিরাকার মনের অবস্থান। তাই ওই নির্মল রূপে অর্থাৎ জ্যোতির অতীতে বর্তমান চঞ্চল মনকে সম্পূর্ণরূপে মিশিয়ে দিতে হবে, লয় করাতে হবে। ওই অবস্থাটাই মনের উৎপত্তিস্থল। তাই তিনি বলেছেন—'ধ্বনিকে অন্তরগত জ্যোত যো জ্যোতিকি সূর্য্যসে আতা হয়—উসকে ভিতর মন হয়—ওহি মনমে লয় হোনা বিষ্ণুকা যো পদ হয—ইসিমে শ্বাসা সমায় জাতা হয।' ওঁকার ধ্বনির মধ্যে যে আত্মজ্যোতি তা ওই আত্মসূর্য হতে আসে; অতএব ওই আত্মসূর্যের ভেতরে মনের অবস্থান অর্থাৎ স্থিরমনের উৎপত্তিস্থান। সেই স্থির মনে লয় হতে পারলে যে অবস্থার উদয় হয় সেই অবস্থাই বিষ্ণুপদ। সেই বিষ্ণুপদে পুনরায় শ্বাস মিলে যায় অর্থাৎ যা স্থিরমন তাই বিষ্ণুপদ এবং তাই শ্বাসরহিত অবস্থা। জীবের যে বর্তমান শ্বাস চলছে, যে শ্বাসের অস্তিত্বে জীবের বর্তমান অস্তিত্ব, সেই শ্বাস ওই স্থির অবস্থা হতেই আসে যাকে বিষ্ণুপদ বলে, আবার প্রাণকর্মের মাধ্যমে এই শ্বাসকে পুনরায় সেই স্থিরাবস্থায় মিলিয়ে দিতে হবে। এই প্রকারে মিলিয়ে দিতে পারলে তবেই সমাধি অবস্থা লাভ হয়। তাই তিনি বলেছেন—'শূন্য ভবন আউর সফা জিভ আউর উপর উঠা অব বড়া মজা এক উজিয়ালা উসিসে সব দেখলাতা হয় আউর কুছভি নহি দেখলাতা হয় উসিসে মন ঠহর জানেকো নাম সমাধি।' সহস্রার চক্রস্থ সেই অনাদি অনন্ত শূন্যঘর আরো পরিষ্কার দেখলায়, জিহ্বা আরো ওপরে উঠে তালুকুহরে আটকিয়ে

গেলো। এই অবস্থায় বড়ই আনন্দ। তখন ভোরের আকাশের মতো, না আলো না অন্ধকার এরকম স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতায় এ জগতের সবকিছু দেখতে পেলাম। পরমুহূর্তেই আবার কিছুই দেখা গেল না, কারণ তখন আর দেখাদেখির মতো অবস্থাও থাকলো না, যে দেখবে সেই চঞ্চল মন আর নেই। যতক্ষণ দেখাদেখি ততক্ষণ অবশ্যই দ্বৈত, কিন্তু যখন সবকিছু মিলেমিশে একাকার, যখন এক শূন্যব্রহ্ম তখন আর দেখাদেখি জানাজানি থাকে না, এই অবস্থাই অদ্বৈত। এই অবস্থায় মনকে সম্পূর্ণরূপে মিলিয়ে দিয়ে শূন্যব্রহ্মে অবস্থান করার নাম সমাধি। এই সমাধিই যোগীর কাম্য যা সম্পূর্ণরূপে প্রাণকর্ম সাপেক্ষ।

"উহতে বেমন কেমন কেমন মন ন পাওয়ে।
মন ছোড়েতো মন নহি হাওয়ে" ॥ ৫৮ ॥

সাধারণ মানুষ যাকে মন বলে জানে তা চঞ্চল মন। এই মন স্বয়ং ইন্দ্রিয়। এই চঞ্চল মন অন্যান্য ইন্দ্রিয়দের পরিচালনা করে, তাই সে প্রধান ইন্দ্রিয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ এই চঞ্চল মনের অধীনে থাকে এবং সে যেমন ভাবে ইন্দ্রিয়দের পরিচালনা করায় তারা তেমনি ভাবে কাজ করতে বাধ্য হয়। অতএব চঞ্চল মন স্বয়ং ইন্দ্রিয় এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়দের অধিপতি। এই চঞ্চল মন বুদ্ধির নির্দেশে সকল ইন্দ্রিয়দের স্ব স্ব কার্যে রত রাখে। এই চঞ্চল মনকেই লোকে মন বলে জানে। এই চঞ্চল মনের অতীতে আর একটি যে স্থির মন আছে তা সকলে জানে না। প্রাণকর্মের দ্বারা যখন ঊনপঞ্চাশ বায়ু স্থির হয় তখন চঞ্চল মনও স্থির হওয়ায় যে স্থির মনের উদয় হয় তাই বেমন অর্থাৎ চঞ্চল মনের নিবৃত্ত অবস্থা। যোগিরাজ বলছেন মনের সেই নিবৃত্ত অবস্থা কেমন অর্থাৎ স্থির মন যে কেমন তা বর্তমান চঞ্চল মন জানে না। এই চঞ্চল মনের দ্বারাই ক্রিয়া শুরু করতে হয়। ক্রিয়া অর্থে প্রাণকর্ম চঞ্চল মনের দ্বারাই করা সম্ভব। তাই স্থির মন যে কেমন তা জানবার জন্য চঞ্চল মন চেষ্টা শুরু করল। কিন্তু যখন স্থির মনের উদয় হল তখন চঞ্চল মন নিজেই হারিয়ে গেল, তাই স্থির মন যে কেমন তা তার আর জানা হোলো না। এই চঞ্চল মন তখন না থাকায় কোন প্রকার কর্ম থাকে না তাই স্থির মন নিষ্ক্রিয়। এই স্থির মন নিরাকার ও মহাশূন্য হওয়ায় উহাই ব্রহ্ম। তাই যোগিরাজ আরো বলেছেন মনের এই প্রকার ত্রাণ অবস্থার নাম মন্ত্র। আরো বলেছেন—"এক নির্মল শূন্য দেখা ওহি ব্রহ্ম হয় উসিমে মনকো লয় করনা চাহিএ।" অর্থাৎ কূটস্থে যে নির্মল স্বচ্ছ মহাশূন্য দেখছি এই মহাশূন্যই ব্রহ্ম, এই মহাশূন্যে বর্তমান যে চঞ্চল মন তাকে লয় করতে হবে। এই লয় করা প্রাণকর্ম সাপেক্ষ। বর্তমান চঞ্চল

মনই দুই দেখে। কিন্তু যখন চঞ্চল মন সেই মহাশূন্যরূপী স্থির মনে মিলে যায় তখন আর দুই থাকে না। তখন দুই না থাকায় অদ্বৈত, এই অদ্বৈত অবস্থাই 'হমজাদ' অর্থাৎ পুরুষোত্তম। এই প্রকার স্থির মনকে ভগবান্ বলেছেন 'মন্মনা' অর্থাৎ মনেতে মন রাখ। চঞ্চল মনকে স্থির মনে রূপান্তর কর। এই প্রকার মন্মনা অবস্থা প্রাপ্তির পূর্বে যে আত্মজ্যোতি দর্শন হয় তাও দ্বৈত। তাই তিনি বলেছেন 'নির্মল রূপমে মনকো লয় করনা চাহিয়ে।' অর্থাৎ কূটস্থে এই যে আত্মজ্যোতি দেখছি, এটা কে দেখছে? মন দেখছে। অর্থাৎ এখনও চঞ্চল মনেব সামান্যতম অস্তিত্ব বর্তমান। মনের সেই সামান্যতম চঞ্চল অবস্থাকেও অর্থাৎ মনের সামান্যতম তরঙ্গকেও লয় প্রাপ্তি ঘটিয়ে অরূপে যেতে হবে। এ বিষযে তিনি আরো বলেছেন—"মনকো দুসরে তরফ নহি জানে দেনা চাহিয়ে মনসে মনকো দেখনা চাহিযে। মন ও চক্ষু স্থির হোনেসে ক্যা হোগা জবতক শরীর স্থির ন হোয়। আজ শ্বাসা বিলকুল বাহর নহি নিকলতা হয়। অব বড়া মজা মতওযালকে মাফিক।" অর্থাৎ মনকে কখনো অন্যদিকে যেতে দেবে না। চঞ্চল মনের ধর্মই হোলো এদিক থেকে ওদিকে যাওযা, বিষয় থেকে বিষযান্তরে ধাবিত হওয়া। সেই চঞ্চল মনকে প্রাণকর্মের দ্বারা স্থির করলে যে স্থির মনের উদয় হয়, সেই স্থির মনের দ্বারা মনকে জানতে হবে অর্থাৎ 'মন্মনা' অবস্থা প্রাপ্ত হতে হবে, মনেতে মনকে অবস্থান কবাতে হবে। তিনি আরো বলছেন এই চঞ্চল মন স্থির হোলো এবং চক্ষুও স্পন্দনরহিত হোলো, এই অবস্থায় পৌঁছতে পারলেও সম্পূর্ণ হোলো না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না শরীর স্থির হয়। এই অবস্থায় যোগীকে বাইবের দিক থেকে দেখলে মনে হয় তাঁর শরীর স্থির। কিন্তু যোগী তখনও অভ্যন্তরে অনুভব করেন যে তাঁর হৃদস্পন্দন বর্তমান, শ্বাসের গতি অভ্যন্তরমুখী অর্থাৎ সুষুম্নাগামী। এই অবস্থায়ও যোগীর অভ্যন্তরে সামান্যতম স্পন্দন বর্তমান থাকে। তাই তিনি বলছেন শরীরের অভ্যন্তরে বিন্দুমাত্র কম্পন বা স্পন্দনও যেন না থাকে। এই প্রকারে দেহকে স্থির করতে হবে। যখন এই প্রকারে যোগীর দেহ স্থির হয় তখন মন, চক্ষু, দেহ, সকল ইন্দ্রিয স্থির হওয়ায়, কম্পন রহিত হওয়ায় দেহাতীত অবস্থা লাভ হয়। তখন দেহ আছে অথচ দেহবোধ নেই। তখন যোগী নিজের দেহকে শবে পরিণত করে তার ভেতরে অবস্থান করায় নিজেই শিব হন। শিব অর্থে মহাশূন্য। শ্বাসের গতি রহিত হয়ে আর যখন বহির্মুখী হয় না তখন আটচল্লিশ বায়ু মুখ্য প্রাণবায়ুতে মিলে যাওয়ায় মস্তকোপরি স্থিতি হওয়ায় মাতালের মত গাঢ় অথচ আনন্দদায়ক এক অপূর্ব নেশার উদয় হয়। যোগী এই প্রকারের নেশায় অবস্থান করে সমস্ত কর্ম করে থাকেন। তখন তিনি সব কর্ম করেও কিছুই করেন না। কারণ কিছু করতে গেলে যে চঞ্চল মনের প্রয়োজন তা তখন নেই। যোগী তখন পূর্বঅভ্যাস বশতঃ সকল কর্ম করেন বটে,

কিন্তু সেদিকে মন না থাকায় কিছুই করা হয় না। অর্থাৎ নিষ্কাম বা নির্লিপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হন। যেমন একটি শিশু, তার পুরুষাঙ্গ থাকা সত্ত্বেও সেদিকে মন না থাকায় পুরুষাঙ্গের কর্ম হয় না। এ বিষয়ে তিনি আরও বলেছেন—"জল জবতক ঘটমে তো উস্কা কুছ তাকত নহি, জব গঙ্গামে মিলা তো সব করে।"—জল যতক্ষণ কলসির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তার নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। কিন্তু সেই জল যখন গঙ্গায় মিশে যায় তখন তার অনেক ক্ষমতা। তখন সে গ্রাম, প্রান্তর ভাসিয়ে নেবার ক্ষমতা লাভ করে এবং পবিত্র করতেও সক্ষম হয়। তেমনি এই বহির্মুখী শ্বাস যতক্ষণ দেহ ঘটে সীমাবদ্ধ, যতক্ষণ ইড়া পিঙ্গলার মাধ্যমে আগম নিগমরূপ কর্মে ব্যস্ত ততক্ষণ তার নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। কারণ শ্বাস চঞ্চল থাকায় দেহস্থ সমস্ত ইন্দ্রিয় চালু থাকে এবং মনও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জগতকে দেখে ও ইন্দ্রিয়ে লিপ্ত থাকে। তাই অনন্ত স্থিররূপী যে স্থিরমন তার হদিস পায় না। কিন্তু প্রাণকর্মের দ্বারা এই চঞ্চল শ্বাস স্থির হয়ে যখন স্থির মনে লয় প্রাপ্ত হয় তখন অনন্তে মহাশূন্যে মিশে যাওয়ায় এই শ্বাসই অনন্ত শক্তিসম্পন্ন হয়। যখন এই শ্বাস অনন্তে মিশে যাওয়ায় অনন্ত শক্তি সম্পন্ন হয় তখন কি হয়? এ বিষয়ে যোগিরাজ বলেছেন—"সুন্য নির্ম্মল দেখা উসিমে মিল জানা সমাধি কহলাওএ—ওহি বাকি হয়—পুরুষোত্তমকে আগে ব্রহ্ম হয়—উসিমে লয় হোনা বাকি হয়। লয় বিলকুল নিষ্কাম ন হোনেসে নহি হোগা।" কূটস্থে এই যে নির্ম্মল শূন্য দেখছি তাতে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলে অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হলে যে অবস্থা হয় তাকেই নির্বিকল্প সমাধি বলে। এই প্রকার নির্বিকল্প সমাধি লাভ করাটা এখনও বাকি আছে অর্থাৎ এই প্রকার নির্বিকল্প সমাধি লাভ এখনও হয় নি। কিন্তু এই অবস্থায় যে পুরুষোত্তমকে দেখছি তার অতীতে অর্থাৎ পরে ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মে এখনও লয় হওয়া বাকি আছে অর্থাৎ এখনও তাতে লয় হতে পারিনি। কারণ সেই পুরুষোত্তমকে দেখে কে? মন দেখে। কিন্তু সে কোন্ মন? প্রাণকর্ম করতে করতে চঞ্চল মনের অবসান এবং স্থির মনের উদয়, এই যে প্রান্তসীমা, যেখানে চঞ্চল মনও নেই অথচ স্থির মনের উদয় পুরোপুরি হয়নি, এমন যে প্রান্তসীমা সেখানে এই স্থির মনের দ্বারায় পুরুষোত্তমের দর্শন হয়। তাই এই অবস্থাও দ্বৈত। কিন্তু যখন এই পুরুষোত্তমেরও দর্শন হয় না, কেবল মহাশূন্যই বর্তমান থাকে সেই মহাশূন্যে লয় প্রাপ্ত হতে হবে। এই প্রকার লয় হওয়া এখনও বাকি আছে। কিন্তু এই লয় কেমন করে হবে? সম্পূর্ণ নিষ্কাম না হলে মহাশূন্যে লয় হওয়া যাবে না। নিষ্কাম অর্থাৎ সমস্ত প্রকার কামনা, বাসনা ও তরঙ্গের ঊর্ধ্বের অবস্থা। আরো অধিক প্রাণকর্ম করতে করতে যখন সমস্ত প্রকার তরঙ্গ চলে যাবে তখন নিষ্কাম অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় সেই মহাশূন্যে মিশে যাবে। এই অবস্থার কথা বলতে গিয়ে তিনি আরো

বলেছেন "শূন্য ভবনমে লয় হো জানা"—সেই শূন্য ভবনই আসল, সেই শূন্যের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হতে হবে, লয় হতে হবে এবং সেখানেই আটকিয়ে থাকতে হবে। এই স্থির ঘরে কেমন করে থাকতে হবে সেকথা বলতে গিয়ে বলেছেন—"স্থির ঘরমে ঠহরে—অব অটকনেকা জগহি মিলা"—এখন স্থির ঘরে পাকাপাকি অবস্থান করলাম এবং সর্বদার জন্য আটকিয়ে থাকার মত জায়গা পেলাম। সেই মহাশূন্যরূপী স্থির ঘর যে অত্যন্ত আনন্দদায়ক তা বলতে গিয়ে বলেছেন—"অব ময় আনন্দকা ঘর পায়া য়ানে শ্বাসা ন আওএ ন জাএ"—এখন ব্রহ্মানন্দরূপী সেই যে স্থির ঘর তা পেলাম এবং এই অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাসের আর আসা যাওয়া নেই। এই স্থির ঘরে পাকাপাকি অবস্থান ক'রে ফেলে আসা অতীত জীবনকে অর্থাৎ যে জগৎ সংসার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে এসেছেন, এই সাধন জীবনের সেই অতীত দিকটা এবং স্থূল জগতের ফেলে আসা দিকটা তিনি কেমন দেখছেন ? এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন—"ইহ জীবন হয় সব ঝুট দেখলাই দেতা হয় বাস্তবিক কুছ নহি—জয়সা মুরদা চমড়া লগা রহা ধোকেসে মালুম হোতা হয় কি মেরা শরীরমে লগা হয় আউর মেরা হয়—ওএসেহি জগত সংসারকো মালুম হোতা হয়। ইহ মালুম হুয়া কি ইহ সংসার স্বপ্নবৎ হয়। সব তুছ মালুম হুযা। অব দুসরে পদার্থপর তাকনেকা এরাদা ন করে।"—এই সাধন জীবনের ফেলে আসা দিনগুলি অর্থাৎ অতীত দিনগুলিতে যখন কামনা বাসনার উর্ধ্বে ছিলাম না, যখন চঞ্চল মনের অন্তর্গত থাকায় ইন্দ্রিয়দের সাথে লিপ্ত ছিলাম, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার এরা সবাই যেভাবে পরিচালিত করত সেভাবেই পরিচালিত হতাম, যখন শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বহির্মুখী ছিল বলে জগৎ সংসারকে দেখতাম ; এখন এই মহাশূন্য-রূপী স্থির ঘরে পৌঁছে অতীতের ফেলে আসা দিনগুলি এবং সেই চঞ্চল জীবনের দিকে যখন লক্ষ্য করলাম তখন দেখলাম যে ওইগুলি সবই মিথ্যা। বাস্তবিক পক্ষে জীবনের যে একটা স্থির দিক্ আছে এবং সেটা যে অনাদি, অনন্ত এটা যখন জানতে পারলাম তখন বুঝলাম যে জীবনের ওই চঞ্চল দিকটা কিছুই নয়। যেমন মড়ামাস যখন শরীরে লেগে থাকে এবং মিথ্যা মনে হয় ওটা আমারই চামড়া, তেমনি এই জগৎ সংসারকেও বুঝলাম। আরো বুঝলাম যে এই জগৎ সংসার যাকে আমার আমার বলতাম, স্থূল জগতের বস্তুলাভে কত আনন্দ পেতাম, এখন এই স্থির ঘরে পৌঁছে দেখছি সে সবই স্বপ্নবৎ, অলীক, তুচ্ছ। এখন আর কোনো বস্তুর প্রতি তাকাতে ইচ্ছা করে না। "অব ইহ এরাদা করতা হয় চুপচাপ পড়া রহে"—এখন কেবল এই ইচ্ছাই হচ্ছে যে চুপচাপ পড়ে থাকি।

মানুষের বর্তমান জীবনটা চঞ্চল, শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বহির্মুখী। এই চঞ্চলতাই জীবন। জগৎ ব্রহ্মাণ্ডও চঞ্চল। স্থির ব্রহ্মের চঞ্চলতার একাংশে এই জগৎ প্রকাশিত।

তাই এই জগতের যা কিছু দেখা যায়, অনুভব করা যায় সবই স্থির ব্রহ্মের চঞ্চলতার একাংশের প্রকাশ, তাই ভগবান্ বলেছেন 'একাংশেন স্থিতোজগৎ'। স্থির ব্রহ্মের চঞ্চলতার একাংশেই এই জগতের অস্তিত্ব। যোগী যোগসাধনার দ্বারা যখন স্থির ব্রহ্মে পৌঁছে যান এবং সেখানে যখন অবস্থান করতে সক্ষম হন তখন তিনি দেখতে পান এবং বুঝতে পারেন যে স্থির ব্রহ্মের ওই একাংশ চঞ্চল অবস্থা থেকে জাত এই যে দেহ, মন, বুদ্ধি, সংসার, জগৎ সবই অলীক। একমাত্র ওই স্থিরত্বই আসল, সেই মহাশূন্যরূপী ব্রহ্ম, যার আগেও কেউ নেই পরেও কেউ নেই অনাদি অনন্ত। এই মহাশূন্যে অবস্থান করে পুনরায় বলেছেন—"আজ অভয় পদ দর্শন হুয়া—য়ানে মহাস্থির হুয়া, মোক্ষ হুয়া—ফির উহ সূন্য ঘরমে রহ করকে সবকুছ দেখে সব কুছ করে। যেতনা ইন্দ্রিয় লয় হোতা হয় ওহি শ্বাসামে।"—অভয়পদ যে কি তা আজ জানলাম অর্থাৎ মহাস্থির ঘরই যে অভয়পদ তা জানলাম। অভয় অর্থাৎ যেখানে ভয় নেই। মানুষের সকল ভয়ের মধ্যে মৃত্যু ভয়ই বড় ভয়। যখন মৃত্যু ভয়ও নেই তখন অভয়। যোগী যোগসাধনার দ্বারা জন্ম-মৃত্যুরূপ অবস্থাটা যে কি তা যখন জানতে পারেন এবং এই দেহে থেকে, এই দেহকে শবে পরিণত করে কালাতীত অবস্থারূপী স্থিরব্রহ্মে অবস্থান করেন তখন তাঁর আর মৃত্যুভয় থাকে না। জন্ম হলেই মৃত্যু অনিবার্য। যখন জন্মমৃত্যুর প্রবাহ বা তরঙ্গের উর্ধ্বে মহাস্থির ঘরে যোগী অবস্থান করেন তখন মোক্ষ অবস্থা। এই মহাস্থিররূপী মোক্ষঘরে পৌঁছে বা অবস্থান করে তিনি বলছেন ওই শূন্যঘরে সর্বদার জন্য থেকে জাগতিক জীবনের সবকিছু দেখি এবং করি। কারণ এই অবস্থায় থাকতে পারলে সব কর্মে নিষ্কাম এবং সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকা যায়। এটাই প্রকৃত নিষ্কাম ও নির্লিপ্তের স্থান। এই যে শ্বাসের মহাস্থির অবস্থা, যা অভয়পদ ও মোক্ষপদ, সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ যেখানে লয় হয়ে যায়। এটাই ক্রিয়ার পরাবস্থা।

যোগিরাজের মতে এই স্থির মহাশূন্যই চূড়ান্ত সত্য। কিন্তু তাই বলে তিনি এই জগৎ নানান দেবদেবী, আত্মজ্যোতি, ঈশ্বর ইত্যাদি যা কিছু দেখা যায় সেগুলিকে প্রাথমিক পর্যায়ে অস্বীকার করেন নি। এই যে বর্তমান জীবন তাকেও তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে অস্বীকার করেন নি। যদিও তিনি বলেছেন ওই স্থির মহাশূন্যই চরম সত্য, কিন্তু সেই চরম সত্যে পৌঁছাতে গেলে এই বর্তমান জীবন, জগৎ, নানান দেবদেবী, আত্মজ্যোতি, ঈশ্বর ইত্যাদি যা কিছু দেখা যায় এগুলি এক একটি সোপান বিশেষ। যোগী যতক্ষণ এই সমস্ত সোপানের মধ্যে যখন যে সোপানে অবস্থান করেন তখন তাঁর কাছে সেই সোপানই সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। যেমন এই সোপান-গুলির মধ্যে যে কোন একটি সোপান ততক্ষণই সত্য যতক্ষণ ওই সোপানের অন্তর্গত থাকা যায়। কিন্তু পরিণামে এই সোপানগুলির উর্ধ্বে অর্থাৎ সোপানগুলির উৎসস্থলে,

স্থির মহাশূন্যরূপী ব্রহ্মে যখন অবস্থিত হয় তখন পূর্বোক্ত সোপানগুলি লয় হয়ে যায়, তখন এদের স্ব স্ব অস্তিত্বের অবলুপ্তি হয়। এখানে যোগিরাজ বলতে চেয়েছেন জগৎ, নানান দেবদেবী, আত্মজ্যোতি এরা ততক্ষণই সত্য যতক্ষণ মহাশূন্যে না মিলে যায়। কিন্তু যখন মিলে যায় তখন আর এদের অস্তিত্ব থাকে না। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করে অর্জুন বলেছেন—

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥ (গীতা ১১/২৮)

নদী যেমন সমুদ্রাভিমুখী হয়ে সমুদ্রেই পড়ে, তেমনি সমস্ত নরলোকবীরগণ সর্বতঃ প্রদীপ্যমান তোমার মুখে প্রবেশ করছে। তাই যোগিরাজও বলতেন নদীর ধর্ম যেমন তার কারণস্থল সমুদ্রের দিকে ছুটে যাওয়া, তেমনি জীবের ধর্মও তার উৎসস্থলরূপ স্থির ব্রহ্মের দিকে ছুটে যাওয়া এবং তাতে মিশে যাওয়া, তা সে ইচ্ছা করুক আর নাই করুক প্রকৃতিই তাকে করিয়ে নেবে।

"শরীরেভবঃ শারীরোজীবঃ" শরীরে কূটস্থ ব্রহ্ম যিনি আছেন তিনিই পুত্র হয়ে জন্মেছেন, তাঁতেও সেই কূটস্থ আছেন, তখন সে আত্মা স্বগুণে জীব সংজ্ঞা হয়েছেন, উভয়েতেই আত্মা আছেন অর্থাৎ ক্রিয়া করবার সময় আত্মা আছেন, ক্রিয়ার পর অবস্থাতেও আত্মা আছেন, কারণ ব্রহ্ম সর্বব্যাপক। তবে ক্রিয়া করবার সময় চঞ্চল, ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থির। ক্রিয়া করবার সময় সীমাবদ্ধ, ক্রিয়ার পরাবস্থায় অসীম অনন্ত। ক্রিয়া করবার সময় দুই বা বহু, ক্রিয়ার পরাবস্থায় সবই এক। ক্রিয়া না করা অবস্থায় পঞ্চতত্ত্ব, ক্রিয়া করার সময়ও পঞ্চতত্ত্ব। এই পঞ্চতত্ত্বই ময়লা। কিন্তু ক্রিয়ার পরাবস্থায় তত্ত্বাতীত, তখন শুদ্ধ। ক্রিয়াই প্রধান, কারণ ক্রিয়া না করলে স্থির ব্রহ্মে থাকা যায় না। ক্রিয়াই ধর্ম, কারণ স্থির ব্রহ্মে পৌঁছে দেয়। কিন্তু ক্রিয়ার পরাবস্থায় কোন ধর্ম নেই কারণ তখন কোন কিছু দেখাদেখি নেই জানাজানি নেই, তখন আত্মা পরমাত্মাতে লীন হয়ে এক হয়ে যায়। অতএব না দেখা, না জানাই প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম সাব্যস্ত হল। ক্রিয়ার দ্বারায় যে সকল দেব-দেবী দেখা যায় তা আত্মারই ছায়া মাত্র। এই আত্মাই সকল ভূতে আছেন বক্রভাবে, কিন্তু সোজাভাবে থাকলে অমূল্য ধন।

তাই যোগিরাজকে দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী বলা যায় না। এমনকি তাঁকে নিরীশ্বরবাদী বা শূন্যবাদীও বলা যায় না। তাঁকে কোনো শ্রেণীর অন্তর্গতও বলা যায় না। তাঁর সাধন পদ্ধতি বেদ, বেদান্ত ও গীতা অনুমোদিত। তাঁর

মতে যদিও মহাশূন্যরূপী পরমব্রহ্ম চূড়ান্ত সত্য, 'কিন্তু সেই সত্য কখন হয়? যখন যোগী নিঃশেষরূপে নিশ্চল ব্রহ্মে নিরালম্বে অবস্থান করেন তখনই তাঁর কাছে সেই সত্য উদিত হয় এবং পূর্বোক্ত অবস্থাগুলি অর্থাৎ নানান দেবদেবী, আত্মজ্যোতি, জগৎ ইত্যাদি সবই অলীক ও মরীচিকাবৎ হয়। কিন্তু যতক্ষণ সেই অবস্থায় যেতে না পারেন ততক্ষণ পূর্বোক্ত অবস্থাগুলিও সত্যবৎ প্রতিভাসিত হয়। তাই তিনি একজায়গায় বলেছেন 'এই যে কৃষ্ণকে দেখছি তিনিও মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেলেন।' এই মহাশূন্য কোন্ শূন্য? এ বিষয়ে তিনি বলেছেন— 'শূন্যের ভেতরে যে শূন্য তাই মহাশূন্য, উহাই ব্রহ্ম।' কূটস্থে কৃষ্ণকে দেখা পর্যন্ত দ্বৈত অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত কূটস্থে কিছু না কিছু দেখা যায় ততক্ষণই দ্বৈত। কিন্তু ঐ কৃষ্ণ যখন মহাশূন্যে লয় হয়ে গেলেন, আর কৃষ্ণকে দেখা গেল না, যখন একমাত্র নিশ্চল মহাশূন্যরূপী পরমব্রহ্মই বর্তমান, যে অবস্থায় গেলে আর কিছু দেখাদেখি নেই, জানাজানি নেই, সমস্ত জ্ঞান, বিচার, বুদ্ধির অতীত, যখন যোগী নিজ সত্তার সমস্ত বিলুপ্তি ঘটিয়ে সেই স্বচ্ছ, নির্মল, মহাশূন্যে মিলে মিশে একাকার হয়ে লয়প্রাপ্ত হলেন, যখন আর এই জগৎ সংসারও প্রতিভাসিত হয় না, যখন একমাত্র সেই চূড়ান্ত সত্যই বর্তমান, আর যখন দুই বলবার কেউ থাকে না, যখন দ্রষ্টা ও দৃশ্য বলে কেউ নেই, যখন সবকিছু সেই একে মিলে গেছে, সেই অবস্থাই অদ্বৈত। অতএব যোগিরাজকে একাধারে দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীও বলা যায়, তাঁকে আবার সকারবাদী ও নিরাকারবাদীও বলা যায়, পরিশেষে তাঁকে নিরীশ্বরবাদী ও শূন্যবাদীও বলা যায়। এক কথায় তাঁকে কোনো বাদের অন্তর্গত বলা যায় না অথচ সমস্ত প্রকার-মত, পথ ও বাদের মিলন তাঁতে ঘটেছিল। সমুদ্র যেমন সমস্ত নদীর মিলনস্থল, তেমনি সমস্ত মত, পথ ও বাদের মিলন তাঁতে ঘটেছিল। তাই দেখা যায় এই মহাযোগী সাধনার চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছেও স্বতন্ত্র কোন সম্প্রদায়, মত, পথ ও বাদের প্রতিষ্ঠা করেননি। সাধারণতঃ দেখা যায় অপরাপর মহাপুরুষগণ কোনো না কোনো মত, পথ বা বাদের অন্তর্গত থাকেন এবং সবকিছুর উর্ধ্বে নির্মল নিশ্চল অনন্ত শূন্যরূপী ব্রহ্মে স্থায়ী স্থিতিলাভ না করতে পারায় সেই সেই মত, পথ বা বাদের প্রতিষ্ঠা করে যান। কিন্তু যোগিরাজ সবকিছুর উর্ধ্বে পৌঁছাতে পেরেছিলেন বলেই কোনো মত, পথ বা বাদের প্রতিষ্ঠা করেননি। এই অবস্থার কথা বলতে গিয়ে ভগবান্ বলেছেন বহু বহু ব্রহ্মজ্ঞের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে নিঃশেষরূপে জানতে পারেন অর্থাৎ বহু বহু ব্রহ্মজ্ঞের মধ্যে কোন কোন ব্রহ্মজ্ঞ, যা সংখ্যায় অতি বিরল, যিনি নিঃশেষরূপে নিশ্চল, মহাশূন্যরূপী, অনন্ত, নির্গুণ পরব্রহ্মে স্থায়ী স্থিতিলাভ করতে পারেন। ভগবানের উপরোক্ত বাক্য অনুসারে সেই কেউ কেউ বিরল ব্রহ্মজ্ঞের মধ্যে যোগিরাজের অবস্থান। তাই

সমস্ত প্রকার মত, পথ ও বাদের সমন্বয় বা মিলন তাঁতে ঘটেছিল। যেমন কিছু লোক সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে অনন্ত সমুদ্রকে দেখলো এবং তাদের সমুদ্রজ্ঞান হোলো। এক্ষেত্রে এদের সবাইকে সমুদ্রজ্ঞ বলা যায়। এইরকম বহু সমুদ্রজ্ঞের মধ্যে থেকে কোন এক জন জাহাজে করে সেই সমুদ্রকে অতিক্রম করে পরপারে চলে গেলো। এক্ষেত্রে পূর্বোক্ত সমুদ্রজ্ঞের চেয়ে পরবর্তী নাবিকের যেমন সম্পূর্ণ সমুদ্রের জ্ঞান হয়, তেমনি বহু বহু ব্রহ্মজ্ঞের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে সম্পূর্ণরূপে জানতে পারেন। অর্থাৎ কূটস্থ হল সমুদ্রের বেলাভূমি। বেলাভূমিতে দাঁড়ালে যেমন সমুদ্র দর্শন হয়, তেমনি কূটস্থে অবস্থান করলে ব্রহ্মদর্শন হয়। নাবিক যেমন বেলাভূমি ছেড়ে দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে যায়, যোগীও তেমনি কূটস্থের ঊর্ধ্বে সহস্রারে স্থির শূন্যরূপী ব্রহ্মে লয় হয়ে যান। বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দর্শন করতে পারে অনেকেই, কিন্তু পার হতে পারে যেমন কেউ কেউ, ঠিক সেরকম ব্রহ্মে লয় হতে পারেন বহু ব্রহ্মজ্ঞের মধ্যে কেউ কেউ। ব্রহ্মকে দর্শন করলেই ব্রহ্মজ্ঞ বলা যায় ঠিকই কিন্তু লয় হতে পারেন কজন? যিনি লয় হতে পারেন তিনিই পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ। যোগিরাজ এই প্রকারের ব্রহ্মজ্ঞ এবং গীতাতেও শ্রীভগবান্ 'কেউ কেউ আমাকে সম্পূর্ণরূপে জানতে পারেন' এই কথার দ্বারায় এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞের কথাই বলেছেন। যিনি এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞ তিনি সবকিছুর অতীতে চলে যাওয়ায় কোনো প্রকার মত, পথ, বাদ বা সম্প্রদায় গড়তে পারেন না। কোনো প্রকার মঠ, মিশন, আশ্রম, প্রতিষ্ঠান কোনো কিছুই স্থাপন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। কারণ কোনো কিছু প্রতিষ্ঠা বা স্থাপন করতে গেলে, যে মনের দরকার তা তখন তাঁর থাকে না। এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞের মন, বুদ্ধি বলে কিছুই থাকে না, সব গলে যায়, মিশে যায়, মন তখন 'ভোঁ' হয়ে যায়। কিন্তু যাঁরা এসব প্রতিষ্ঠা বা স্থাপন করেন তাঁদের তাই পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ না বলে আংশিক ব্রহ্মজ্ঞ বলা যায়। উভয় প্রকার সমুদ্রজ্ঞের মধ্যে যেমন অনেক পার্থক্য, তেমনি উভয় প্রকার ব্রহ্মজ্ঞের মধ্যেও বিরাট ব্যবধান। একারণেই শ্রীভগবান্ বলেছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ (গীতা ৭/৩)

সহস্র মানুষের মধ্যে কেউ কেউ সিদ্ধির জন্য প্রযত্ন করেন; আবার সেই সব প্রযত্নবানদের মধ্যে যাঁরা সিদ্ধাবস্থা লাভ করেছেন সেইসব সিদ্ধগণের মধ্যে কেউ কেউ আমায় প্রকৃতপ্রস্তাবে তত্ত্বতঃ জানতে পারেন। অর্থাৎ বিজ্ঞান অবস্থালাভরূপ পরমাত্ম-পদে (স্থির ব্রহ্মে) যাঁর লয়প্রাপ্তি হয়েছে এরূপ ব্যক্তিই সেই অনন্ত নিশ্চল ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে জানতে পেরেছেন। এতে বোঝা গেল যে ভগবান্ স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞের মধ্যে একটা স্তরভেদ দেখিয়েছেন। কারণ ব্রহ্মকে দর্শন করলেই তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞ বলা হয়

ঠিকই, কিন্তু তখনও দেখাদেখি বর্তমান থাকে। এই ধরণের ব্রহ্মজ্ঞের সংখ্যাই অধিক। এঁদের মধ্যে আবার যিনি নিশ্চল ব্রহ্মে সম্পূর্ণরূপে লয় হয়ে যান তিনিই তখন তত্ত্বতঃ জানতে পারেন। অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে তখন আর জানাজানি বা দেখাদেখি না থাকায় এই অবস্থাকেই তত্ত্বতঃ বলা হয়। এমন ব্রহ্মজ্ঞের সংখ্যা বড়ই বিরল।

কোনো কোনো অদ্বৈতবাদী এই অভিমত প্রকাশ করেন যে চূড়ান্তে অদ্বৈত পরব্রহ্মই সত্য এবং এই জগৎ মিথ্যা। তাঁদের মতে নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে এই জগৎ সংসারের কোনো অস্তিত্বই নেই অর্থাৎ এই জগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিন্তু যোগিরাজের মত ঠিক তা নয়। তিনি বলেছেন এই জগতের সঙ্গে যতক্ষণ তুমি সম্পর্কযুক্ত এবং এই জগৎ যতক্ষণ তোমার নিকট দৃশ্যমান ততক্ষণ সত্য কিন্তু পরিণামে সত্য নয়। তেমনি নানান দেবদেবী, আত্মজ্যোতি ইত্যাদি যা কিছু কূটস্থে দেখা যায় এগুলি ততক্ষণই সত্য, যতক্ষণ দেখা যায়। আবার এরা যখন এদের উৎসস্থল নিশ্চল মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যায় তখন পরিণামস্বরূপ নিশ্চল মহাশূন্যরূপী নির্গুণ পরব্রহ্মই পরিণাম সত্য হয়। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। রজ্জুকে যখন সর্প বলে মনে হয় অর্থাৎ রজ্জুতে রজ্জুবোধ না থাকায় ওটা যে নিশ্চয় সর্প এই বোধ বা জ্ঞান মনে উদিত হওয়ায় ওটা যে নিশ্চিতরূপে সর্প তা জানা যায়। কিন্তু যখন রজ্জুতে রজ্জুবোধ বা জ্ঞান হোলো তখন রজ্জুতে সর্পবোধ ও জ্ঞানের নাশ হওয়ায় আর সর্পবোধ নেই। অর্থাৎ যখন রজ্জুতে রজ্জুবোধ বা জ্ঞান তখন রজ্জু এবং যখন সর্পবোধ বা জ্ঞান হল তখন সর্প। তাই যোগিরাজ বলেছেন 'যার যেমন মন সে তেমনি দেখে'। তেমনি জগৎ সংসারে ব্রহ্মবোধ না থাকায় অর্থাৎ জগৎসংসারে জগৎসংসারবোধ ও জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে থাকায় জগৎসংসার সত্য হয়। কিন্তু যোগী যোগ সাধনার মাধ্যমে আরো অগ্রসর হতে হতে যখন পরিণামসত্যে উপনীত হন এবং যখন মহাশূন্যরূপী পরিণামসত্যের জ্ঞান হয়, পরিণামসত্যের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে যান তখন জগৎসংসার, নানান দেবদেবী ইত্যাদি নানাত্বের নাশ হয়। এটাই যোগিরাজের অভিমত।

"সত্য অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা, ত্রেতা অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার পর, দ্বাপর অর্থাৎ ক্রিয়া করার সময় এবং কলি অর্থাৎ ক্রিয়া না করা অবস্থা" ॥ ৫৯ ॥

আমরা সনাতন ধর্মীয় ভারতবাসী চার যুগের কথা শুনে থাকি। সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি। শাস্ত্রের মধ্যেও প্রায় সব জায়গায় এই চার যুগের কথা জানা যায়। বর্তমান কালকে বলা হয় কলিযুগ। এর কয়েক হাজার বছর পূর্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আগমন কালকে বলা হয় দ্বাপর যুগ। তারও কয়েক হাজার বছর পূর্বে শ্রীরামচন্দ্রের আগমন কালকে বলা হয় ত্রেতা যুগ এবং তারও অতীতে সত্যযুগ। এই যুগ সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত ভাবে ১৮ নম্বর শ্লোকে আলোচনা করা হয়েছে। সময়ের ব্যবধানে এই যে চার যুগের নিরূপণ তা হোলো বাহ্যবিচার মতে, এর সঙ্গে আত্মসাধনের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ কাল অনন্ত সর্বব্যাপী, সেই কাল সদাই একরূপ। চার যুগই একই মহাকাল দ্বারা পরিচালিত। অতএব মানব জীবনে আত্মসাধনের পক্ষে এই কালের প্রভাব হয়তো কিছুটা থাকতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। কারণ মানব জীবনে আত্মসাধন করাটা নির্ভর করে তার নিজস্ব ইচ্ছা চেষ্টা ও পুরুষকারের ওপর। যদি কোনো মানুষ আত্মসাধনে উত্তম প্রকারে ব্রতী হয় তবে সে যে যুগেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন তাতে কোন বাধা নেই বা অন্তরায় হয় না। আত্মসাধনে ব্রতী মানুষের কেবল দুটি অন্তরায় আছে, একটি হল তার নিজস্ব ইচ্ছা বা চেষ্টার অভাব, দ্বিতীয়টি হল তার পারিপার্শিক সাচ্ছন্দের অভাব। এই দুটি অভাব সর্বকালের মানুষের কাছেই আছে তবে কম আর বেশী। অতএব যোগী কালের মাধ্যমে অর্থাৎ সময়ের ব্যবধানে যুগ নিরূপণ করেন না। যোগী বলেন এই চারযুগই তোমার বর্তমান জীবনে আছে এবং তাকে জানা সম্পূর্ণরূপে সাধনসাপেক্ষ। একারণেই যোগিরাজ বলেছেন বর্তমানে তোমার ক্রিয়াযোগ সাধন না করা অবস্থাটাই কলিযুগ। এই জীবনে যতদিন ক্রিয়াযোগ সাধন লাভ না করা হয়, ক্রিয়া করতে ইচ্ছা না জাগে অর্থাৎ জীবনে যতদিন ক্রিয়াযোগ সাধন শুরু না করা হয়, জীবনের এই অংশটাই কলিযুগ। তারপর সেই মানুষই যখন ক্রিয়াযোগ সাধন পেলো এবং তা শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস ও আনন্দের সঙ্গে করতে লাগল, জীবনের এই অংশটাই দ্বাপর যুগ। আবার সেই মানুষই আরো উত্তম ক্রিয়াযোগ সাধন করতে করতে যখন তার সমস্ত প্রকার কর্মের অতীতাবস্থার লক্ষ্য হোলো, যখন তার সম্পূর্ণরূপে ক্রিয়ার পরাবস্থা বা নির্বিকল্প সমাধি অবস্থা লাভের ঠিক পূর্বে যে সাময়িক বা ক্ষণস্থায়ী স্থিরাবস্থার উদয় হয়, যোগী যখন এই অবস্থায় উপনীত হন তখন তাঁর জীবনের এই অংশটাই ত্রেতা যুগ।

আবার সেই যোগীই যখন আরো অধিক উত্তম ক্রিয়াযোগ সাধন করতে করতে সম্পূর্ণরূপে ক্রিয়ার পরাবস্থায় অর্থাৎ সকল কর্মের অতীতাবস্থায় অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় পৌঁছে নিশ্চল ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন, যোগীর জীবনের এই অংশটাই সত্যযুগ। কারণ যোগী তখন সকল প্রকার চঞ্চলতার অতীতে সত্যস্বরূপ নিশ্চল ব্রহ্মে লয় হওয়ায় নিজেই সত্য হন। তাই এই চারযুগ হোলো চারটি ক্রিয়া বা চার বেদ যা জাতি ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানবের এই জীবনে বর্তমান। অতএব যা চারযুগ, তাই চার বেদ এবং তাই চারটি ক্রিয়া। এ সবই এই জীবনে বর্তমান। এর সঙ্গে অতীত অতীত কালের বা সময়ের ব্যবধানের কোনো সম্পর্ক নেই, এটাই যোগিরাজের অভিমত। তাই তিনি উদাত্তকণ্ঠে সকল মানুষকে জানালেন—'সকল ধর্মের গুপ্ত মর্ম যে মহাদ্যুতি কূটস্থ তাহাকে জানা চাই। ধর্ম অর্থাৎ ক্রিয়া। সত্য ত্রেতা দ্বাপর বলিতে ক্রমশঃ ক্রিয়ার হ্রাস হয় অর্থাৎ সমাধি হইতে বিজ্ঞানপদ, বিজ্ঞানপদ হইতে জ্ঞান, আর জ্ঞান হইতে ক্রিয়া কম। সত্যযুগে কূটস্থে থাকা, ত্রেতাতে কূটস্থ দেখা, দ্বাপরে ক্রিয়ার দ্বারায় আনন্দ লাভ করা, কলিযুগে ক্রিয়া দেওয়া।' অধ্যাত্ম জগতের এই সব গুপ্ত মর্ম কথা যোগিরাজ বলতে পেরেছিলেন কারণ তাঁর এগুলি প্রত্যক্ষ অনুভব হয়েছিল। বর্তমান কালে এ রকম প্রত্যক্ষ অনুভূতি সম্পন্ন মহাযোগীর অভাব হওয়ায় কালক্রমে ধর্মের সবকিছুই বাহ্যব্যাপারে এবং আড়ম্বরে পরিণত হয়েছে। এটাই বর্তমান কালের মানুষের পক্ষে দুর্ভাগ্য। যোগিরাজের মতে সত্যকার ধর্ম হোলো ক্রিয়াযোগ সাধন করা অর্থাৎ ক্রিয়াযোগরূপ আত্মসাধন ব্যতীত ধর্মের আর যা কিছু আচরণ করনা কেন তা কখনই সত্যধর্মরূপে পরিগণিত হতে পারে না। শাস্ত্রের নানান জায়গায় ঋষিরা একথা বারবার বলেছেন। তাঁর মতে মহাদ্যুতি কূটস্থই হোলো সকল ধর্মের গুপ্তমর্ম। সেই গুপ্তমর্ম মহাদ্যুতি কূটস্থকে যোগসাধনের মাধ্যমে যতক্ষণ জানা না যায় ততক্ষণ মানব জন্ম কিছুতেই সফল হতে পারে না। তিনি কখনো ভাবের আবেগে পরিচালিত না হয়ে, নিজ জীবনে এই যোগসাধন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আচরণ করে প্রত্যক্ষ অনুভূতির মাধ্যমে সরাসরি জানতে পেরেছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে আত্মসত্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন বলেই এত দৃঢ় এবং তেজস্বিতার সঙ্গে সনাতন যোগসাধনের গুপ্ত মর্মকথা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তাঁর বাণী বর্তমান বিশ্বের মানুষের কাছে অভ্রান্তস্বরূপ।

যোগিরাজ যা কিছু বলতেন সেগুলি তাঁর শোনা কথা নয়, শাস্ত্রের ভাষাগত চুলচেরা বিচার নয়। যা কিছু বলতেন সবই তাঁর প্রত্যক্ষ অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানের কথা এবং সেই প্রত্যক্ষ অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে ঋষিদের প্রত্যক্ষ অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে, যা শাস্ত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে লেখা আছে, সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সঙ্গে নিজের

প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে মিলিয়ে নিয়ে তবেই তিনি সব কথা বলতেন। তিনি কখনো বাহ্য বিষয়ের ওপর জোর দিতেন না। পরন্তু তাঁর উপদেশ ছিল সবই তোমার ভেতর আছে, আত্মসাধনের মাধ্যমে সেই নিজ সত্তাকে জানবার চেষ্টা করো, এটাই তোমার একমাত্র কাজ। তোমার তুমিকে জানতে হলে কোনো বাহ্যবস্তু, বাহ্যাড়ম্বর, কোনো প্রকার ভাবের আবেগ, বেশ ভূষা পরিবর্তন বা সংসার ত্যাগ, মঠ মিশন মন্দির মসজিদ গীর্জা আশ্রম কোনকিছুর প্রয়োজন নেই। কেবল আত্মসাধনরূপ ক্রিয়াযোগের মাধ্যমে নিজের ভেতর নিজে সমাহিত হবার চেষ্টা করো। এই ছিলো তাঁর মূল উপদেশ। তাই নিজ অনুভূতির মাধ্যমে শাস্ত্রের গুঢ় রহস্যের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—'বেদ সমুদায় ধর্ম্মের মূল অর্থাৎ ক্রিয়ার দ্বারায় সব জানা যায়। শ্রুতি অর্থাৎ বিনা কথায় যাহা শোনা যায়, স্মৃতি অর্থাৎ শুনে যে স্মরণ করা ইহাই মর্ম্ম কথিত, মনুষ্যতে স্থির করিয়াছে ক্রিয়া করিয়া কির্ত্তিকে পায় ইহলোকে মরে ব্রহ্মেতে লীন হইয়া পরম সুখ প্রাপ্তি হয়। কথা বিনা যাহা শোনা যায় তাহার নাম শ্রুতি, তাহা জানার নাম বেদ, তাহা স্মরণ করিয়া যাহা এক পদার্থ অর্থাৎ ক্রিয়া তাহার নাম শাস্ত্র; ঐ বেদের অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতি মীমাংসা হইবার যো নাই কারণ হঠাৎ আসিয়া পড়ে তাহারি দ্বারায় ক্রিয়া করিতে করিতে প্রকাশ হয়। বেদ স্মৃতি সদাচার অর্থাৎ ক্রিয়া আর আত্মার প্রিয় অর্থাৎ স্থির হওয়া এই চার সাক্ষাৎ ধর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়ার লক্ষণ জানা যায়।'

তাঁর উপদেশ ছিলো ক্রিয়ার নামই শাস্ত্র। এই শাস্ত্র পাঠ করলে অর্থাৎ এই আত্মক্রিয়ার অনুশীলন করলে বেদজ্ঞান লাভ হয় এবং সেই বেদজ্ঞানই অর্থাৎ স্থির-জ্ঞানই সকল ধর্মের মূল। আত্মক্রিয়ার মাধ্যমে এই প্রকারে সবকিছু জানা যায় এবং শেষে স্থিরব্রহ্মে লীন হয়ে পরমসুখ প্রাপ্তি হয়। তাই তাঁর উপদেশ হল বেদ স্মৃতি সদাচার এবং ক্রিয়ার মাধ্যমে স্থির হওয়া এই চারটি সাক্ষাৎ ধর্ম এবং এই চারটির মাধ্যমে ক্রিয়ার লক্ষণকে জানা যায়।

"বাসনা ছোড় দে তো খুদ বাসুদেব হোয়। বাসু=
বাসনা, দেব=মালিক। যব বাসনাকো ছোড়ে তো
খুদ মালিক হোয়—হমহি সূর্য্যকা রূপ" ॥ ৬০ ॥

কামনা বাসনা সবার ভেতরেই আছে, কম আর বেশী। বাসনা শব্দের অর্থ কোনো কিছু প্রত্যাশা বা কল্পনা। এই বাসনা থাকে কতক্ষণ? এই দেহে প্রাণ যতক্ষণ

চঞ্চল এবং শ্বাসের গতি যতক্ষণ বহির্মুখী ততক্ষণ বাসনা অবশ্যই বর্তমান। কামনা বাসনা ত্যাগ করব বললেই ত্যাগ করা যায় না। কেউ যদি মনে করে সকল প্রকার কামনা বাসনা ত্যাগ করে পর্বত গুহায় বা লোকালয়ের বাইরে অবস্থান করব তবে তার পক্ষেও কামনা বাসনা ত্যাগ করা সম্ভব নয়। কারণ কামনা বাসনা হল মনোধর্ম, সঙ্কল্প-বিকল্প হতে জাত। এই সঙ্কল্প-বিকল্প যতক্ষণ আছে, বর্তমান চঞ্চল মন যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ কামনা বাসনা অবশ্যই আছে তা সে যেখানেই থাক না কেন। তাহলে কামনা বাসনা ত্যাগ করবার উপায় কি? উত্তম প্রকারে যতই প্রাণকর্ম করা যায় ততই চঞ্চল প্রাণ স্থিরত্বের দিকে অগ্রসর হয়। এই প্রকারে বহির্মুখী চঞ্চল শ্বাসের গতি যতই কমতে থাকে, ততই আপনা হতে কামনা বাসনারূপ তরঙ্গও কমতে থাকে। শেষে যখন প্রাণের সকল প্রকার তরঙ্গ থেমে গিয়ে প্রাণ নিশ্চল হয়, তখন কামনা বাসনা ইত্যাদি কিছুই থাকে না। তাই যোগিরাজ বলেছেন সমস্ত প্রকার বাসনারূপ তরঙ্গকে ছেড়ে দিলে অর্থাৎ থামিয়ে দিলে যখন নিশ্চল হবে তখন নিজেই বাসুদেব হবে। আভিধানিক মতে বাসু শব্দে পরমাত্মা এবং দেব শব্দে—দিব্ অর্থাৎ আকাশ। তাহলে মহাকাশই বাসুদেব। এই আকাশ কিন্তু বর্তমান আকাশ নয়। এই বর্তমান আকাশের ভেতর যে স্বচ্ছ মহাকাশ আছেন সেই আকাশ, সেই আকাশই ব্রহ্ম। যোগিরাজ বলেছেন বাসু শব্দে বাসনা অর্থাৎ প্রাণের বর্তমান চঞ্চল অবস্থা। এই চঞ্চল অবস্থাই বাসু বা বাসনা। প্রাণকর্মের মাধ্যমে এই চঞ্চল অবস্থাকে ত্যাগ করতে পারলেই স্বচ্ছ মহাশূন্যে স্থিতি হয়। এই প্রকার স্থিতিলাভই বাসনা ত্যাগরূপ অবস্থা। সেই স্বচ্ছ মহাশূন্যই মালিক, কারণ সেই মালিকই সবকিছুর মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত। যোগী যখন এই প্রকারে স্থিরত্ব লাভ করেন তখন তিনি আপনাহতেই নিজেই মহাশূন্য হন এবং যেহেতু ওই মহাশূন্যই মালিক, সেহেতু তখন তিনি নিজেই মালিক হন অর্থাৎ নিজেই বাসুদেব হন। তাই যোগিরাজ বলেছেন—'আকাশ নারায়ণ হয়—ব্রহ্ম ধ্যান আসল হয় হৃদয়মে স্থিত হয় সত্য রূপ হয়—মায়া ধোকা।' এই স্বচ্ছ মহাশূন্যরূপী আকাশই নারায়ণ। মহাশূন্যরূপী ব্রহ্মধ্যানই আসল। ঠোকর ক্রিয়ার মাধ্যমে (ওঁকার ক্রিয়া) যখন হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয় তখন হৃদয়ে স্থিতি হওয়ায় প্রকৃত সত্য প্রকাশ হয়, তার আগে অর্থাৎ এই স্থিতিলাভের পূর্বে যে চঞ্চল অবস্থা তা মায়া, এই মায়া পরিবর্তশীল হওয়ায় অলীক বা ধোঁকা। এই স্বচ্ছ মহাশূন্যের কথা বলতে গিয়ে যোগিরাজ বলেছেন—'সাধারণ শূন্যের আবরণ আছে কিন্তু মহাশূন্যের আবরণ নাই তন্নিমিত্তে প্রথমে দেখা যায় না—মহাশূন্যের বিন্দুতে সমুদায় দেখা যায়'।

"হমহি সূর্য্যকা রূপ নির্ম্মল জ্যোতি—জব নির্ম্মল জ্যোতি দেখতে হঁয় তব হম ছোড়ায় দুসরা কোই ন দেখতে হয়—লেকন অব নির্ম্মল জ্যোতমে সমানা চাহিয়ে।" ॥ ৬১ ॥

যোগিরাজ বলেছেন দ্বৈতই মহাদুঃখের মূল। দুই দেখা, দুই জানা, দুই ভাব ইত্যাদি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ দুঃখও আছে। তাই যোগিরাজের মতে দুঃখ হতে নিবৃত্তি লাভ পেতে হলে দ্বৈতের বিনাশ করে অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব নয়। কেন দ্বৈত মহাদুঃখের মূল? যতক্ষণ দুইভাব বর্তমান থাকে ততক্ষণ জানাজানি, দেখাদেখি, জ্ঞান অজ্ঞান, এমনকি ভক্ত ভগবান্ সম্পর্কও থাকে। এই প্রকার দুইভাব যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ গুণ অবশ্যই আছে। তবে যখন আত্মজ্যোতি বা কোনো দেব-দেবী দর্শন হয় তখন যোগী তম এবং রজ গুণের অতীতে সত্ত্বগুণে অবস্থান করেন। জীব যখন তমগুণে থাকে তখন তামসিক মনোভাবাপন্ন হওয়ায় তামসিক প্রবৃত্তি জাগে এবং তামসিক দর্শন হয়। আবার যখন সেই জীব রজগুণে থাকে তখন রাজসিক মনোভাবাপন্ন হওয়ায় রাজসিক প্রবৃত্তি জাগে এবং রাজসিক দর্শন হয়। আবার যখন সেই জীব দীর্ঘ সময়ের জন্য সত্ত্বগুণে থাকে তখন তার আত্মজ্যোতি, নানান দেব-দেবী ইত্যাদি দর্শন হয়ে থাকে। তাই যতক্ষণ দেখা, জানা, শোনা, জ্ঞান ইত্যাদি যাই থাকুক না কেন কোন না কোন গুণ অবশ্যই থাকে। অতএব ভগবানকে দেখাটাও এবং তাঁকে জানাটাও গুণের অন্তর্গত, তবে সেটা সত্ত্বগুণ। কিন্তু গুণাতীত অবস্থায় বা নির্গুণ অবস্থায় কোনো প্রকার দেখা শোনা জ্ঞান ভাব ইত্যাদি কিছুই থাকে না। যে মন দেখে সেই চঞ্চল মন তখন স্তব্ধ হয়। এই যে স্তব্ধ মন তাকে বলা হয় এক মন। এই অবস্থায় পৌঁছে যোগিরাজ বলেছেন—আমিই আত্মসূর্যরূপী নির্মল জ্যোতি, যখন এই নির্মল জ্যোতি দেখি তখন আমি ছাড়া আর কেউই দেখে না। সাধারণত ইন্দ্রিয়দের মাধ্যমে চঞ্চল মনই দেখে থাকে। কিন্তু এই অবস্থায় কোনো প্রকার ইন্দ্রিয়সঙ্গ নেই, চঞ্চল মন নেই; অতএব অন্য কেউ নেই, তাই স্থির মনরূপী একমাত্র আমিই নির্মল আত্মজ্যোতি দেখি। তাই এখনও আমার স্তব্ধ মন কর্মক্ষম আছে, যদিও অন্য কেউ নেই। তথাপি এই অবস্থাতেও দ্বৈত বর্তমান। এই প্রকার আত্মজ্যোতি দর্শনরূপ যে দ্বৈত তাও দুঃখের কারণ। কারণ এই প্রকার দর্শন অবস্থা সব সময় থাকে না, এটাও অস্থায়ী। তাই এখন আমার কর্তব্য হোলো স্থায়ী অবস্থায় চলে যাওয়া। তাই এই যে নির্মল আত্মজ্যোতি দেখছি এবার সেই জ্যোতিতে মিলে যেতে হবে, জ্যোতি এবং আমি এক হতে হবে, লয়প্রাপ্ত হতে হবে।

তাই তিনি পরদিন লিখলেন—'নির্মল জ্যোতি ভগবানকা হয়—জ্যোতি আকাশকে মাফিক।' এই নির্মল জ্যোতি ভগবানের এবং এই জ্যোতি স্বচ্ছ মহাশূন্যের মতো। 'এহি অগম স্থান হয় ইসিমে ঠহরনা চাহিএ।' যোগী যখন কূটস্থে অবস্থান করেন তখন আপনাহতেই এই স্বচ্ছ নির্মল মহাকাশ প্রকাশিত হন। এই মহাকাশ যোগী ব্যতীত অপরের কাছে অগম্য, এই মহাকাশই ব্রহ্ম। তাই যোগিরাজ বলছেন এই স্বচ্ছ মহাকাশে স্থিরভাবে আটকে থাকতে হবে। আটকে না থাকতে পারলেই পুনরায় চঞ্চল অবস্থা ফিরে আসে। যোগী যখন এই অবস্থায় দীর্ঘসময় অবস্থান করেন তখন আপনাহতেই এক নির্মল আত্মসূর্য প্রতিভাসিত হয়। এই আত্মসূর্য কখনও বিন্দুস্বরূপ, আবার কখনো সীমাহীন অনন্ত। এই আত্মসূর্য কখনও সহস্র সূর্যের তেজপূর্ণ, কখনও স্বচ্ছ মহাশূন্য। যখন স্বচ্ছ মহাশূন্য তখন লয়, আবার যখন সীমাহীন অমিততেজা তখন সৃষ্টি। তাই বলা হয় সূর্যই জগৎসৃষ্টির কারণ। এই সূর্য হল আত্মসূর্য। এই আত্মসূর্য হতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি আবার তাতেই লয়। এই আত্মসূর্যই সকল সৃষ্টির আদিকারণ এবং সর্বত্রই ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত। তাই যোগিরাজ বলেছেন—'হমহি সূর্য্য হমারেই প্রকাশিত সব জগত। ইহ মালুম হুয়া কি সূর্য্য হমাহি হয়। ষয়সা হম সূর্য্যরূপী আউর হমারে সব তেজ সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্ম। হমারা ন হাত হয় ন পএর হয় কেবল মণ্ডলাকার হমারা তেজ সর্ব্বব্যাপি।' এই আত্মসূর্য এবং আমি যখন মিলে মিশে এক হয়ে গেলাম তখন জানতে পারলাম যে আমি নিজেই আত্মসূর্য এবং আত্মসূর্যরূপী আমি হতেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু প্রকাশিত অর্থাৎ আমিই সকল সৃষ্টির আদিকারণ। এও বুঝলাম যে আত্মসূর্য এবং আমি যখন অভিন্ন তখন আমার তেজ অর্থাৎ জ্যোতি সর্বব্যাপী অর্থাৎ যা আত্মসূর্য তাই ব্রহ্ম তাই আমি, অতএব ব্রহ্মরূপে আমিই সর্বত্র বিরাজিত। যেহেতু আমি সকল সৃষ্টির মধ্যে কারণস্বরূপে সর্বত্র বিরাজিত তাই আমার কোনো হাত নেই পা নেই কেবল অখণ্ড মণ্ডলাকাররূপী এবং আমার তেজ সমস্ত চরাচর ব্যাপী। যোগীর এই অবস্থাকে লক্ষ্য করে শাস্ত্র বলেছেন—

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

যোগীর এই অবস্থাই মহাদেব এবং আদিগুরু পদবাচ্য। এই অবস্থার কথা বলতে গিয়ে মহাত্মা তুলসীদাস বলেছেন—

বিনুপদ চলই শুনই বিনু কানা,
করবিনু করম করেই বিধি নানা।

আনন বহিত সকল রস ভোগী,
বিনুবাণী বকতা বড় যোগী।
তনুবিনু পরশ নয়ন বিনু দেখা,
গ্রহই ঘ্রাণ বিনু বাস অশেষা।
অসি সব ভাঁতি অলৌকিক করণী,
মহিমা জাসু যাই নহি বরণী।

অতএব সকল জ্যোতির জ্যোতি যে আত্মজ্যোতি, সেই আত্মজ্যোতিই আত্মসূর্য, তাই ব্রহ্ম, তাই সকল সৃষ্টির বীজপ্রদ পিতা, সেই উৎসস্থলরূপ একে মিলে যেতেই হবে। তাই যোগিরাজ বলেছেন—

"তুম কভি মত ছোড়ো
উহ সাঁইকো—
জবতক ন মিলাও এ
আপকো।"

"মনযেছে তিরন হোয় উসকা নাম মন্ত্র। তনুযেছে ভরণ হোয় উছকা নাম তন্ত্র হেয়।" ॥ ৬২ ॥

মন্ত্র শব্দের সাধারণ অর্থ হোলো কোনো দেব-দেবীর উপাসনার জন্য উপযোগী বাক্য বা শব্দ। এই বাক্য বা শব্দগুলি বিভিন্ন দেব দেবীর কল্পিত রূপের ঘনীভূত অবস্থা যা একাগ্র মনে জপ করার বিধি প্রচলিত আছে। আবার মন্ত্র শব্দে আগমকেও বোঝায়। বেদের শ্লোককেও মন্ত্র বলা হয়। ঈশ্বর সাধনের জন্য যে মন্ত্র সাধক পেয়ে থাকেন তা গুরুদত্ত বাক্য। সাধকের আধারভেদে এবং গুরুর মার্গভেদে এই মন্ত্র বিভিন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু ঈশ্বর এক হওয়ায় মন্ত্রের বিভিন্নতার অবকাশ কোথায়? দেব-দেবী বিভিন্ন হতে পারে এবং তা লাভের জন্য মন্ত্রও বিভিন্ন হতে পারে, কিন্তু এক ঈশ্বরলাভের জন্য মন্ত্রের বিভিন্নতা সম্ভব নয়। মন্ত্র জপের মাধ্যমে মনের একাগ্রতা লাভ হয়, কিছুটা স্থির হয় এবং তখন স্বভাবতই সেই মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবী দর্শন হয়, কিন্তু আত্মলাভ সম্ভব নয়। আত্মাই সর্বময় কর্তা হওয়ায় তিনিই ঈশ্বর বা ভগবান্। দেব-দেবীরা বিশেষ বিশেষ গুণ বা তত্ত্বের মালিক হওয়ায় এবং সেই সব গুণ বা তত্ত্বের অন্তর্গত থাকায় সর্বময় মালিক নন। তাই দেব-দেবীজ্ঞান চূড়ান্ত জ্ঞান নয়, আত্মজ্ঞানই চূড়ান্ত জ্ঞান; তাই এই আত্মজ্ঞান বা আত্মলাভই পৃথিবীর সকল

মানুষের উপযোগী। দেব-দেবীজ্ঞান খণ্ডজ্ঞান, আত্মজ্ঞান অখণ্ডজ্ঞান। এই অখণ্ডজ্ঞানই অর্থাৎ অদ্বৈত জ্ঞানই মুক্তির কারণ। দেব-দেবী জ্ঞানের জন্য বা লাভের জন্য মন্ত্রজপ ছাড়াও বিভিন্ন ব্রত, তীর্থভ্রমণ, পূজা ইত্যাদি প্রচলিত আছে। কিন্তু আত্মজ্ঞানের জন্য বা আত্মলাভের জন্য এসব কিছু নেই। আত্মজ্ঞান নিজ দেহস্থ হওয়ায় আত্মকর্মই এর একমাত্র কারণ বা উপায়। তাই আত্মজ্ঞানের জন্য কোন প্রকাব বাক্য বা শব্দরূপী মন্ত্রের প্রচলন নেই। আত্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে মন্ত্র একটা অবস্থামাত্র। অনেক মহাত্মা এই অভিমত পোষণ করেন যে মন্ত্র শব্দের অর্থ হল 'মন তোর'। অর্থাৎ আমার এই বর্তমান মন হে ঈশ্বর তোমার, এই মন তোমাকে দিয়ে দিলাম। তাহলে বর্তমান মন যদি ঈশ্বরকে দিয়ে দেওযা হয় তবে আর আমার মন নেই একথা বলতে হয়। যোগিরাজের মতে বর্তমান চঞ্চল মনই ম্লেচ্ছ, কারণ চঞ্চল মনই সকল কর্ম করায়। এই চঞ্চল মন যখন ঈশ্বরকে দিয়ে দেওযা হয় অর্থাৎ চঞ্চল মন যখন স্থির মনে রূপান্তরিত হয় তখন আর চঞ্চল মন না থাকায় চঞ্চল মনেব ত্রাণ বা নিবৃত্ত অবস্থা হয়। তাই যোগিরাজ বলেছেন মনের যখন তিরন হয় অর্থাৎ চঞ্চল মনের যখন ত্রাণ হয়, থেমে যায় তখন সেই স্থির অবস্থার নাম মন্ত্র। মনের এই প্রকার স্থির অবস্থার বিষয় সাধারণ মানুষ জানে না। অর্থাৎ মন্ত্র কোনো শব্দ বা বাক্য না হয়ে এটা যে মনের একটা অবস্থা মাত্রতা সাধারণ মানুষের জানা না থাকায় কতকগুলি বাক্য বা শব্দকে নিয়ে টানাটানি করে। প্রাণ চঞ্চল হলেই মনের উৎপত্তি হয়, আবার প্রাণ স্থির হলেই মনের ত্রাণ হয়। সেই ত্রাণ অবস্থাই মন্ত্র এবং এই প্রকার মন্ত্রলাভ সম্পূর্ণরূপে প্রাণকর্ম সাপেক্ষ; জপ, তীর্থ, পূজা ইত্যাদি সাপেক্ষ নয়।

বিভিন্ন দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপচারের দ্বারা যেসব পূজা পদ্ধতি প্রচলিত আছে তার দ্বারা সাধারণ মানুষ যাতে আত্মতত্ত্বে উপনীত হতে পারে তার উপায় চিন্তা ঋষিরা করেছেন এবং এসবের মাধ্যমে আত্মতত্ত্বের শিক্ষাই দিয়েছেন। যেমন বাহ্যপূজা করতে গেলে প্রথমেই একটি ঘট স্থাপন করতে হয়। এই ঘট হল দেহরূপ ঘটের প্রতীক। সেই ঘটের মধ্যে পবিত্র গঙ্গাজল পূর্ণ করতে হয়। জল হল ব্রহ্মের প্রতীক, কারণ জলের কোনো রূপ, রঙ বা আয়তন নেই। তাই যোগিরাজ বলেছেন 'নির্মল ব্রহ্ম মালিক, ব্রহ্ম জলকা রূপ হ্য, ব্রহ্মই সর্বময়।' স্বচ্ছ, আবরণহীন, নির্মল ব্রহ্ম তিনিই সবকিছুর মালিক; কারণ সেই ব্রহ্ম হতেই সবকিছুর উৎপত্তি। সেই ব্রহ্ম জলের মতো, কারণ জলের কোনো রূপ বা আয়তন নেই; যখন যে পাত্রে রাখা যায় সেই রূপই ধারণ করে। আত্মাও ঠিক তাই, যখন যে দেহরূপ ঘটে অবস্থান করেন তখন সেই রূপই ধারণ করেন। এরই প্রতীক ওই ঘট। সাধারণ মানুষ দেহরূপ ঘটের মধ্যে অবস্থিত আত্মপূজা জানে না। তারা যাতে ক্রমে আত্মপূজায় উপনীত

হতে পারে তারই জন্য এই বাহ্য ঘটের ব্যবস্থা করেছেন। ওই ঘটের ওপর থাকে পাঁচটি পাতা বিশিষ্ট আম্রফলক। এটা হোলো পঞ্চপ্রাণের প্রতীক। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান এই পঞ্চ প্রাণ দেহরূপ ঘটে অবস্থান ক'রে দেহকে পরিচালিত করে। এরই প্রতীক পঞ্চফলকযুক্ত আম্রপল্লব। সাধারণ মানুষ এই পঞ্চপ্রাণের পূজা জানে না। তারা যাতে ক্রমে এই পঞ্চপ্রাণের উপাসনায় আকৃষ্ট হয় তারই জন্য ঋষিরা এই পঞ্চফলকযুক্ত পল্লবের ব্যবস্থা করেছেন। ধূপ চন্দন সুগন্ধের প্রতীক। দেহরূপ ঘটে অবস্থিত পঞ্চপ্রাণকে নিয়ে যে কর্ম অর্থাৎ প্রাণকর্ম তা করতে থাকলে যোগী নিজের ভেতরেই নানাপ্রকার সুগন্ধ অনুভব করেন। ধূপ চন্দন ইত্যাদি এগুলি সেই দেহাভ্যন্তরস্থ সুগন্ধের প্রতীক। কেমন করে দেহাভ্যন্তরস্থ এই সুগন্ধগুলিকে লাভ করা যায় তা সাধারণ মানুষ জানে না। তাই তারা যাতে ক্রমে অভ্যন্তরস্থ সুগন্ধ লাভের প্রতি আকৃষ্ট হয় তারই জন্য ঋষিরা বাহ্য উপায় অবলম্বন করেছেন। বাহ্যপূজায় শঙ্খ কাঁসর ঘণ্টা ইত্যাদি যেসব বাদ্যধ্বনি করা হয় এগুলি সবই যোগী যোগকর্মের মাধ্যমে নিজ দেহাভ্যন্তরে অনুভব করেন। এ বিষয়ে যোগিরাজ বলেছেন —'হৃদয়মে জব অপান বায়ু আওএ দশপ্রকারকে অনহদ সুনাওএ—চিঁ,চিঁচিঁ, ক্ষুদ্র ঘণ্টা, সংখ, বিন্, তাল, মুরলী, পখাওজ, নঘবত, দীর্ঘ-ঘণ্টা।' নাভির নীচে অপান বায়ু অবস্থিত। প্রাণকর্মের মাধ্যমে সেই নিম্নোক্ত অপান বায়ু যখন হৃদয়স্থিত প্রাণবায়ুতে মিলিত হয় তখন দশপ্রকারের অনাহত শব্দ আপনাহতেই যোগীর শ্রুতিগোচর হয়। অনাহত অর্থে বিনা আঘাতে যে শব্দ নির্গত হয়। জাগতিক ভাবে সকল শব্দই আঘাতের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়ে থাকে। বিনা আঘাতে কোনো শব্দ উৎপন্ন হয় জাগতিকভাবে এমন দেখা যায় না। কিন্তু এই প্রাণের স্পন্দনরূপ যে শব্দ তা বিনা আঘাতেই উৎপন্ন হয়, তাই একে অনাহত শব্দ বলে। এই অনাহত শব্দ স্থূল কর্ণে শ্রুতিগোচর হয় না। প্রাণকর্মের মাধ্যমে আত্মস্থ হতে পারলে তবেই এই শব্দ যোগী আপনাহতেই শুনতে পান। এই অনাহত শব্দ দশ প্রকারের শোনা যায় যথা চিঁ। এই চিঁ শব্দ একটানা নিরবচ্ছিন্নভাবে শোনা যায়। দ্বিতীয় শব্দ চিঁ চিঁ। এই চিঁচিঁ শব্দ একটানা নয়, ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকের মত ছেদযুক্ত শব্দ। তৃতীয় শব্দ হল ক্ষুদ্র ঘণ্টা। যোগী যখন আত্মস্থ হন তখন বহুদূরে ঘণ্টাধ্বনি হলে যেমন শোনা যায় ঠিক সেইরকম ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পান। চতুর্থ শব্দ হল শংখ। যোগী আরও আত্মস্থ হলে এই শাঁখ বাজানোর মত শব্দ আপনাহতেই শুনতে পান এবং সেই শব্দের সঙ্গে একাত্ম হতে চেষ্টা করেন। পঞ্চম শব্দ হল বিন্। বীণ হল বীণা। যোগী আত্মস্থ হলে আপনাহতেই বীণাপাণির বীণার ধ্বনি শুনে বীতশোক হন। ষষ্ঠ শব্দ হল তাল। এই তাল হল উক্ত সমস্ত প্রকার বাদ্যধ্বনির সময় ও ঝোঁক নির্ধারণরূপ

যে বিচ্ছেদ তা যোগীর অভ্যন্তরে শ্রুতিগোচর হয়। সপ্তম শব্দ হোলো মুরলী। উত্তম প্রাণকর্ম করতে থাকলে যোগী আপনাহতেই মুরলীধারীর বংশীধ্বনি শুনতে পান। একে প্রণবধ্বনিও বলে। যোগী তখন এই প্রণবধ্বনিতে একীভূত হবার চেষ্টা করেন। এই মুরলীধ্বনি শুনে যোগীর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবের উদয় হয়। কখনও যশোদাভাব, কখনও রাধাভাব, কখনও রাখালভাব, কখনও গোপ-গোপিনীভাব ইত্যাদি। যোগী জানেন যে এগুলি সবই ভাব অতএব অস্থায়ী। তাই তিনি সকল ভাবের অতীতে ভাবাতীত নিরঞ্জন অবস্থায় যাবার চেষ্টা করেন, যেখানে গেলে আর মুরলীধারীর মুরলীধ্বনিও নেই, এমনকি মুরলীধারীও নেই। কারণ যতক্ষণ মুরলীধারী আছেন ততক্ষণ ভাব অর্থাৎ দ্বৈত অবশ্যই বর্তমান। অষ্টম শব্দ হল পখাওজ। পখাওজ অর্থে পাখোয়াজ বা মৃদঙ্গ। যোগীর যখন হৃদয়ে বায়ু স্থির হয় তখন তিনি আপনাহতেই নিজ অভ্যন্তরে এই মৃদঙ্গ শুনতে পান। নবম শব্দ হল নঘবত্ত। নঘবত্ত অর্থে নহবত। নহবতে সানাই প্রভৃতির শব্দ যা শোনা যায় যোগী তা নিজ অভ্যন্তরে শুনতে পান। দশম শব্দ দীর্ঘঘণ্টা। বড় ঘণ্টা যা বাহ্যপূজার সময় খুব জোরে বাজান হয়, ঠিক সেরকম শব্দ খুব নিকটে যোগী অভ্যন্তরে শুনতে পান। অনেক সময় যোগী নিজ অভ্যন্তরস্থ এই প্রকার জোর শব্দ শুনে ঠিক যেন ঝালাপালা হবার উপক্রম হন এবং ক্রমে ক্রমে এই জোর শব্দের সঙ্গে একীভূত হয়ে যান। এই দশ প্রকার শব্দ ছাড়াও কাঁসর এবং একক সানাইয়ের সুরও অনেক সময় যোগী শুনতে পান। এ বিষয়ে যোগিরাজ বলেছেন—'কাঁসরকা আওযাজ হুয়া—গলেমে চিনিকে মাফিক মিঠা মালুম হুয়া—আখকে সামনে বিজলি চমকেনে লগা—ওঁকারকা ধ্বনি বহুত দেরতক শুনা। রগকে দোনো নেসরতকে এক আবজ নিকসতা উছিকা নাম অনহদ বাজা উচছে ছোটা বায়া যোকী উপরকে কোটিছে গাবাপর চড়কে মালুম হোতা হেয় হামেসা যেসা সানাইকা সুর দেতে হেয় উচছে কুছ কম আউর আওয়াজ হেয় ইহ মালুম হোতা হেয় কি বহুতছে আদমি ইস্রোএকা কাঁষর ঘণ্টা বাজায় রহে। বড়া ঘণ্টাকা আওয়াজ সিরকে ভিতর পিছে মালুম হুয়া।' কাঁসরের আওয়াজ হোলো, গলার মধ্যে চিনির মতো মিষ্টি স্বাদ পেলাম, চোখের সামনে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো, ওঁকারধ্বনি দীর্ঘসময় শুনলাম। রগের দুদিক হতে একপ্রকার ধ্বনি নির্গত হতে লাগলো যার নাম অনাহত ধ্বনি। সেই ধ্বনি অপেক্ষা সামান্য শব্দ যা ওপরের ঘরের গবাক্ষের ভেতর থেকে আসছে, বুঝলাম যে এই শব্দ যা সানাইয়ের সুর অপেক্ষা কিছু কম শব্দ এবং এও মনে হোলো যেন একসাথে অনেক মানুষ কাঁসর ঘণ্টা বাজাচ্ছে। বৃহৎ ঘণ্টার ধ্বনি মাথার ভেতর পেছন দিকে শুনতে পেলাম।

দেহাভ্যন্তরস্থ এই সমস্ত শব্দগুলি বিনা আঘাতেই হয়ে থাকে, তাই এগুলিকে অনাহত ধ্বনি বলে। প্রাণের চঞ্চলতার দরুন এই সব শব্দ নির্গত হয়। কিন্তু উত্তম ও অধিক প্রাণকর্ম বা আত্মকর্ম করতে থাকলে যখন প্রাণ স্থির হয় তখন আর এই শব্দগুলি থাকে না। কারণ প্রাণের চঞ্চল অবস্থা থেকে জাত যে সব শব্দ তা যতক্ষণ প্রাণ চঞ্চল থাকে ততক্ষণই হয়ে থাকে, স্থিরাবস্থায় ধ্বনি নেই। সাধারণ মানুষ দেহাভ্যন্তরস্থ প্রাণের চঞ্চলতার এইসব শব্দগুলির হদিস জানে না, কারণ তারা আত্মকর্ম করে না। তারা যাতে ক্রমে এই অভ্যন্তর শব্দের প্রতি আকৃষ্ট হয় তারই উপায় স্বরূপ ঋষিরা বাহ্যপূজায় নানাপ্রকার সুমধুর বাদ্যধ্বনির ব্যবস্থা করেছেন এবং সেগুলি অভ্যন্তর শব্দের সঙ্গে মিল রেখেই করেছেন। বাহ্যপূজায় বিল্বপত্র লাগে। এই বিল্বপত্র ত্রিফলকযুক্ত। ত্রিফলক হল সত্ত্ব, রজ, তম এই তিন গুণের প্রতীক। এই তিন গুণ সবার ভেতরেই আছে। বিল্বপত্র ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁর চরণে প্রদান করতে হয়। এর উদ্দেশ্য হোলো উত্তম প্রাণকর্মের মাধ্যমে নিজদেহস্থ তিন গুণকে প্রদান করে অর্থাৎ কাটিয়ে উঠে ত্রিগুণাতীত অবস্থায় চলে যাওয়া। কেমন করে সেই ত্রিগুণাতীত অবস্থায় যাওয়া যায় তার উপায় সাধারণ মানুষের জানা নেই। তাই তারা যাতে ক্রমে এইদিকে আকৃষ্ট হয় তারই জন্য ঋষিগণ ত্রিফলকযুক্ত বিল্বপত্রের দ্বারা বাহ্যপূজার ব্যবস্থা করেছেন। বাহ্যপূজা করতে গেলে ফুল লাগে। ফুল হোলো সুন্দরের প্রতীক। আত্মা হলেন চিরসুন্দর। সেই চিরসুন্দরকে কি উপায়ে লাভ করা যায় এবং তিনি যে চিরসুন্দর এইদিকে সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য ঋষিগণ এই প্রতীক অবলম্বন করেছেন। বাহ্যপূজায় সুস্বাদু ফল নিবেদন করতে হয়। যোগী দীর্ঘ যোগাভ্যাসের মাধ্যমে যে আত্মফল লাভ করে থাকেন, এই সুস্বাদু ফলগুলি তারই প্রতীক, এই সুস্বাদু ফলগুলি পরে প্রসাদরূপে গণ্য হয়। প্রকৃতরূপে শান্তিই হোলো প্রসাদ, যা দীর্ঘ যোগাভ্যাসের দ্বারা স্থিরাবস্থায় লাভ হয়ে থাকে। বাহ্য প্রসাদ এই শান্তিলাভের প্রতীক।

বাহ্য পূজায় এইরকম যা যা উপচার ব্যবহৃত হয় তা সবই সকলের কাছে সহজলভ্য। ঋষিরা এমন কোনো উপচারের ব্যবস্থা করেননি যা দুর্লভ। এর উদ্দেশ্য হোলো আত্মসাধনের জন্য বা আত্মসাধন করতে গেলে যা যা প্রয়োজন এবং যে সমস্ত অবস্থাগুলির সম্মুখীন যোগীকে হতে হয় তা সবই সবার ভেতর আছে এবং একটু অন্তর্মুখী হয়ে চেষ্টা করলে সকলেই সহজে পেতে পারে। এর জন্য বাইরে কিছুই খুঁজতে হবে না, সবই সবার ভেতরেই আছে। এই অন্তর্মুখী ভাব যাতে জাগ্রত হয় এবং ক্রমে মানুষ অন্তর্মুখী হয়ে চূড়ান্ত আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তারই জন্য মানবদরদী ঋষিগণ এই সমস্ত তীর্থভ্রমণ বাহ্যপূজা জপ ব্রত উপবাস ইত্যাদি

বাহ্য উপায়গুলি অবলম্বন করেছেন। উদ্দেশ্য তাঁদের একটাই, সেটা হোলো কি উপায়ে দুঃখী মানুষদের আত্মতত্ত্ব বা আত্মজ্ঞানের দিকে টেনে নেওয়া যায়। মানবদরদী ঋষিগণ আরও গভীরে চিন্তা করে দেখেছেন যে সকল মানুষ আত্মজ্ঞানের কথা বোঝে না, জানতেও চায় না। অথচ তাদেরও এই মূল তত্ত্বের দিকে টেনে নিতে হবে। তাই তাঁরা কিছুটা দূরে দূরে, মানুষ যাতে অনায়াসে যেতে পারে এমন দূরত্বের ব্যবধানে সারা দেশে ছোটোবড়ো নানারকম বিভিন্ন দেবদেবীকে কেন্দ্র করে বহু তীর্থের ব্যবস্থা করেছেন। এর মাধ্যমে ঋষিদের উদ্দেশ্য হোলো অন্নচিন্তা চমৎকার, লোভী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ মানুষ যারা সদাই বিষয়ে আসক্ত থাকায় যাদের মন কখনই ঈশ্বরমুখী হয় না, তারাও যাতে মাঝে মাঝে অন্তত ভ্রমণের ছলে ওই সমস্ত তীর্থে যায়। তীর্থগুলি যাতে মনোরঞ্জন ও আকৃষ্টকারী হয় তার জন্য প্রতিটি তীর্থের উদ্দেশ্যে অনেক রূপক কাহিনীও তৈরী করেছেন। এতেও তাঁরা ক্ষান্ত হননি। তাই তাঁরা সমাজের মধ্যে আরো অধিক মানুষকে আত্মতত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করবার জন্য মাঝে মাঝে দুর্গা-পূজা, কালীপূজা, শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা ইত্যাদি নানাপ্রকার বড় বড় পূজার আয়োজন করে দিয়েছেন। তাঁরা এও বুঝেছেন যে এর দ্বারা সামাজিক মানুষ মাঝে মাঝে ধর্ম পথে আকৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু প্রতিদিন আকৃষ্ট হবে না। তাই তাঁরা প্রতি সংসারে প্রতিদিনের জন্য কোনো না কোনো দেব-দেবীর পূজাবিধি প্রচলন করেছেন। এই বিরাট আয়োজনের মাধ্যমে ঋষিগণ এটাই চেয়েছেন যে কোনো উপায়ে, যার যেমন অভিরুচি তেমন উপায়ে যাতে সকল মানুষকে আত্মতত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করা যায়। মানবকল্যাণে দরদী ঋষিগণ নানা উপায় অবলম্বন করে মানুষের অশেষ মঙ্গল করবার চেষ্টা করেছেন, কারণ তাঁদের মন মানবকল্যাণে প্রকৃতই কেঁদেছিল। যোগিরাজের মনও দুঃখী মানুষের জন্য অবশ্যই কেঁদেছিল তাই তিনি কেবল উপদেশের বোঝা না চাপিয়ে যা করলে মানুষের প্রকৃত আত্মোন্নতি হয় বিন্দুমাত্র কৃপণতা না করে সেই অমর যোগসাধনের কথা বলেছেন। এই অমর যোগসাধনই যে সকল সাধনার মূল সেকথা বলতে গিয়ে তিনি জোরের সঙ্গে বলেছেন—'মন যে কুছ নহি, ধ্যান ধরো সব কুছ হয়।' এই যে বর্তমান চঞ্চল মন তার দ্বারায় যতই চেষ্টা করো না কেন আত্মলাভ কখনই সম্ভব নয়। প্রতিদিন ক্রিয়াযোগের মাধ্যমে প্রাণকে স্থির করবার চেষ্টা করো এবং যতই স্থিরত্বের অভিমুখে এগিয়ে যাবে ততই তোমার মন স্বরের ভেতর যে স্বর, জ্যোতির ভেতর যে জ্যোতি এবং ধ্বনির ভেতর যে ওঁকার ধ্বনি তার ভেতর প্রবেশ করে প্রতিদিনের অভ্যাসের মাধ্যমে ধ্যানাবস্থায় চলে যাবে এবং তখন সবকিছু পাবে অর্থাৎ খণ্ড বা দ্বৈতজ্ঞানের অতীতে অখণ্ড জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই তিনি গেয়েছেন—

ওঁকার ধ্বনির শোনরে সুর
যেখানে জ্যোতি প্রচুর।
দেখ দেখ সুরের ভিতর কত সুর
মন সদা তাইতে পুর।
অভ্যাসেতে হবে সবুর
দর্শন হবে মহাপ্রভুর।
ধর ধর টেনে সুর
কাট সব দিয়ে ঐ ক্ষুর।

"স্থির বায়ুতে থাকিলে হৃদয় এমত নির্ম্মল হয় যে কথা কহিলে হৃদয়ে ধাক্কা ইহা অনুভব হয়। খেচরি হইলে আকাশেতেই চলিয়া জায় অর্থাৎ চলায় কোন ক্লেশবোধ হয় না। ইচ্ছা হইতে অহঙ্কার সেই ইচ্ছা স্থির হইলেই বুদ্ধি তিনি ঈশ্বর। অলব্ধ ধন পাইলে যেরূপ তৃপ্ত মন হয় তৎ সহস্রগুণ সমাধিতে মন তৃপ্ত হয়—ব্রহ্ম সুদ্ধ অর্থাৎ কোন দ্রব্য হইতে নির্গত হয় নাই অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট নয়" ॥ ৬৩ ॥

জীব শরীরে প্রাণ চঞ্চল অবস্থায় থাকে, তাই উনপঞ্চাশ বায়ুও চঞ্চল হয় এবং জীব সব কর্ম করে থাকে। প্রাণের এই চঞ্চল অবস্থাকেই জীবন বলে এবং এই জীবন যতক্ষণ দেহে আছে ততক্ষণই জীব। তাই বলা হয় চঞ্চলতাই জীব, স্থিরত্বই শিব। অতএব প্রাণের চঞ্চলতা যতক্ষণ বর্তমান ততক্ষণ জাগতিক সবকিছুই আছে। তাই যোগিরাজ বলছেন অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করতে থাকলে বায়ু যখন স্থির হয় তখন মহাশূন্যে স্থিতি হওয়ায় চঞ্চল মন স্থির হয়। এই স্থির মনই নির্মল মন কারণ তখন মনের দৌড়ঝাঁপ চলে যায়। যোগী যখন এই রকম স্থির হন তখন তিনি কথা বলতেও কষ্ট অনুভব করেন। কথা বলতে গেলে তাঁর তখন হৃদয়ে ধাক্কা লাগে; কারণ কথা বলতে গেলে দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু যতখানি চঞ্চল থাকা উচিত ততখানি না থাকায় এই ধাক্কা হৃদয়ে অনুভব হয় এবং এতে যোগী তখন কষ্ট অনুভব করেন। তাই যোগী সব সময়েই কথা কম বলেন। এর পরের অবস্থায় যোগীর আর কথা বলার মত ইচ্ছাও থাকে না, তাই লোকে যোগীকে মৌনী বলে। যোগী কিন্তু ইচ্ছা করে মৌনব্রত অবলম্বন করেন না। তাঁর কথা বলার ইচ্ছা নেই তাই

তিনি কথা বলেন না। যদিও কোনো সময় কথা বলার ইচ্ছা জাগরিত হয় তথাপি তিনি স্থির বায়ুতে থাকার দরুন কথা বলতে কষ্ট অনুভব করেন, তাই যোগী মৌন থাকতে ভালবাসেন। যোগিরাজেরও এই অবস্থা হওয়ায় তিনি বলেছেন—'মৌন হোনা অচ্ছা মালুম হোতা হৈ।' যোগী যখন খেচরীসিদ্ধ হন তখন তিনি সদাই শূন্যে থাকতে পারেন এবং সেই মহাশূন্য আবরণহীন হওয়ায় তাঁর তখন আর চলায় কোনো প্রকার ক্লেশ হয় না। যোগী তখন নিমেষের মধ্যে বহুদূরে চলে যেতে পারেন। চঞ্চলতাই সময়, কাল বা ব্যবধান রচিত করে। যেখানে চঞ্চলতা নেই সেখানে কোনো কিছুই নেই। তাই যোগী ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাকায় কাল, সময় ও ব্যবধান রহিত হন। আবার এই প্রাণই যখন চঞ্চল হয় তখন আপনা হতেই ইচ্ছার উদয় হয় এবং সেই ইচ্ছা থেকে অহংকার জন্মায়। পুনরায় যখন প্রাণকর্মের দ্বারা প্রাণ স্থির হয় তখন ইচ্ছারূপ তরঙ্গও থেমে যায়। এই প্রকার স্থির অবস্থাটাই বুদ্ধি পদবাচ্য, চঞ্চল বুদ্ধি বুদ্ধিই নয়। এই স্থির বুদ্ধিই ঈশ্বর কারণ নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্যতে। গীতাতেও শ্রীভগবান এই কথাই বলেছেন—'নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।' (গীতা ২।৬৬) আত্মাতে অযুক্ত ব্যক্তির আত্মবিষয়ক বুদ্ধি নেই এবং আত্মবিষয়ে অযুক্ত থাকায় প্রকৃত ধ্যানও হয় না। জীবের বর্তমানে যে অযুক্ত বুদ্ধি অর্থাৎ চঞ্চলবুদ্ধি তা মিথ্যা। কারণ প্রাণের এই চঞ্চল অবস্থা হতে উৎপন্ন যে বুদ্ধি তা মিথ্যা। অতএব যোগি-রাজের মতে স্থির বুদ্ধিই বুদ্ধি এবং সেই স্থির বুদ্ধিই ঈশ্বর। তাই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপদেশ হল অন্তর্মুখী প্রাণকর্মের দ্বারা প্রাণের চঞ্চলতাকে রহিত করে স্থির হও। স্থির হতে পারলে নিজেই ঈশ্বর হবে এবং তখন সমস্ত প্রকার দুঃখের কারণ যে দ্বৈতভাব তা চলে যাবে। এই দ্বৈতভাবকে কাটানোই মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। যেখানে দুই নেই, সবই মিলে মিশে একাকার সেখানে সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি কোথায়? যে বস্তু বা ধন আমার প্রাপ্য নয় এমন ধন বা বস্তু যদি হঠাৎ লাভ করা যায় তখন যেমন মন অপ্রত্যাশিত লাভে আনন্দিত বা তৃপ্ত হয়, ক্রিয়ার পরাবস্থায় বা সমাধি অবস্থায় মন পূর্বোক্ত অলব্ধ ধন বা বস্তুলাভের তৃপ্তি বা আনন্দ অপেক্ষা সহস্রগুণ তৃপ্ত বা আনন্দিত হয়। এ জন্যই যোগী ক্রিয়ার পরাবস্থায় অধিক সময় বুঁদ হয়ে থাকতে ভালবাসেন। এই প্রকার ক্রিয়ার পরাবস্থায় যে স্বচ্ছ নির্মল মহাশূন্যরূপী ব্রহ্ম তা সদাই শুদ্ধ। সেই শুদ্ধ ব্রহ্মকে অশুদ্ধ করবার সাধ্য কারও নেই। জাগতিক সকল দ্রব্যই অপর দ্রব্যের সংমিশ্রণে হয়ে থাকে। এই প্রকারে বিচার করলে দেখা যায় সকল দ্রব্যই এমনকি পঞ্চমহাভূতও ব্রহ্ম হতে নির্গত। কিন্তু ব্রহ্ম কোনো দ্রব্য হতে নির্গত নয়। ব্রহ্ম স্থির, আর সব চঞ্চল। তাই যেহেতু ব্রহ্ম কোনো কিছু থেকে নির্গত হয় নি একারণে ব্রহ্ম কখনও উচ্ছিষ্ট নয়। এই উচ্ছিষ্টবিহীন স্থির ব্রহ্মের একটা অংশ চঞ্চল হওয়ায় এই

জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। ব্রহ্মের স্থির এবং চঞ্চল এই দুই বিভাগ সম্বন্ধে নিচে একটা সূচী বা তালিকা দেওয়া হল :—

	চঞ্চলভাই	স্থিরত্বই
১।	জীব	শিব
২।	জীবের বর্তমান অস্তিত্ব	মূল বা আদি অস্তিত্ব
৩।	কর্ম	বিকর্ম বা অকর্ম
৪।	জগৎ	শূন্য
৫।	প্রকৃতি	পুরুষ
৬।	মহামায়া	ব্রহ্ম
৭।	ব্যক্ত	অব্যক্ত
৮।	প্রকাশ	অপ্রকাশ
৯।	সংসার	অসংসার
১০।	অবিদ্যা	বিদ্যা
১১।	গৃহস্থ	সন্ন্যাস বা ত্যাগ
১২।	দুঃখ	সুখ
১৩।	মাতা	পিতা
১৪।	শিষ্য	গুরু
১৫।	সকল ইন্দ্রিয় ও রিপু	ইন্দ্রিয়াতীত
১৬।	যত দেব-দেবী	মহাশূন্য
১৭।	নাম	অনামা
১৮।	বিয়োগ	যোগ
১৯।	পরিবর্তনশীল	অপরিবর্তনীয়
২০।	উৎপত্তি	অনুৎপত্তি বা মিলন
২১।	ভ্রম, মিথ্যা বা অলীক	সত্য
২২।	সৃষ্টি	লয়
২৩।	দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি	অদর্শন, অশ্রবণ ইত্যাদি
২৪।	পঞ্চমহাভূত	ব্রহ্ম
২৫।	অজ্ঞান	জ্ঞান
২৬।	রূপ	অরূপ
২৭।	প্রাণ	ব্রহ্ম
২৮।	গুণ	গুণাতীত বা নির্গুণ

চঞ্চলতাই	স্থিরত্বই
২৯। স্থূল	শূন্য
৩০। কার্য	কারণ
৩১। তরঙ্গ বা কম্পন	নিশ্চল
৩২। নারী	পুরুষ
৩৩। গর্ত্ত	শূন্য
৩৪। জন্ম	মৃত্যু
৩৫। নাম	নামী
৩৬। কাল	কালাতীত
৩৭। খণ্ড	অখণ্ড
৩৮। দুই বা বহু	এক
৩৯। দ্বৈত	অদ্বৈত
৪০। সীমিত বা সীমা	অসীম
৪১। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ	অসীম বা অনন্ত
৪২। যত কিছু জানা	জানাজানি নেই
৪৩। যত কিছু শব্দ	শব্দাতীত বা গম্ভীর
৪৪। ক্রিয়া	পরাবস্থা
৪৫। শ্বাস-প্রশ্বাস	নিশ্বাস
৪৬। সাধন	সাধনাতীত বা লক্ষ
৪৭। যত কিছু দর্শন ও শ্রবণ	কিছুই নেই
৪৮। গতি	অগতি
৪৯। বিনাশী	অবিনাশী
৫০। মন্দ বা অমঙ্গল	ভাল বা মঙ্গল
৫১। জাগতিক জ্ঞান	জ্ঞানাতীত নিরঞ্জন
৫২। মূর্ত্ত	অমূর্ত্ত
৫৩। অধর্ম	ধর্ম
৫৪। প্রবৃত্তি	নিবৃত্তি
৫৫। জায়া	পতি
৫৬। ভয়	অভয়
৫৭। নিরানন্দ	আনন্দ
৫৮। বন্ধন	মুক্তি বা নির্বাণ

	চঞ্চলতাই	স্থিরত্বই
৫৯।	অনিত্য	নিত্য
৬০।	সাকার	নিরাকার
৬১।	হিংসা	অহিংসা
৬২।	সকাম	নিষ্কাম
৬৩।	বর্তমান	কালাতীত
৬৪।	ভিন্ন	অভিন্ন
৬৫।	পৃথক	এক
৬৬।	পর	আপন
৬৭।	তুমি	আমি বা স্বয়ং
৬৮।	আমি, তুমি ইত্যাদি	কিছু নেই
৬৯।	নিকৃষ্ট	উৎকৃষ্ট
৭০।	ক্ষণস্থায়ী	স্থায়ী
৭১।	অশান্তি	শান্তি
৭২।	পাপ-পুণ্য	কিছু নেই
৭৩।	অপূর্ণ	পূর্ণ
৭৪।	সময়	সময়াতীত
৭৫।	পরিবর্তনশীল বলে নূতন	পুরাণ বা আদি
৭৬।	ভাব	অভাব
৭৭।	মর	অমর
৭৮।	ক্ষর	অক্ষর
৭৯।	দেহী	বিদেহী
৮০।	স্তুতি বা প্রার্থনা	কিছু নেই
৮১।	প্রমাণ	অপ্রমাণ
৮২।	দৃশ্য	অদৃশ্য
৮৩।	চিন্তা	অচিন্তা
৮৪।	সাংখ্য বা সংখ্যা	লয
৮৫।	ভক্ত	ভগবান্
৮৬।	ভক্ত	ভক্ত-ভগবান্ নেই
৮৭।	ভক্ত ও ভগবানবোধ	দুই বলার কেউ নেই,; মিলে মিশে একাকার

	চঞ্চলতাই	স্থিরত্বই
৮৮।	চিৎ	অচিত্ত
৮৯।	কলি	সত্য
৯০।	আকাশ	মহাকাশ বা ব্রহ্মাকাশ
৯১।	অনাত্ম	আত্ম
৯২।	নাদব্রহ্ম	ব্রহ্ম
৯৩।	বেদ	বেদান্ত
৯৪।	শিবানী	শিবা
৯৫।	দুর্গা	মহাদেব
৯৬।	কালী	শিব
৯৭।	রাধা	কৃষ্ণ
৯৮।	চণ্ডী	শিব
৯৯।	পার্বতী	মহাদেব
••।	জগদ্ধাত্রী	বিশ্বনাথ

"জিসকো বাতকা ঠিকানা নহি উস্কা
বাপ য়ানে ভগবানকাভি ঠিকানা নহি" ॥ ৬৪ ॥

বর্ত্তমানকালে বেশীরভাগ মানুষের মধ্যে সত্য কথা বলা, নিজের কথার দাম রাখা এসব প্রায় কম দেখা যায়। সাধারণ মানুষ ভাবে মিথ্যা কথা বলে অথবা অন্য যে কোনো শঠতার পথ অবলম্বন করে আপাতত লাভবান হবে, কিন্তু পরিণামে যে লাভবান হয় না একথা তারা ভাবে না। মিথ্যার আশ্রয়ে থাকলে বা সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করলে জাগতিক স্থূল বস্তু অনেক সময় লাভ করা যায় কিন্তু তা কখনই পরিণামে মঙ্গলদায়ক হয় না। আবার অপরদিকে এও দেখা যায় যে যারা সত্য কথা বলে, সত্যের আশ্রয়ে থেকে জীবন অতিবাহিত করে তারা জাগতিক বস্তুলাভে বা জাগতিক সুখ-সাচ্ছন্দ লাভে আপাতত বঞ্চিত হয় বটে কিন্তু পরিণামে তারা যে আত্মিক সুখলাভ করে তা পূর্বোক্তদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। শাস্ত্রকারগণ একথা বারবার সকল মানুষকে বলেছেন যে—সত্যের জয় সর্বত্র। যোগিরাজের মতে জাগতিক কোনো বস্তুই সত্য নয়, কারণ সবই বিনাশী এবং পরিবর্তনশীল। একমাত্র

আত্মাই সত্য। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই সত্যজ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত মনুষ্য জন্ম সফল হয় না। এই সত্যজ্ঞান লাভ করতে হলে আমাদের যেটা জাগতিক জীবন সেখানেও সত্য আচরণ এবং সত্যের ওপর নির্ভর করে জীবন যাপন করা উচিত। তাই কথায় বলে যার শেষ ভাল তার সব ভাল। এই শেষ ভাল যাতে হয় তার জন্য জীবনকে সত্যের পথে চালিত করা একান্ত কর্তব্য। কায়-মনোবাক্যে সত্য পালন করলে তা এই জীবনেই প্রতিফলিত হয়। কর্ম তিন প্রকারের হয়ে থাকে। শরীরের দ্বারা, মনের দ্বারা এবং বাক্যের দ্বারা। কর্মের ধর্মই হল ফল উৎপাদন করা। যেমন কর্ম করা হবে তেমন ফল অবশ্যই লাভ করতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তি দেহ মন বা বাক্যের দ্বারা মিথ্যা আচরণ বা কর্ম করে তবে তার ফল তাকেই পেতে হবে। যেমন যদি কোনো ব্যক্তি প্রায়ই মিথ্যা কথা বলে তবে তার প্রভাবে সেই ব্যক্তির মধ্যে একটা মিথ্যার স্বভাব আপনাহতেই তৈরী হয়। সত্যে পৌঁছানোর জন্য যে জীবন বা চরিত্রের প্রয়োজন তা তার পক্ষে সম্ভব হয় না অতএব আত্মসত্যকে জানতে হলে নির্মল চরিত্রের অবশ্যই প্রয়োজন এবং তা ক্রমে ক্রমে গঠন করতে হয়, একদিনে হবার নয়। তাই যোগিরাজ বলেছেন যার কথার দাম নেই তার জাগতিক জীবনেরই ঠিক নেই, তেমন ব্যক্তির কাছে ঈশ্বর বা আত্মসত্য অনেক দূরে। যার মন যত বেশী চঞ্চল সে তত বেশী মিথ্যা কথা বলে এবং যার মন যত স্থির সে তত সত্যের দিকে এগিয়ে যায়। এই চঞ্চল মনকে স্বাভাবিক উপায়ে স্থির করতে না পারায় অর্জুন শ্রীভগবানের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে বায়ুকে কিছু সময় থামিয়ে রাখা যায় কিন্তু মনকে থামানো যায় না, একে থামাবার উপায় কি? এর উত্তরে শ্রীভগবান্ বলেছেন—যোগাভ্যাস করো। যোগিরাজও সে কথাই বলেছেন যে অন্তর্মুখী প্রাণকর্মরূপ যোগাভ্যাস উত্তমপ্রকারে করতে থাকলে আপনাহতেই দেহস্থ সকল বায়ু স্থিরত্বের দিকে যাবে এবং যতই অভ্যন্তরস্থ বায়ু স্থির হতে থাকবে মনও ততই স্থির হবে। শেষে যখন সমস্ত বায়ু স্থির হয়ে মুখ্য এক প্রাণবায়ুতে মিশে যাবে তখন মন সম্পূর্ণরূপে স্থির হয়ে মন্মনা অবস্থা প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ মনেতে মন মিশে যাবে অর্থাৎ চঞ্চল মন স্থির মনে রূপান্তরিত হবে। যখন মন এই প্রকারে স্থির হবে অর্থাৎ এই প্রকার স্থিরত্ব সম্পন্ন যোগী সদা সত্যে অর্থাৎ স্থিরে বা একে অবস্থান করায় তাঁর পক্ষে আর মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা আচরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রাণকর্মের মাধ্যমে স্থিরত্বে উপনীত হতে পারেনি সে চঞ্চলতার অন্তর্গতে থাকায় সময়ে সময়ে মিথ্যা কথা বলে বা মিথ্যা আচরণ করে থাকে। এই প্রকার মিথ্যা কথা বা আচরণ যে শাস্ত্রসম্মত নয় এবং পরিণামে যে মঙ্গলদায়ক হয় না সেকথা বলতে গিয়ে শাস্ত্র বলেছেন—বাচা যচ্চ প্রতিজ্ঞাতং কর্মনা নোপপাদিতম্।

ঋনং তদ্ধর্মসংযুক্ত মিহ লোকে পরত্রচ। (কাশীখণ্ড ৪০/১২১) অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা যা স্বীকার করে কার্যত সম্পাদন না করা যায়, তা ইহ ও পরকালে ধর্মসঞ্জত ঋণস্বরূপ হয়ে থাকে। অতএব জীবনে যাতে মিথ্যার প্রভাব না পড়ে সে বিষয়ে সদা সতর্ক থাকা একান্ত কর্তব্য। যদি সবদিক থেকে সৎ জীবন যাপন করা যায় তাহলে সেই সত্তের প্রভাবে আপনাহতেই আত্মসত্যকে জানবার আগ্রহ জাগবে এবং ক্রমে আত্মকর্ম প্রাপ্ত হয়ে জীব আত্মসত্যে পৌঁছে যাবে। এই আত্মসত্যই সকলের পিতা, কারণ তিনিই সবকিছুর বীজস্বরূপ পিতা। তাই যোগিরাজ বলেছেন যার কথার দাম নেই তার পক্ষে আত্মসাধন করা সম্ভব নয় এবং আত্মসাধন না করতে পারায় বীজস্বরূপ পিতাকে জানতে পারে না। তাই যোগিরাজ ভক্তদের ক্রিয়া প্রদান কালে চারটি প্রতিজ্ঞা করাতেন। প্রথম প্রতিজ্ঞা সারাজীবন ক্রিয়া করতে হবে। দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা এই গুহ্য থেকে গুহ্যতম রহস্যপূর্ণ যে আত্মসাধন তা গুরুর অনুমতি ব্যতীত কাউকে বলা চলবে না। তৃতীয় প্রতিজ্ঞা পুরুষগণকে নিজ স্ত্রী ছাড়া অপর মহিলাদের মাতৃবৎ জ্ঞান করতে হবে এবং মহিলাগণকে নিজ পতি ছাড়া অপর পুরুষদের পিতৃবৎ জ্ঞান করতে হবে। চতুর্থ প্রতিজ্ঞা প্রতিদিন অন্তত এক অধ্যায় গীতা পাঠ করতে হবে; অশিক্ষিতগণ গীতা পাঠ শুনবে। যদি কোনো ভক্ত এই প্রতিজ্ঞাগুলি যথাযথ পালন না করতো তিনি তাদের কঠোরভাবে শাসন করতেন। তাঁর উপদেশ ছিল সকলে সৎভাবে জাগতিক জীবন যাপন কর এবং সংসারে থেকে আত্মসাধন পরায়ণ হও।

"জিহ্বা তালুকে ভিতর গড়ায় দিয়া—ওঁকার ধ্বনি
যো সুনাতা হয় সোই মূলমন্ত্র রামনাম হয়" ॥ ৬৫ ॥

রাম হলেন দশরথ পুত্র। দশ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট এই যে দেহরূপ রথ এই রথই দশরথ। এই রথের মধ্যে অবস্থান করে এই রথকে যিনি পরিচালিত করেন তিনিই দাশরথি। এই দাশরথি হলেন স্বয়ং আত্মারাম। এই দাশরথি অযোধ্যা নিবাসী বা অযোধ্যার অধিপতি কারণ তিনি অপরাজেয়। এই রামের রঙ নীল। নীল হল অনন্তের রঙ বা প্রতীক, তাই আকাশ এবং সমুদ্রের রঙ নীল। এই আত্মারাম দেহরূপ রথে অবস্থান করলেও মূলত তিনি সীমাহীন। কারণ দেহরূপ রথের যে দশ ইন্দ্রিয় তারা প্রত্যেকেই দশদিকে ধাবমানশীল অর্থাৎ সকল দিকেই যেতে পারে। তাই দশ ইন্দ্রিয় গুণ দশদিক সমান একশ দিক অর্থাৎ সকল দিক। তাহলে বোঝা গেল যে এই দেহরূপ রথের অর্থাৎ দশরথের পুত্র যিনি দাশরথি অর্থাৎ আত্মারাম তিনিই অনন্ত

হওয়ায় সর্বত্র অবস্থিত। এই দাশরথির হাতে তীর ধনুক। এই দেহ ধনুক এবং শ্বাস তীর। এই দেহরূপ ধনুককে এবং শ্বাসরূপ তীরকে যিনি পরিচালিত করেন ও কাণ্ডারী তিনিই দশরথ পুত্র দাশরথি। এই রামের পত্নি জনকনন্দিনী জানকী। জানকী জান শব্দ জাত। জান শব্দে জীবন। প্রাণের চঞ্চল অবস্থাকেই জীবন বলা হয়। এই চঞ্চল অবস্থা হতেই সবকিছুর উৎপত্তি, তাই ইনি নারীরূপা। কিন্তু প্রাণের যে স্থিরাবস্থা তা সবকিছুর বীজপ্রদ পিতা, তাই তিনি পুরুষপ্রধান আত্মারাম। এই জানকী জনকনন্দিনী। জনক শব্দে পিতা অর্থাৎ স্থির প্রাণ। এই স্থির প্রাণ হতেই চঞ্চল প্রাণের উৎপত্তি হয়। জনক জমিতে হাল কর্ষণ কালে জানকীরূপা কন্যাকে লাভ করেছিলেন অর্থাৎ জানকীর উৎপত্তিস্থল আবাদি জমি। এই দেহই জমি বা ক্ষেত্র। প্রমাণ 'ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে'। (গীতা ১৩/১)। অর্থাৎ এই দেহরূপ ক্ষেত্রকে শ্বাসরূপ হালের দ্বারা কর্ষণ করতে থাকলে অর্থাৎ চাষ করতে থাকলে আপনাহতেই যে মহান্ আত্মজ্যোতিরূপা আদ্যাশক্তির উদয় হয় তিনিই জানকী। তাই মহাত্মা রামপ্রসাদ বলেছেন—'এমন মানব জমিন্ রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা।' যেহেতু এই জানকীর উৎপত্তিস্থল জমি, তাই তিনি পুনরায় জমিতেই প্রবেশ করেছিলেন অর্থাৎ যেখান থেকে এসেছিলেন সেই ক্ষেত্রেই মিশে গেলেন। কারণ চঞ্চল প্রাণ এই দেহরূপ ক্ষেত্রেই অবস্থিত, দেহাতীত অবস্থায় চঞ্চলতা না থাকায় পুরুষপ্রধান স্থির আত্মারাম। উত্তম প্রকারে দীর্ঘ প্রাণকর্ম করতে থাকলে প্রাণের চঞ্চলতার অবসানে স্থির পুরুষপ্রধান আত্মারাম।

জল যতক্ষণ কলসিতে থাকে ততক্ষণ সীমাবদ্ধ এবং তার শক্তিও সীমিত। সেই জল যখন নদীতে মেশে তখন সে অনন্ত এবং তার শক্তিও অনন্ত হয়। তাই যোগিরাজ বলেছেন—'জল যবতক ঘটমে উস্কা কুছ তাকত নহি, যব গঙ্গামে মিলে তো সবকুছ করে'। অনন্ত আত্মসত্তা স্পন্দিত হয়ে প্রাণরূপে সকল দেহঘটে অবস্থান করায় সীমাবদ্ধ হন, জীবরূপে প্রতিভাসিত হন। আবার উত্তম প্রাণকর্মের দ্বারা প্রাণের এই সীমাবদ্ধ অবস্থাকে চঞ্চলতা রহিত করে অসীমের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারলে এই প্রাণসত্তাই আত্মসত্তারূপে অসীম হয় এবং তখন তার ক্ষমতাও অসীম হয়। কিন্তু যতক্ষণ দেহের মধ্যে চঞ্চলরূপে সীমাবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তার ক্ষমতাও সীমিত থাকে। যেহেতু চঞ্চলতাই প্রকৃতি এবং স্থিরত্বই পুরুষ, তাই জীবের বর্তমান অস্তিত্বই হল জানকী পদবাচ্য। আবার এই জীবই উত্তম প্রাণকর্মের মাধ্যমে যখন স্থিরত্বে উপনীত হয়ে অনন্তত্ব লাভ করে তখন সে নিজেই আত্মারাম হয়। তাই যোগিরাজ বলেছেন—রমার সহিত অর্থাৎ চঞ্চল প্রাণরূপা জানকীর সহিত যিনি সদা রমণ করেন অর্থাৎ সদাই যুক্ততম অবস্থায় থাকেন তিনিই আত্মারাম।

প্রাণের স্থির অবস্থাই আদি বা মূল। সেই মূল অবস্থা হতেই চঞ্চল অবস্থার উৎপত্তি হয় এবং সেই চঞ্চল অবস্থার মধ্যেও স্থির অবস্থা সদা বর্তমান থাকায় উভয় অবস্থাই যুক্ততম। স্থিরকে বাদ দিয়ে চঞ্চল অবস্থার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। একারণেই তিনি এমাব সহিত সর্বদা রমণ করছেন, তাই সেই স্থির অবস্থাই আত্মারাম। বাহ্যভাবে দশরথ পুত্র রাম এবং জনকনন্দিনী বিনাশী। কিন্তু আত্মজ্ঞানে যে আত্মারাম ও জানকীর কথা ওপরে বলা হল তা অবিনাশী এবং এই অবিনাশী রাম-সীতা সকল দেহঘটে বিরাজিত। এই আন্তর অবিনাশী রাম-সীতাই সকলের উপাস্য, আরাধিত ও পূজিত। এই রাম-সীতাই সকলের বন্ধনকর্তা ও মুক্তিদাতা। তাই যোগিরাজ বলেছেন যে উত্তম ও অধিক প্রাণকর্ম করতে থাকলে আপনা হতেই যখন প্রাণস্পন্দিত মূল বা আদি শব্দ শোনা যায়, যাকে ওঁকার ধ্বনি বলে, সেই ওঁকার ধ্বনিই হল মূল মন্ত্র রামনাম। এই প্রকারে ওঁকার ধ্বনির মাধ্যমে রামনামকে জানতে পারলে মনুষ্য জীবন সফল হয়, বাহ্য চিৎকার করে রামনাম করার কোনো প্রয়োজন নেই। হে জগৎবাসী, আমি নিজে এই প্রকারে রামনামকে প্রত্যক্ষভাবে জেনে তবেই তোমাদের কাছে বলছি যে তোমরাও এই প্রকারে রামনামকে জানার চেষ্টা কর, বৃথা সময় নষ্ট কোরো না। এটাই হোলো সকল শাস্ত্রের মূল কথা বা গুপ্ততম, গুহ্যতম রহস্য। এই প্রকার রামজ্ঞানই আত্মজ্ঞান। এই প্রকার আত্মজ্ঞানরূপ আত্মারাম ব্যতীত বাহ্যভাবে যে দশরথপুত্ররূপ রামজ্ঞান তাতে বিশেষ লাভ হয় না, কারণ 'দর্পণকে ভিতর যো নদী উসসে পিয়াস নহী যাতা।'

(এ বিষয়ে ১২ নম্বর শ্লোকে আরো বিশদ আলোচনা করা হয়েছে)

"ইহ শরীরকে ভিতর দুসরা এক শরীর
হয় এয়সেহী লেকন কালা।" ॥ ৬৬ ॥

সাধারণ মানুষ তার এই শরীরটাকেই আমি বলে জানে এবং শরীরের সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ বলে মনে করে। শরীরের কষ্ট হলে মনে করে আমার কষ্ট ব শরীরের সুখ হলে মনে করে আমার সুখ। তাই সদাই সকলে এই শরীরের সেব করতেই ব্যস্ত। কি করলে আরো অধিক ভালো ভালো জাগতিক বস্তু লাভ হবে অধিক ধনসম্পত্তি হবে, শরীর ও মনের সুখ হবে, আনন্দ হবে এই নিয়েই মানুষ সর্বদ ব্যস্ত। এর মধ্যে যারা আরো অধিক দেহাসক্ত তারা এই দেহ ও মনের সেবার জ মদ্যপান, নারীসক্ত ইত্যাদি অনেক প্রকার পথ অবলম্বন করে থাকে। তাদের একটা

চিন্তা কি করলে দেহের সুখ হবে, কারণ তাদের কাছে দেহটাই আমি। তারা একবারও ভাবে না যে এই দেহ আমি নই, এই দেহ অনিত্য, আজ আছে কাল নেই। এ বিষয়ে যোগিরাজ বলেছেন—'মায়া কর্তৃক হাড়মাস দেখা যাইতেছে, তাহা যত শীঘ্র যায় অর্থাৎ মায়ার বিষয় যত শীঘ্র যায় ততই ভাল ।' তিনি আরো বলেছেন —'একদিন নিশ্চয় সকলকে সব ছাড়িতে হইবে। সেদিন যে কাহার কবে হবে নিশ্চয় নাই। লোকে নিশ্চিন্ত থাকে, কিন্তু সে অবস্থা যখন হঠাৎ আসে তখন সব হায় হায় করে। অতএব লক্ষ্য স্থির করিয়া সকলকার সেই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। বস্তুত তাঁহার জন্য প্রাণ না কাঁদিলে তাঁহাকে অন্তরে ডাকিবার শক্তি হয় না।'

প্রাণের এই চঞ্চল অবস্থাই মায়া। এই মায়া আছে বলেই অর্থাৎ প্রাণ চঞ্চল বলেই এই হাড় মাংসের দেহ রচিত হয়েছে এবং যতক্ষণ এই মায়া থাকবে অর্থাৎ যতক্ষণ প্রাণ চঞ্চল থাকবে ততক্ষণ এই দেহ থাকবে। আবার যখন প্রাকৃতিক কারণে প্রাণ থেমে যাবে তখন এই দেহের পতন হবে। কিন্তু এই অবস্থায় কর্ম সংস্কার থাকে বলে জীব পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। মাকড়সা যেমন নিজেরই লালা দ্বারা জাল রচনা ক'রে তারই মধ্যে অবস্থান করে, এই দেহও ঠিক তাই। স্থির প্রাণ চঞ্চল হলেই মায়া ; সেই মায়া এই দেহ রচনা ক'রে তারই ভেতর স্থির ভাবে অবস্থান করেন। এই স্থিরত্বটাই যে সে নিজে এই বোধ না থাকায় তাকে কেউ জানতে চায় না বা জানার আগ্রহ জাগে না। তাই যোগিরাজ বলেছেন এই বিনাশী দেহ এবং তার সুখের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সকলের উচিত স্থির লক্ষ্যে প্রত্যেকের মূল সত্ত্বা স্থিরত্বের দিকে এগিয়ে যাওয়া। এই স্থিরত্বকে লাভ করবার জন্যে বা এই স্থিরত্বই যে আমি, সেই আমিকে জানা একান্ত প্রয়োজন, ভেতর থেকে এরকম প্রেরণা বা আগ্রহ যতক্ষণ না জাগে ততক্ষণ মানুষ প্রাণকর্মরূপ আত্মসাধনে ব্রতী হয় না। কিন্তু যখন নিজেকে জানার আগ্রহ জাগে তখন মানুষ জপ, তপ, মূর্তিপূজা, আরাধনা ইত্যাদি সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আত্মকর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং শেষে নিজেই নিজেকে জানতে পারে। নিজেকে জানাটাই ব্রহ্মজ্ঞান। তাই যোগিরাজ বলেছেন—'আপহিকো আপ জাননা ইসিকো ব্রহ্মজ্ঞান কহতে হ্য।'

একটা নারকেল তার ওপরে ছোবড়া, মধ্যে মালা, মালার ভেতরে শাঁস। এই তিন স্তরের মধ্যে থাকে বিশুদ্ধ জল। এই মানব শরীরও ঠিক এইরকম। বর্তমান এই শরীরটা হোলো স্থূল শরীর, যা মাটি জল তেজ বায়ু এবং আকাশ এই পঞ্চভূত দ্বারা গঠিত এবং পঞ্চভূত হতে যে সব খাদ্য নির্মিত হয় তারই দ্বারা এই স্থূল দেহ পুষ্টিলাভ করে থাকে। তাই এই স্থূলদেহ হাড় মাংস রক্ত কফ এবং বায়ু দ্বারা নির্মীত। এই জন্যই এই স্থূল শরীর অস্থায়ী। নারকেলের ভেতর দ্বিতীয় স্তর যেমন মালা, তেমনি

এই স্থূল শরীরের ভেতর এক সূক্ষ্ম শরীর আছে। এই সূক্ষ্ম শরীরের ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই বটে কিন্তু জন্ম মৃত্যু আছে। তাই এই সূক্ষ্ম শরীরও অস্থায়ী। নারকেলের ভেতর তৃতীয় স্তর যেমন শাঁস, তেমনি এই দেহের মধ্যে তৃতীয় স্তর হোলো কারণ শরীর। এই কারণ শরীর হতেই পূর্বোক্ত দুই শরীর গঠিত হয়, তাই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তি স্থল হোলো এই কারণ শরীর। তাই স্থূল শরীরের অন্তর্গত সূক্ষ্ম শরীর এবং সূক্ষ্ম শরীরের অন্তর্গত কারণ শরীর। সুষুপ্তি কালে ইন্দ্রিয়াদি বিষয় হতে মুক্তিলাভ করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির কর্ম রহিত হয়ে পূর্বোক্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর নিদ্রিত হয়, কিন্তু কারণ শরীর নিদ্রিত হয় না। এ কারণে প্রথমোক্ত দুই শরীর বিশ্রাম লাভ করতে পারে কিন্তু তৃতীয় কারণ শরীর কখনই বিশ্রাম পায় না। নিদ্রাকালে এই প্রকারে বিশ্রামলাভ করায় প্রথমোক্ত দুই শরীর পুনরায় নবীন কর্মোদ্যম ফিরে পায়। আবার জীব যখন দেহত্যাগ করে তখন ওই প্রথমোক্ত দুই শরীরের নাশ হয়ে তৃতীয় কারণ শরীরে অব্যক্তভাবে অবস্থান করে। কর্মের তারতম্য অনুসারে জীব কিছুকাল ওই কারণ শরীরে অবস্থান করে পুনরায় সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর রচনা করে ফিরে আসে অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু জীব কিছুতেই তৃতীয় কারণ শরীরকে অতিক্রম করতে পারে না। আত্মকর্ম ব্যতিরেকে এই তৃতীয় স্তরকে অতিক্রম করা যায় না, আবার এই তৃতীয় স্তরকে অতিক্রম করতে না পারা পর্যন্ত মহাশূন্যে অর্থাৎ সকল আবরণের অতীতে যাওয়া যায় না, মুক্তিলাভও হয় না। যোগী আত্মকর্মরূপ যোগসাধন করতে করতে যখন স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীরের অতীতে চলে যান, যখন এই দুই শরীরের অস্তিত্ব অনুভব এবং তাদের সকল কর্ম থেমে যায়, ঠিক মৃত্যুর পর জীবের যে অবস্থা লাভ হয় অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীব যে অবস্থায় উপনীত হয়, যোগী তখন সেই কারণ-শরীরে পৌঁছে যাওয়ায় তখন সেই কারণশরীর দর্শন হয়। এই কারণ শরীর কিন্তু স্থূল এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরের মত একই রকম দেখতে কিন্তু কালো। এটাই জীবের নিজের রূপ এবং এই পর্যন্তই রূপের অস্তিত্ব। এরপর জ্যোতিরূপ এবং জ্যোতিরূপের পর অরূপ। তাই স্থূল শরীরের আধার স্থল সূক্ষ্ম শরীর, সূক্ষ্ম শরীরের আধার স্থল কারণ শরীর, কারণ শরীরের আধার স্থল জ্যোতি এবং জ্যোতির আধারস্থল অরূপ। আয়নার সামনে দাঁড়ালে যেমন নিজের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তেমনি স্থিরত্বলাভ করে যোগী যখন কূটস্থরূপী আয়নার সামনে উপনীত হন তখন আপনাহতেই প্রথমোক্ত দুই শরীরের আশ্রয়স্থল যে কারণ শরীর, যেটা তাঁর নিজের রূপ তা দর্শন হয়। কিন্তু যোগী এই স্বরূপ দর্শনে না থেমে জ্যোতির ঊর্ধ্বে মহাশূন্যে অবস্থান করার চেষ্টা করেন। কারণ তিনি জানেন যে এ সবই মায়িক। তাই যোগিরাজ কখনো বলেছেন—'আপনা রূপসে ভিন্ন রূপ দেখ পড়া। নারায়ণকা রূপ অন্তরদৃষ্টিমে মালুম

হোতা হয়।' আবার কখনও বলেছেন—'এক শ্বেত পুরুষ আপনে মাফিক দেখা।' আরো লিখেছেন—'আপনা রূপ দেখা—নারায়ণকা রূপ হয়—বড়া মজা—অব কাম করণেমে আসকত হুয়া।' এই যে কারণ শরীর তাই নিজের রূপ এবং নারায়ণের রূপ। এই কারণ শরীরই যেমন কখনও কালো দেখায়, আবার নিজেরই মতো সাদা দেখায়। যখন এই রূপ দেখা যায় তখন এমন এক আলস্য ঘিরে ধরে যে মনে হয় ওই রূপকে দেখি এবং চুপচাপ পড়ে থাকি। এর পরেই বলেছেন—'আজ বাঁসুলিকা আওয়াজ আচ্ছা হুয়া শূন্য ভবন মিল রহনা চাহিএ।' অর্থাৎ আজ আরো উত্তম প্রাণায়াম হওয়ায় বাঁশির মতো আওয়াজ নির্গত হলো এবং এই অবস্থায় সকল রূপের অতীতে যে মহাশূন্য দেখা গেল, সেই মহাশূন্যে মিলে থাকতে হবে। এই মহাশূন্যে সর্বদার জন্যে মিলে থাকতে পারলে আর কোনো রূপ থাকবে না, দর্শন থাকবে না, জন্ম-মৃত্যুর পরপারে পৌঁছে যাওয়া যাবে।

"নাককে উপর তাককে ভৌকে উপর কপালকে
বিচমে তাককে ঠহর রহনা কঠিন হয়—ইসিসে
স্থিতিপদ য়ানে সমাধি হোতা হয়"॥ ৬৭॥

নাসিকাগ্র বলতে সবাই জানে মুখের ওপরে, নাকের দুই ছিদ্রের ওপরে নাকের যে উঁচু অংশ তার ডগাকে। শাস্ত্রে নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির রেখে ধ্যান করবার বিধি আছে। একারণে অনেকে চোখের দুই তারাকে নাকের গোঁড়ার দিকে টেনে এনে নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রেখে ধ্যান করে থাকে। অনেকে বই পড়ে এই প্রকার করে থাকে, আবার অনেকে গুরুর নিকট হতে এই প্রকার কর্মের উপদেশ পেয়ে করে থাকে। যে যেভাবেই লাভ করুক না কেন এই প্রকারে নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির রেখে ধ্যান করা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক কাজ। এতে কোনো উপকার হয় না, বরং ক্ষতির সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকে। অনেক সময় চোখ টেরা হয়ে যায় এবং মানসিক বিকার হয় এমনও দেখা গেছে। এই প্রকারে নাকের ডগায় দৃষ্টি স্থির রেখে ধ্যান করার বিধি কোনো যোগী কখনও অনুমোদন করেন না। শাস্ত্রোক্ত নাসিকাগ্র বলতে দুই ভ্রূর মাঝে কপালে নাসিকার মিলনস্থলকে বোঝায়, যাকে আজ্ঞাচক্র বা কূটস্থ বলে। যোগীরা এই কূটস্থে, চক্ষুদ্বয়কে আধা বোজা অবস্থায় বা শিবনেত্র অবস্থায় দৃষ্টি স্থাপন করে ধ্যান করার অনুমোদন করে থাকেন। এই অবস্থাকেই শাম্ভবী অবস্থা বলে। গীতাও তাই বলেছেন— 'ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ (গীতা ৮/১০)'

যোগীর মতে কূটস্থই সাধনার পীঠভূমি। এই কূটস্থই হোলো প্রান্তসীমা, যার ওপরে স্থির এবং নীচে চঞ্চল। মন যদি কূটস্থের নীচে থাকে তাহলে চঞ্চল থাকতে বাধ্য হয় এবং যদি কূটস্থ বা তার ওপরে থাকে তাহলে স্থির থাকতে বাধ্য হয। এ কারণেই যোগিরাজ বলেছেন যে নাকের ওপর কপালে ভ্রূদ্বয়ের সন্ধিস্থলে, চক্ষুদ্বয় আধাবোঁজা অবস্থায় রেখে অন্তর্দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা সাধারণের পক্ষে কিছুটা কঠিন কাজ ঠিকই কিন্তু যদি ওই অবস্থায প্রতিদিনের অভ্যাসের মাধ্যমে থাকা যায় তাহলে স্থিতিপদ বা সমাধি অবশ্যই লাভ হয়। বিনা প্রাণকর্মে এই অবস্থায় থাকাটা নিশ্চযই কিছুটা কঠিন। কিন্তু যদি প্রতিদিন অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করা হয় এবং তার সঙ্গে কূটস্থে দৃষ্টি স্থির রাখার চেষ্টা করা হয় তাহলে এ কাজ অত্যন্ত সহজ ও সুখপ্রদ হয় অর্থাৎ প্রাণকর্মের মাধ্যমে কূটস্থে দৃষ্টি স্থির রাখাকে মহাযোগিগণ অনুমোদন করেন, কারণ এটাই বিজ্ঞান সম্মত উপায়। কিন্তু যারা অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম জানে না তারা প্রাণকর্ম ব্যতীত অন্তর্মুখীভাবে উপরোক্ত প্রকারে কূটস্থে দৃষ্টি স্থির রাখার চেষ্টা করে তবে তা কোনোরকম ক্ষতির কারণ না হলেও কিছুটা কঠিন নিশ্চয়ই হবে। বিনা প্রাণকর্মে এই প্রকারে দৃষ্টি স্থির রাখলে যাদের মাথা ধরার রোগ আছে তাদের সে রোগ বাড়তে পারে, কেবল এই একটাই ক্ষতির কারণ হয়। কিন্তু যদি অন্তর্মুখী প্রাণকর্মের সহিত এই প্রকারে কূটস্থে দৃষ্টি স্থির রাখা যায় তাহলে ক্ষতির সম্ভাবনা কিছুই থাকে না এবং অত্যন্ত সুখপ্রদ, আনন্দদায়ক হয় এবং এক অপূর্ব নেশা তখন যোগীকে ঘিরে ধরে। অনেক সময় এই নেশা যোগীকে মাতাল করে দেয়। যোগী তখন বাহ্য বিষয় সবকিছু ভুলে গিয়ে, এমনকি নিজের দেহকেও ভুলে গিয়ে ব্রহ্মানন্দে বিচরণ করেন। শৈব দর্শন মতে এই শাম্ভবী অবস্থা যোগীর এক উত্তুঙ্গ অবস্থা। যোগিরাজও এই প্রকারে কূটস্থে বিনা অবলম্বনে এবং কোনো কিছু না দেখে প্রাণকর্মের মাধ্যমে দৃষ্টি স্থির রাখাকে সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করেছেন, যা সকল ক্রিয়াবানেরা করে থাকেন।

"বিনা ইচ্ছার লাভ বড় লাভ বোধ হয় তদবৎ
বিনা কুম্ভকে কুম্ভক বড় আনন্দ" ॥ ৬৮ ॥

প্রাণায়ামে সাধারণতঃ তিনটে কর্ম আছে পূরক কুম্ভক ও রেচক। শ্বাস টেনে নেওয়াকে বলে পূরক, কিছুক্ষণ দম বন্ধ করে রাখাকে বলে কুম্ভক এবং শ্বাস ছাড়াকে বলে রেচক। এই প্রকার প্রাণায়ামই সাধারণ লোকে জানে এবং করে থাকে। এই প্রকার প্রাণায়ামে ইচ্ছাকৃত দম আটকে রেখে কুম্ভক করাব বিধি আছে এবং এতে বাইরের বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগ করতে হয়। এই প্রাণায়াম সাধারণত লোকে বই পড়ে বা অযোগী গুরুদের নিকট হতে প্রাপ্ত হয়ে করে থাকে। এই প্রকার বাহ্য প্রাণায়াম গীতা, পাতঞ্জল যোগদর্শন এবং মহাযোগিগণ অনুমোদন করেন নি, কারণ এই প্রকার বাহ্য প্রাণাযামে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়, বরং এতে মানসিক বিকার সহ নানা প্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হয়ে থাকে। তাই মহাযোগিগণ এবং উপরোক্ত যোগশাস্ত্রদ্বয় অভ্যন্তর প্রাণাযামকেই একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় বলে নির্দেশ করেছেন। মহাযোগিগণ নিজেরাও এই অভ্যন্তর প্রাণায়াম করেন এবং পরবর্তী মানুষকে উপদেশ দেন। তাঁরা কখনও বাহ্য প্রাণায়ামের উপদেশ দেন না। তাই যোগিরাজ এখানে বলেছেন যে যেমন কোনো একটা বস্তু পাবার ইচ্ছা কখনও মনে জাগে নি, অথচ হঠাৎ যদি সেই বস্তু পাওয়া যায় তাহলে বড় লাভ বলে মনে হয় এবং খুবই আনন্দ দায়ক হয়। তেমনি বাইরের বায়ু হতে পূরক না করে এবং দমকে ইচ্ছাকৃতভাবে আটকে না রেখে, অভ্যন্তরমুখী ভাবে প্রাণায়াম করতে করতে যখন বিনা ইচ্ছায় আপনা হতে কুম্ভক অবস্থা লাভ হয় তা অত্যন্ত আনন্দদায়ক হয়। এই অভ্যন্তরমুখী প্রাণায়ামে বাইরের বায়ু টেনে নিতে হয় না, ইচ্ছাকৃতভাবে দমকে আটকে রেখে কুম্ভক করতে হয় না এবং ভেতরের বায়ুকে বাইরে রেচকের মাধ্যমে ত্যাগ করতেও হয় না। মহাযোগীদের এই প্রাণায়াম কেবল মাত্র ভেতরের বায়ুকে নিয়েই করতে হয়। তাই এই অভ্যন্তর-মুখী প্রাণায়ামকে বলা হয় ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যা। এই প্রাণায়াম গীতা অনুমোদিত, রাজযোগের অন্তর্গত এবং পাতঞ্জল, জনক প্রভৃতি মহর্ষিদের অনুমোদিত। গীতাতে এই প্রাণায়ামের পদ্ধতি সম্বন্ধে মাত্র একটি শ্লোকে বলা হয়েছে—'অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে। প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।' (গীতা ৪/২৯) যোগিগণ প্রাণ বায়ুকে অপান বায়ুতে এবং অপান বায়ুকে প্রাণ বায়ুতে স্থাপন করেন বা হোম করেন। এই কর্ম করতে করতে 'কেবল' নামক কুম্ভকের দ্বারা প্রাণের গতি রুদ্ধ হয় এবং প্রাণায়ামপরায়ণ হয়ে থাকেন। এখানে গীতা যে কুম্ভকের কথা বলেছেন সেই কুম্ভকের নাম 'কেবল কুম্ভক'। এই

'কেবল' নামক কুম্ভক ইচ্ছে করে কিছু সময় দম আটকে রেখে লাভ করা যায় না, অপান বায়ুকে প্রাণ বায়ুতে এবং প্রাণবায়ুকে অপানবায়ুতে বারবার মেলাতে থাকলে আপনা হতেই উপস্থিত হয়। তাই এর নাম কেবল কুম্ভক। এ কারণেই যোগিরাজ বলেছেন ইচ্ছাকৃত ভাবে কুম্ভক না করেও এই যে কেবল কুম্ভক তা বড়ই আনন্দদায়ক।

"আহস্তে আহস্তে বেমালুম সব কাম হোতা হয়।" ॥ ৬৯ ॥

আমরা যখন কোনো কাজ করি তখন সেই কাজের পেছনে ইচ্ছা মন বুদ্ধি এবং কর্মেন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয় অবশ্যই জড়িত থাকে। এগুলির অনুপস্থিতিতে কর্ম সম্পাদন হয় না। তাই এগুলিই সকল বাহ্যকর্মের আশ্রয়স্থল। এই ইচ্ছা মন বুদ্ধি কর্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় ইত্যাদি এদেরও একটা উৎপত্তিস্থল অবশ্যই আছে। সেই উৎপত্তিস্থল হোলো স্থিরবিন্দু, যা যোগিগণ কূটস্থে স্থিতিলাভ করলে দেখতে পান। ওই বিন্দুই সবকিছুর জননীস্বরূপা। তাই ওই বিন্দুর মধ্যে পূর্বোক্ত সবকিছুই সূক্ষ্মাকারে অবস্থিত থাকে। যোগী যখন ওই স্থির বিন্দুতে অবস্থান করেন তখন তিনি বাহ্যকর্ম কিছু না করলেও আপনাহতেই সবকিছু হয়ে যায়। এ অবস্থায় যোগীর ইচ্ছা মন বুদ্ধি কর্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রভৃতি সবই সুপ্তাবস্থায় সূক্ষ্মাকারে ওই বিন্দুতে অবস্থান করে। তাই যোগিরাজ বলছেন যে ইচ্ছা করে তাঁকে আর কোনো কর্ম করতে হচ্ছে না, কারণ ওই বিন্দুর মধ্যে যখন সবকিছু আছে, তখন তার ভেতর কর্মও আছে। তাই ওই বিন্দুতে থাকায় সব কর্ম যে আপনাহতে হবে এতে আশ্চর্য কি ? ওই বিন্দুতে থাকলে আর কোনো দিকে খেয়াল থাকে না ; খেয়াল না থাকায় কোন কর্ম করবার ইচ্ছা জাগে না। কিন্তু দেহ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কিছু কর্ম অবশ্যই করতে হবে যেমন খাদ্য গ্রহণ করা, জল পান করা, নিদ্রা যাওয়া, কথা বলা ইত্যাদি। কিন্তু এ অবস্থায় তিনি এসব বাহ্যকর্ম করছেন বটে কিন্তু সেদিকে খেয়াল না থাকায় কি করছেন তা তিনি নিজেই জানেন না। গীতার ভাষায় এই অবস্থাকেই কর্মসন্ন্যাসযোগ বলে। কর্মসন্ন্যাসযোগ অর্থে কর্ম ত্যাগ করা নয়, কর্মের প্রতি সমস্ত প্রকার ইচ্ছা ও আসক্তিরহিত অবস্থাকে বোঝায়। যোগিরাজও এখন এই প্রকার কর্মসন্ন্যাস অবস্থায় উপনীত হওয়ায় তাঁকে কিছুই করতে হচ্ছে না, অথচ তাঁর সব কর্ম আপনাহতে হয়ে যাচ্ছে। একেই বলে নিষ্কাম অবস্থা।

"সর্ব্বশক্তিবানকা হোনেকা আগম মালুম হুয়া যো সকস সব চিজ জানতা হেয় সো সকস সব চিজ কর সেক্তা হয়। জব সব ঐহি হয় তো হমভি ঐহি হেয় ত হম সব কুছ কর সেক্তা হয়।" ॥ ৭০ ॥

সর্বশক্তিমান্ হলেন ঈশ্বর। ঈশ্বরের মধ্যে আট প্রকার ঐশ্বর্য বিদ্যমান থাকে যথা অণিমা, লঘিমা, ব্যপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব এবং কামাবসায়িতা। অপর দিকে তিনিই প্রভু স্বামী রক্ষক পালক নিয়ন্তা শ্রেষ্ঠ প্রধান ও সমর্থ। এই আট প্রকার ঐশ্বর্য যাঁর ভেতর আছে তিনিই ঈশ্বর এবং তিনিই সর্বশক্তিমান্ অর্থাৎ ব্রহ্ম। কারণ একমাত্র ব্রহ্মের মধ্যেই সকল শক্তি নিহিত। যোগী যখন যোগ সাধনা করতে করতে স্থির ব্রহ্মে উপনীত হন তখন তিনি জানতে পারেন যে ব্রহ্মের মধ্যে সমস্ত শক্তি নিহিত। এর পর যোগী যখন নিজেকে স্থির ব্রহ্মে মিলিয়ে দেন, লয় হয়ে যান তখন তিনি নিজেই সকল শক্তির অধিকারী হন। যোগিরাজ এখন নিজেকে সেই স্থির ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার মত, লয় হয়ে যাবার মত ঠিক মুখোমুখী অবস্থায় পৌঁছে বুঝতে পারছেন যে ব্রহ্মের সকল শক্তি এখন তাঁর মধ্যে এসে গেছে। তাই তিনি বলছেন সর্বশক্তিমান্ হতে গেলে যে গুহ্য রহস্যকে অতিক্রম করা দরকার তা তিনি বুঝতে পেরেছেন। যে যোগী লয়ের ঠিক মুখোমুখি অবস্থায় এসে পৌঁছে যান তিনি তখন এ দুনিয়ার সব কিছু জানতে পারেন, তাঁর তখন অজানা বলে আর কিছু থাকে না। তাই এই প্রকার যোগীকেই জ্ঞানী বলা হয়। এই প্রকার জ্ঞানী ব্যক্তি সবকিছু অনায়াসে জানতে পারেন, তাই তিনি সবকিছু করতে সমর্থ হন। যখন জ্ঞান কর্ম ইত্যাদি সব কিছুই তিনি অর্থাৎ ওই স্থির ব্রহ্ম, তখন আমিও ওই স্থির ব্রহ্ম, অতএব এখন আমিও সবকিছু করতে পারি। যখন সবকিছুই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ছাড়া যখন কিছুই নেই তখন আমিও ব্রহ্ম। ব্রহ্মই যখন সবকিছু করেন, আবার আমি নিজেই যখন সেই ব্রহ্ম হয়ে গেলাম তখন আমিই সবকিছু করতে পারি, কারণ ব্রহ্ম আর আমি আলাদা নই, সব মিলে মিশে একাকার।

———

"ইহ সূর্য্যহি আদি পুরুষ হো জাতা হয় ফির এহি ব্রহ্মকা লিঙ্গরূপ লম্বা মালুম হোতা হয় সোই হম হয়। উসসে এক জ্যোত নিকলতা হয় জো ন দিন ন রাত—উসসে মিল যানেকা নাম হুয়া লয় তবহি শরীরসে বুদা হোতা হয়—আউর যো কুছ ইরাদা করে সো কর সক্তা হয়—দশ রোজ রাতদিন একাগ্রচিত্ত বিনা খাএ পিএ সোএ প্রেমলগাওএ তব ইহ বাত সিদ্ধ হোয় বিনা সব আশা ছোড়নেসে ইহ বাত কএসে হোগা—আগে মর্জি মালিক কি।" ॥ ৭১ ॥

এই আত্মসূর্য সম্বন্ধে যোগিরাজের বহুভাবে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও জ্ঞান হয়েছিল, তাই তিনি নানাভাবে গোপন দিনলিপিতে লিখে রেখে গেছেন। এই আত্মসূর্যই যে সবকিছুর মূল বা আদি কারণ এমনকি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিস্থল তা তিনি নানাভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তা তিনি লিখে রেখে গেছেন। এই আত্মসূর্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি কখনো বলেছেন—'জো কিষ্ণ সোই সূর্য্য সোই পানি।' যিনি কৃষ্ণ তিনিই আত্মসূর্য তিনিই আবার সবকিছুর কারণবারি। আবার বলেছেন—'বারেবারে সূর্য্যকে দেখতে ইচ্ছা করে। জো হম সোই সূর্য্যকা জ্যোতি।' এই আত্মসূর্যকে যতই দেখি ততই আরো দেখতে ইচ্ছা করে। এখন বুঝতে পারলাম যে ওই আত্মসূর্য্যের জ্যোতি এবং আমি একই, কোনো প্রভেদ নেই। 'জগৎ কে সার সূর্য্য হয় ওহি রূপ তুমারা হয়, আপনরূপ আসল।' এই জগতের সার বস্তু অর্থাৎ মূল বা আদিকারণ ওই আত্মসূর্য। কারণ সবকিছুই ওই আত্মসূর্য হতে উৎপন্ন, তাই ওই আত্মসূর্যই তোমার আমার এ জগতের সকলের রূপ। এই আপন রূপটাই আসল। অতএব এই যে আত্মসূর্য দেখছি ইনিই আদিপুরুষ হয়ে গেলেন, আবার ইনিই ব্রহ্মের লম্বা লিঙ্গরূপ হলেন। তাই ওই আত্মসূর্য, আদিপুরুষ, লিঙ্গরূপ এবং আমি এসবই এক অভিন্ন। এই লিঙ্গরূপ সম্বন্ধে তিনি আরো বলেছেন—'চন্দ্র সূর্য্য জ্যোতি দোনো তরফ দেখা—বিশ্বনাথকা লিঙ্গ সুষুম্নারূপ বিচমে দেখা—তন্ত্রপ্রমাণং—যোনি ব্রহ্ম হৃদাকারং অন্তরাত্মনি চিন্তয়েৎ।' কূটস্থের মধ্যে দুইপাশে চন্দ্র ও সূর্যের জ্যোতি দেখলাম, তার মাঝে সুষুম্নারূপ বিশ্বনাথের লিঙ্গ দেখলাম। এ বিষয়ে তন্ত্রে প্রমাণ আছে যে ওই লিঙ্গই ব্রহ্মযোনি অর্থাৎ সবকিছুর উৎপত্তিস্থল যা অন্তর্মুখী ধ্যানে লাভ করা যায়। কিন্তু যোগী যখন মহাশূন্যে উপনীত হন তখন সবই শূন্যময় হওয়ায় বিশ্বনাথের লিঙ্গও থাকে না। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন—'জ্যোতিরূপ লাল ডোরা সুষুম্নাকো কিনারে মেহিন দেখা—পহলে জ্যোতির্ময় লিঙ্গ দেখা ফির শূন্যমে সমায় গয়া।'

সুষুম্নার ধারে লাল ডোরাকাটা মিহি জ্যোতিরূপ দেখলাম। ঠিক এর পূর্বে জ্যোতির্ময় লিঙ্গ দেখলাম, কিন্তু সেই লিঙ্গ শূন্যের ভেতর যে মহাশূন্য তাতে মিলে গেল। এই জ্যোতির্ময় লিঙ্গ যখন আরো ঘনীভূত হয় তখন তিনিই মহাদেব। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন—'জ্যোতির্ময় শ্বেতবর্ণ মহাদেবের রূপ দেখা, বড়া আনন্দ হুয়া।' ওই চন্দ্র সূর্যের মধ্যে জ্যোতির্ময় শ্বেতবর্ণ মহাদেবকে দেখলাম এবং বড়ই আনন্দ হোলো। এই মহাদেব কাশীতে থাকেন, তাঁর হাতে ত্রিশূল। অতএব কাশী, মহাদেব এবং ত্রিশূল এগুলি কি? এ বিষয়ে যোগিরাজ তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শন ও জ্ঞানের দ্বারা পরিষ্কার করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—'কাশী মহাদেবকে ত্রিশূলকে উপর হেয়, কাশী যানে প্রকাশ মহাদেব যানে সুষুম্না ইড়া পিঙ্গলা যানে ত্রিগুণ।' কাশী কোনো বিশেষ স্থানকে বোঝায় না, কাশী হোলো যোগীর সাধন উপলব্ধ এক বিশেষ অবস্থা। সেই কাশী মহাদেবের ত্রিশূলের ওপর অবস্থিত। ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন গুণই হোলো ত্রিশূল। এই তিন গুণ কূটস্থে মিলিত হয়েছে, তাই এই কূটস্থই কাশী। এই আন্তর কাশীর প্রতীক স্বরূপ যে বাহ্য কাশী সেখানেও দেখা যায় বরুণা অসি এবং গঙ্গার মিলনস্থল। এই আন্তর কাশীতে না পৌঁছানো পর্যন্ত জ্যোতির্ময় মহাদেব বা জ্যোতির্ময় বিশ্বনাথের লিঙ্গ দর্শন সম্ভব নয় অর্থাৎ যোগী যখন কূটস্থে অবস্থান করেন তখন তাঁর বিশ্বনাথ দর্শন আপনাহতেই হয়। এই আত্মসূর্যরূপ আত্মজ্যোতিই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, তাই তিনি বিশ্বনাথ। আবার শাস্ত্রকার বলেছেন এই হর-পার্বতী কৈলাস পর্বত শিখরে অবস্থান করেন। এ বিষয়ে যোগিরাজ তাঁর প্রত্যক্ষ উপলব্ধির কথা লিখেছেন—'শিবকে আধে উপর কৈলাশ পাহাড় যানে স হদল পদ্ম জিসমে হর পার্বতী বিরাজমান দূর সে দেখা যায়।' মাথার অর্ধেক ওপরে কৈলাস পর্বত অর্থাৎ সহস্রদল পদ্মই কৈলাস। এই সহস্রদল পদ্ম মধ্যে হর-পার্বতী বিরাজমান দূর হতে দেখা যায়। পর্বত হোলো সর্বোচ্চ জায়গা, শরীরের মধ্যে সর্বোচ্চ পবিত্র স্থান হোলো সহস্রার। যোগী যখন কূটস্থে অবস্থান করে সহস্রারের দিকে দৃষ্টি দেন তখন তিনি হর-পার্বতীকে দেখতে পান। অতএব কৈলাস কোনো বাহ্য স্থানকে বোঝায় না, কৈলাস হোলো যোগীর একটা অবস্থা মাত্র। এরই প্রতীক স্বরূপ হিমালয়ের মধ্যে তীব্বতের অন্তর্গত কৈলাস পর্বতকে দেখানো হয়েছে। এই প্রতীক কৈলাস পর্বত বরফাচ্ছন্ন হওয়ায় সাদা দেখায়। যোগিরাজও বলেছেন 'জ্যোতির্ময় শ্বেতবর্ণ মহাদেবের রূপ দেখা।' বাহ্য কৈলাসে যেতে গেলে অনেক শ্রম স্বীকার করতে হয়। আন্তর কৈলাসে যেতে গেলেও দীর্ঘসাধন প্রয়োজন। আন্তর মহাদেব জ্যোতির্ময়, শ্বেতবর্ণ এবং দীর্ঘসাধন সাপেক্ষ। এই কৈলাসের সঙ্গে যতটা সম্ভব মিল রেখে ঋষিরা বাহ্য কৈলাস এবং বাহ্য কাশীর প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

তাঁদের উদ্দেশ্য হোলো সাধারণ মানুষ এই সব প্রতীকগুলি অবলম্বন করতে করতে ক্রমে অন্তরকাশী এবং অন্তরকৈলাসে একদিন নিশ্চয়ই পৌঁছে যাবে। এই প্রকারে অন্তরসাধনার দিকে সকল মানুষকে টেনে নেওয়াই একমাত্র ঋষিদের উদ্দেশ্য। তাঁরা জানতেন বাহ্য কাশী এবং বাহ্য কৈলাস দর্শনে মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়। কিন্তু সকল মানুষ আত্মসাধন জানে না, পেতেও চায় না, আগ্রহও নেই। তাই এই সব প্রতীকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে আত্মসাধনের দিকে আকৃষ্ট করতে নানা উপায় অবলম্বন করেছেন। তাই ঋষিদের বলা হয় সত্যকার মানবদরদী, মানুষের কল্যাণকামী। এ বিষয়ে কাশীখণ্ড বলেছেন তপস্বী অলকাপতি উদীয়মান সহস্র সূর্য অপেক্ষা অধিক দীপ্তিশালী তপোধন বিশ্বনাথকে দেখতে পেলেন। তখন বিশ্বনাথ তাঁকে বর দিতে চাইলে অলকাপতি বললেন যাতে আপনার শ্রীচরণ দর্শনে সমর্থ হই সেই প্রকার দৃষ্টি-সামর্থ প্রদান করুন। উমাপতি সেই দৃষ্টি-সামর্থ প্রদান করলে অলকাপতি প্রথমেই উমাকে দর্শন করলেন। এখানে যোগিরাজেরও ঠিক একই অবস্থা। এই অলকাপতিই কুবের নামে খ্যাত। কুবের অর্থে ধনাধিপতি অর্থাৎ যিনি সকল ধনের অধিকারী। এই জ্যোতির্ময় মহাদেব দর্শন যাঁর হয় অর্থাৎ সহস্র সূর্য সম মহান্ আত্মজ্যোতি দর্শনে যে যোগী তন্ময় হয়ে যান তিনি সকল ঐশ্বর্যের মালিক হন, তাই তিনিই কুবের হন। এখানে যোগিরাজও কুবের হয়ে গেছেন। যোগিরাজ বলছেন ব্রহ্মের সেই জ্যোতির্ময় লিঙ্গরূপ হতে এমন এক অপূর্ব জ্যোতি বেরিয়ে আসছে যেখানে দিনও নেই রাতও নেই স্বয়ং প্রকাশ। ওই জ্যোতির্ময় অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়ার নাম লয়। এই প্রকার লয় যখন হোলো অর্থাৎ নিজেকে যখন সেই মহান্ জ্যোতির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে জ্যোতিই হয়ে গেলাম তখন শরীর নিস্পন্দ হয়ে গেল। এই অবস্থায় যা কিছু ইচ্ছা করি সবই করতে পারি, কারণ এখন আমার অনন্ত শক্তি এবং এখন আমি কুবের অর্থাৎ অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী। দশদিন দশরাত কোনো কিছু খাদ্য গ্রহণ না করে, কোনো কিছু পান না করে, না শুয়ে একাগ্রচিত্ত হয়ে একাসনে আত্মকর্ম করলে তবেই এই অবস্থা সিদ্ধ হয়; কিন্তু সকল প্রকার আশা ত্যাগ না করা পর্যন্ত কেমন করে হবে? মনের তরঙ্গ হতেই আশার উৎপত্তি, সেই তরঙ্গ যতক্ষণ থাকবে আশাও থাকবে। তাই দীর্ঘ আত্মকর্ম করতে করতে যখন সকল প্রকার তরঙ্গ চলে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে স্থির হবে তখন আশা থাকবে না। এই অবস্থা প্রাপ্ত হলে আপনা হতেই সবকিছু সিদ্ধ হয়, স্থায়ী স্থিতি অবস্থা লাভ হয়। অলকাপতি যেমন শ্রীচরণ দর্শনের সামর্থ প্রার্থনা করে মালিকের ওপর নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, যোগিরাজও তেমনি মালিকের ওপর নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে, তাঁর শরণাগতি হয়ে বলেছেন—এবার সামনে যে কঠিন সাধন অর্থাৎ সাধনার যে কঠিন স্তর দেখছি

অর্থাৎ ওই মহান্ আত্মজ্যোতির মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়া যে অত্যন্ত কঠিন সাধন তাতে মালিকের যা ইচ্ছা তাই হোক কারণ ওই নির্মল ব্রহ্মই মালিক।

"পিছে মেরাদণ্ডমে শ্বাসা মজেসে চলনে লগা—আব ঘরমে আএ—আব বড়া আনন্দ—মুর্দা জিতা হয় জবতওমে লয় হোয়—জিসকা কি ব্রহ্মময় দৃষ্টি হয় উনকে ইচ্ছা করনেকে পহিলে মনোকামনা সিদ্ধ হোয়—অব স্থির হোনেকা লক্ষণ পক আয়া হয়" ॥ ৭২ ॥

অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করতে করতে যখন ইড়া পিঙ্গলার বহির্গতী থেমে গেল তখন পেছনে মেরুদণ্ডের মধ্যে অর্থাৎ সুষুম্নায় শ্বাস সহজেই চলতে লাগল, এখন স্থির ঘরে এলাম এবং এই অবস্থায় বড়ই আনন্দ। ইড়া পিঙ্গলার গতি থেমে গেলে তম এবং রজ গুণকে অতিক্রম করা যায়। তাই এই দুই গুণকে অতিক্রম করে যখন সুষুম্নায় পৌঁছে গেলাম তখন বড়ই আনন্দ হোলো। জীব যতক্ষণ ইড়া পিঙ্গলায় থাকে ততক্ষণ তার পক্ষে এই আনন্দ পাওয়া অসম্ভব। এরপর যখন সুষুম্নাকেও অতিক্রম করে গেলাম অর্থাৎ যখন আর সুষুম্নাতেও গতি থাকলো না তখন সম্পূর্ণরূপে স্থিরত্বলাভ করায় সবকিছু লয় হয়ে গেল, তখন আর দেহবোধ থাকলো না, দেহাভ্যন্তরস্থ সকল প্রকার তরঙ্গ চলে যাওয়ায় যে দেহবোধহীন অবস্থা তার জয় হোলো অর্থাৎ এই প্রকার দেহাতীত অবস্থায় দীর্ঘ সময় থাকার মত পাকাপাকি অভ্যাস অর্জন হলো। এই অবস্থাকেই বলে শব সাধন। এই দেহকেই মৃতদেহে পরিণত করে, মৃতবৎ স্থির করে তার ভেতরে স্থিরভাবে অবস্থান করা, এটাই প্রকৃত শব সাধন। কোনো মৃত দেহকে টেনে নিয়ে তার ওপর বসে সাধন করলেই শবসাধন করা হয় না। এই প্রকার দেহবোধহীন অবস্থাপন্ন যে যোগী অর্থাৎ যাঁর ভেতরে সমস্ত প্রকার তরঙ্গ বা গতি থেমে গিয়ে অগতি অবস্থা লাভ হয় তেমন যোগীর সর্বদা ব্রহ্মময় দৃষ্টি হয়, তিনি তখন সবকিছুতেই ব্রহ্ম দেখেন। যোগিরাজ তাঁর এই অবস্থার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—'এয়সা ছায়া পুরুষ ঘটমে ঘট্ দেখা।' ছায়াপুরুষ অর্থাৎ উত্তমপুরুষ, তিনিই পুরুষোত্তম নারায়ণ, তিনিই পুরাণ পুরুষ বা আদিপুরুষ—তিনি 'সকল ঘটে অর্থাৎ সকল দেহে বর্তমান থাকেন। যোগিগণ এই পুরুষকে সকল ঘটে, সর্ববস্তুতে অপলক দৃষ্টিতে দেখেন। এই প্রকার ব্রহ্মময় দৃষ্টিসম্পন্ন যোগীর আর কোনো ইচ্ছা থাকে না। এখন তাঁর যে ইচ্ছা সেটাকে বলা হয় অনিচ্ছার ইচ্ছা। এই প্রকার অনিচ্ছার ইচ্ছায় কোনো কিছু করবার পূর্বেই তাঁর সেই মনোবাসনা আপনাহতেই

পূর্ণ হয়। যোগিরাজ এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে বলেছেন—এখন এই প্রকার স্থির অবস্থার লক্ষণ পাকাপাকি হোলো অর্থাৎ এখন থেকে এই স্থির ঘরে সব সময়ের জন্য থাকার মতো অবস্থা লাভ হলো। যোগীর এ এক উত্তুঙ্গ অবস্থা। এই অবস্থাকেই বলা হয় ক্রিয়ার পরাবস্থা। কর্ম ইচ্ছা প্রবৃত্তি ইত্যাদি এগুলি সবই প্রাণের গতিময় অবস্থা হতে জাত। প্রাণের গতি থাকলেই জন্ম হয়। ক্রিয়ার পরাবস্থায় না থাকায় মনে ইচ্ছা উৎপন্ন হয় এবং ওই ইচ্ছানুসারে নানান কর্ম হয় এবং সেই কর্মের ফলভোগের জন্য জন্ম হয়। এ কারণে ক্রিয়ার পরাবস্থায় না থাকাটাই দোষ। ক্রিয়ার পরাবস্থায় আটকে থাকলে ইচ্ছা থাকে না, ইচ্ছা না থাকলে কর্ম থাকে না এবং কর্ম না থাকলে ফল বা প্রবৃত্তি থাকে না, অতএব জন্ম হয় না, কারণ তখন অগতি অবস্থা। অতএব জন্ম-মৃত্যু রোধ করতে হলে অর্থাৎ অগতি অবস্থা লাভ করতে হলে বৃথা সময় নষ্ট না করে ক্রিয়া-যোগ সাধন করা উচিত।

"অগম পন্থমে পগ ধরা। ওহা ন মালুম স্বাসা আতা হয় ন মালুম জাতা হয় সংগ সবকা ছোড়ে। আউর ধ্বনিমুনে রাধাজিকা দর্শন ভয়া। অব অনমোল ধন মিলা" ॥ ৭৩ ॥

যেখানে যাওয়া যায় না সেই অগম্যস্থানে অর্থাৎ স্থির ঘরে পাকাপাকি স্থিতি হোলো। এ অবস্থায় শ্বাস বাইরের দিকে আসছে কি ভেতর দিকে যাচ্ছে কিছুই বোঝা যায় না। তখন 'কেবল-কুম্ভক' প্রাপ্ত হওয়ায় ইন্দ্রিয়সঙ্গ সহ সকল প্রকার গুণসঙ্গবিবর্জিত হলাম। এ অবস্থায় সহস্রার থেকে নেমে আসা যে Sound current অর্থাৎ নামধ্বনি তাতে রাধাজির দর্শন হোলো। এবার অমূল্য ধন পেলাম।

অগম্যস্থান অর্থাৎ যেখানে সাধারণ মানুষের যাবার কোন উপায় নেই, একমাত্র যোগিগণই সেখানে যেতে পারেন। অগম্যস্থান হোলো যুক্ততম স্থান, যেখানে পৌঁছে গেলে সকল প্রকার গমনাগমন রহিত হয়। চঞ্চল অবস্থাতেই যতকিছু গমনাগমন, জানাজানি, দেখাদেখি বর্তমান থাকে। কিন্তু ব্রহ্ম সদানিশ্চল। যোগী যখন আত্মকর্মের দ্বারা নিজ চঞ্চল প্রাণকে সম্পূর্ণরূপে স্থির করে নিশ্চল ব্রহ্মের সঙ্গে মিশে যান, তখন আর কোনো প্রকার চঞ্চলতা না থাকায় আর গমনাগমন থাকে না। তাই এই অবস্থাকে বলা হয় অগম্যস্থান। যোগিরাজ এখন এই প্রকার অগম্যস্থানে অর্থাৎ স্থির ব্রহ্মে পৌঁছে, যাকে ক্রিয়ার পরাবস্থা বা কর্মের অতীতাবস্থা বলা হয়, সেই অবস্থায় পৌঁছে বলছেন যে এই অবস্থায় দীর্ঘ সময় আটকে থাকার মতো অবস্থা লাভ

করলাম। এই প্রকার স্থিরাবস্থায় বা ক্রিয়ার পরাবস্থায় সর্বক্ষণের জন্য আটকে থাকাই যোগীর কাম্য। যোগী চেষ্টা করেন এই অবস্থা থেকে যেন কখনো বিচ্যুত হতে না হয়। এই অবস্থাটাকেই যুক্ততম অবস্থা বলে। চঞ্চল প্রাণ সম্পূর্ণরূপে থেমে গিয়ে স্থির প্রাণে আটকে থাকা, এটাই যুক্ততম অবস্থা। এই প্রকার স্থিরাবস্থায় সর্বদার জন্য আটকে থেকে যোগিরাজ বলছেন এখন শ্বাসের গতি বাইরের দিকে আসছে কি ভেতর দিকে যাচ্ছে কিছুই বোঝা যায় না। কারণ বুঝতে গেলে, জানতে গেলে যে মনের থাকা প্রয়োজন তা আর নেই। শ্বাসের আগম নিগম গতি, মন, বুদ্ধি সবকিছু থেমে গিয়ে এমন এক নিশ্চল গম্ভীর মহাশূন্য অবস্থা হোলো যার কথা কিছুই বলা যায় না। যখন সবকিছু থেমে গেল তখন আর ইন্দ্রিয় ও রিপুগণ কোথায়? ইন্দ্রিয়গণের ধর্মই হোলো পরধর্ম। জীব এই পরধর্মগুলিকেই স্বধর্ম বলে মনে করে। এই সব পরধর্মের সঙ্গে থাকাকেই সঙ্গ করা বলে, কারণ জীব সবদাই ইন্দ্রিয় সঙ্গে থাকে। সেই জীবই যখন ক্রিয়ার পরাবস্থায় উপনীত হয় তখন আর ইন্দ্রিয়সঙ্গ থাকে না। এই ইন্দ্রিয়সঙ্গহীন অবস্থাকেই গুণসঙ্গবিবর্জিত অবস্থা বলে। তখন তাঁর কাছে আর কেউ না থাকায় নিঃসঙ্গ হন, একা হন। তাই যোগিরাজ বলেছেন এখন তিনি সব সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে নিঃসঙ্গ হলেন। এই প্রকার নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাধাজির দর্শন হোলো। রা অর্থে বিশ্ব, ধা অর্থে ধারণ করা। যিনি এই জগৎব্রহ্মাণ্ডকে এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ এই দেহকে অর্থাৎ সবকিছুকে ধারণ করে আছেন তিনিই রাধা। শাস্ত্র বলেছেন— 'প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ'। এই ত্রিভুবন প্রাণরূপী রাধাই ধারণ করে আছেন। প্রাণের চঞ্চল অবস্থার শেষ এবং স্থিরাবস্থার উদয়, এই যে প্রান্তসীমা, এই অবস্থায় যোগী যখন উপনীত হন তখন তাঁর এই রাধাজির দর্শন আপনাহতেই হয়। এ অবস্থাকে অমূল্যধন বলে। এই অমূল্যধন এখন তিনি লাভ করেছেন। এই প্রকারে নানান দেবদেবী দর্শন সম্বন্ধে যোগিরাজ বলেছেন—'যেমত কোন ঘরের মধ্যে সূর্য্যের আলো যায় এবং দরজা বন্ধ থাকে বাইরে যদি পাখি উড়িয়া যায় তাহার ছাযা দেওয়ালেতে দেখা যায় তদ্রূপ মনে প্রকাশ হইলে দেবতাদি যাহারা আছেন তাঁহার দিগের দর্শন হয়। যেমন ঘরের দরজা বন্ধ অথচ কোনো একটা ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে সূর্যের আলো যায়, সে সময় ওই ফাঁক বরাবর বাইরে যদি পাখি উড়ে যায় তবে তার ছায়া ঘরের মধ্যে দেয়ালে দেখা যায়। সেরকম ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা যে চঞ্চল মন, প্রাণকর্মের দ্বারা তাকে গুটিয়ে এনে কূটস্থরূপী গহ্বরে কেন্দ্রীভূত করতে পারলে সমস্ত দেব-দেবীর দর্শন হয়। এ বিষয়ে তিনি আরো বলেছেন—'উজিয়ালে মে শূক্ষবস্তুকা দর্শন হোতা হয়, অন্ধিয়ালে মে নহি—জয়সে সূর্য্যকে জ্যোত মে কোই ঘরকে ভিতর ছেদ হোকে আয় তো যো

ধুল সব উড়তা হয় এক এক করকে সব দেখাতা হয়, লেকন ছাএ মে কুছ নহি—ব্রহ্ম সূক্ষ্মাত্মসূক্ষ্ম হয়, ইস লি এ প্রথম জ্যোত মে দেখলাতা হয়—ফির জব অন্ধকারকে আঁখ হোতা হয় তব অন্ধকার সব চিহ্ন দেখনে মে আতা হয—য়ানে বিজ্ঞান পদ'। আলো অবস্থায় সূক্ষ্ম বস্তুকে দেখা যায়, অন্ধকারে দেখা যায় না। যখন সূর্যের আলো গবাক্ষ পথে ঘরের ভেতর প্রবেশ করে তখন ঘরের মধ্যে যে সব ধূলিকনা উড়তে থাকে তা একে একে দেখা যায়, কিন্তু ছায়াতে দেখা যায় না। ব্রহ্ম সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম, তাই কূটস্থে যে প্রথম মহান্ আত্মজ্যোতি সেই জ্যোতির মধ্যে সূক্ষ্ম ব্রহ্মকে অণুস্বরূপে দেখা যায়। কিন্তু যখন আত্মজ্যোতি নেই, আলোহীন অথচ স্বয়ং প্রকাশ, ঠিক যেন ভোরের আকাশের মতো তখন সবকিছু দেখা যায়। তখন সকল দেবতা, ব্রহ্ম এবং এ দুনিয়ার সবকিছু দেখা যায়। এই অবস্থাকেই বিজ্ঞানপদ বলে। বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান। তখন যোগীর কাছে সবকিছু স্বচ্ছ, নির্মল, বাধাহীন ও আবরণহীন হয়।

"কালী সোচ সোচ কালী হুয়া অব কালীকা বাবা হোনা
হয় বাবা য়ানে ব্রহ্ম অর্থাৎ যো সূন্যকে ভিতর সূন্য হয়—
এই সব সূর্গ্যকো দেখনেমে মিলতা হয়।" ॥ ৭৪ ॥

যোগী যখন দীর্ঘ প্রাণকর্মের পর কূটস্থে অবস্থান করেন তখন তাঁর এই দুই চোখ আধাবোজা অবস্থায় থাকে, ঢুলু ঢুলু অবস্থায় থাকে ; তখন তিনি এই দুই চোখের মাধ্যমে কিছুই দেখেন না, যা কিছু দেখেন কূটস্থ অর্থাৎ তৃতীয় চোখের মাধ্যমে। এই তৃতীয় চোখকেই জ্ঞানচোখ বলে। এই দুই চোখের মাধ্যমে স্থূল বস্তু দেখা যায়, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম বস্তু দেখা যায় না। কিন্তু কূটস্থরূপী তৃতীয় চোখের মাধ্যমে যখন সকল প্রকার সূক্ষ্মতম বস্তু দর্শন হয়, যখন আত্মজ্যোতি দর্শন হয়, তখন সকল সৃষ্টির মূল রহস্যকে জানা যায়। এ অবস্থায় যোগীর দূরশ্রবণ, দূরদর্শন, দূরজ্ঞান ইত্যাদি আপনাহতেই হয়। তখন অপর মানুষের মধ্যে যে চিন্তাতরঙ্গ তাও তিনি প্রত্যক্ষ করেন। এ অবস্থায় যোগীর কিছুই অজানা থাকে না। এ অবস্থায় যোগী সূক্ষ্মে অবস্থান করায় যে আত্মজ্যোতি দেখতে থাকেন এবং সেই আত্মজ্যোতিতে তন্ময় থাকেন তখন সকল গুণ ও কর্মের অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবী আপনাহতেই দর্শন হয়। এবং এই সব নানান দেব-দেবী যতই দর্শন হতে থাকে ততই যোগী তন্ময় প্রাপ্ত হয়ে সেই সব দেব-দেবীর সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। পরিশেষে যোগী নিজেই সেইসব দেব-

দেবীতে রূপান্তরিত হন, যেমন কাঁচপোকার (কুমর্ পোকা) ভয়ে আরশোলা কাঁচপোকায় পরিণত হয়। এক্ষেত্রে যদিও আরশোলার মধ্যে ভয়রূপ প্রবাহ প্রবল বেগে কর্ম করে, তাই এই পরিবর্তন সাধিত হয়। ভয় হোলো ইন্দ্রিয়কর্ম। সামান্য ইন্দ্রিয়কর্মেতেই এতখানি পরিবর্তন দেখা যায়। যোগী বলেন এই পরিবর্তনের মধ্যে কর্মপ্রবাহ বর্তমান থাকে, কিন্তু যোগী যখন আত্মজ্যোতি দর্শনে বা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম দেব-দেবী দর্শনে তন্ময় থাকেন তখন ভয় বা কোনো প্রকার ইন্দ্রিয়কর্ম না থাকায় কোনো প্রকার কর্ম থাকে না। এই প্রকার নৈষ্কর্ম অবস্থায় ইন্দ্রিয়সঙ্গ বর্জিত হওয়ায় একমাত্র আনন্দই বর্তমান থাকে। তখন যোগী আনন্দের সঙ্গে সেই দেব-দেবীর সহিত নিজেকে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেন এবং পরিশেষে আরো গভীর তন্ময়তায় নিজেই সেই দেব-দেবীতে রূপান্তরিত হন। এ অবস্থায় যেটাকে যোগীর চেষ্টা বলা হয়েছে সেই চেষ্টা কিন্তু কর্মপদবাচ্য নয়। সাধারণতঃ চেষ্টাটাকেও কর্ম বলা হয়, কিন্তু এ অবস্থায় যোগী নৈষ্কর্ম হওয়ায় এক অনিচ্ছার ইচ্ছা বর্তমান থাকে, যাকে কর্ম বলা যায় না। তাই যোগিরাজ বলেছেন—'এককে আঁখ উঠা বিমারি দেখনে সে বহুত দের তক জয়সা উস্কা ছুযা ছুত সে উসকোভি আঁখ আতা হয় ওয়সা কূটস্থ অক্ষরকো দেখনেসেভি ওহি রূপ হো জাতা হয়—ইসমে সন্দেহ নহি'। যেমন কোনো এক ব্যক্তির চোখ উঠলে (এক প্রকার চোখের ছোঁয়াচে রোগ) অন্য কেউ যদি তার সেই চোখের দিকে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থাকে এবং ছোঁয়াছুঁয়ি হয় তাহলে তারও চোখ ওঠে অর্থাৎ তারও চোখে ওই অসুখ হয়, তেমনি প্রতিদিন ক্রিয়া করে বারবার কূটস্থ-অক্ষর দেখতে থাকলে এবং এই প্রকারে দীর্ঘ সময় কূটস্থে অবস্থান করলে নিজেও কূটস্থের রূপ হয়ে যায় অর্থাৎ নিজেই কূটস্থে রূপান্তরিত হয়—এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। একারণে যোগিরাজ বলছেন যে তিনি যখন এই প্রকার নৈষ্কর্ম অবস্থায় পৌঁছে গেলেন এবং কূটস্থে স্থায়ীভাবে অবস্থান করলেন, যখন এই দুই চোখ আর কোনো বস্তু দেখছে না, কেবল অনিচ্ছার ইচ্ছায় আপনাহতেই সবকিছু হচ্ছে, তখন তিনি নিজেই কালীতে রূপান্তরিত হলেন। এ অবস্থায় তিনি আপনাহতেই কালী হলেন বটে কিন্তু কালীর বাবা অর্থাৎ কালীর উৎসস্থল যে ব্রহ্ম তা তিনি এখনও হতে পারেননি। কালী সহ সকল দেব-দেবীর উৎসস্থল যে অনন্ত গম্ভীর নিশ্চল ব্রহ্ম তা তাঁকে হতে হবে অর্থাৎ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চল করে সেই স্থির ব্রহ্মে মিলে যেতে হবে। এই শূন্যের ভেতরে যে শূন্য অর্থাৎ যে মহাশূন্যের অস্তিত্বে এই শূন্যের অস্তিত্ব, সেই স্থির মহাশূন্যই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম হতে কোটী সূর্যসম যে আত্মসূর্য তাহা এ জগতের আধার স্থল, কারণ সেই আত্মসূর্য হতেই এ জগতের উৎপত্তি। তাই এ জগতের সকল বস্তুর মধ্যে এক জ্যোতি বিদ্যমান থাকে। সেই

আত্মসূর্য যখন দর্শন হয় এবং তাতে যখন তন্ময় হওয়া যায় তখনই প্রকৃতপক্ষে এই রহস্যকে জানা যায় অর্থাৎ সকল সৃষ্টিরহস্য আপনাহতেই তখন যোগীর কাছে প্রকাশ হয়। এই অবস্থাপন্ন যোগীকেই জ্ঞানী বলা হয় কারণ সকল জ্ঞান তখন তাঁর করতলগত হয়, তাঁর আর কিছু অজানা থাকে না। তিনি তখন এই দুই চোখে না থেকে সদাই কূটস্থে থাকেন।

শাস্ত্র বলেছেন—ধর্মস্য তত্ত্ব নিহিতং গুহায়াম। ধর্মতত্ত্ব গুহার মধ্যে নিহিত আছে। কূটস্থই সেই গুহা। যোগী যখন কূটস্থে স্থিতিলাভ করেন তখন তিনি প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব বা অধ্যাত্মজগৎকে জানতে পারেন। যোগিরাজেরও এখন এই অবস্থা। অতএব যোগী ব্যতীত প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব বা অধ্যাত্মজগতের গুঢ় রহস্য সম্পূর্ণরূপে আর কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

———

"ব্রহ্মই অসল হয়—সূর্য্যরূপ হয় ফির উহ রূপ নহি হয় কেবল ব্রহ্ম—অব এক জগই বইঠকা এরাদা করে—সাহস করকে জো করে সো হোয় এয়সা মালুম হোতা হয়—স্ত্রিমাতারি পুরুষরূপ লড়কি মাকারূপ লড়কা বাপকারূপ —বাপমাতারি সব জাতা হয়—আপনা সব দোনো রূপ রুখ জাতা হয়—পুরুষ প্রকৃতি ছোড়ায় আউর কুছ নহি ইহ অনাদি বনা হয়—উসকা বহুত রূপ হয় ইসলিএ উহ অনন্ত রূপ হয়—লেকন একহী রূপকা সকল পসারা হয়" ॥ ৭৫ ॥

ব্রহ্মই আসল, আদি বা সবকিছুর মূল কারণ। সেই ব্রহ্মই আত্মসূর্যরূপী হলেন আবার ঐ আত্মসূর্যের রূপও থাকলো না, মহাশূন্যে মিলে গিয়ে কেবল স্থির ব্রহ্মই অবশিষ্ট রইলেন। আত্মসূর্যের রূপও রূপ, কিন্তু নিশ্চল ব্রহ্মের কোন রূপ নেই যখন এই অবস্থায় উপনীত হলাম তখন আর আমার কোন কর্ম থাকল না, তাই এ অবস্থায় একাসনে চুপচাপ বসে থাকতে ইচ্ছা করছে। যদিও এ অবস্থায় কোন ইচ্ছা থাকে না, কারণ চঞ্চল মন না থাকায় ইচ্ছা থাকা সম্ভব নয়, সব কিছুই থেমে গেছে অতএব এখন যাকে ইচ্ছা বলছি প্রকৃতপক্ষে তা কিন্তু ইচ্ছা নয়, এটা হোল অনিচ্ছার ইচ্ছা। যখন এই প্রকার অনিচ্ছার ইচ্ছায় অবস্থান করে চুপচাপ বসে আছি তখন বুঝলাম যে এই অবস্থায় সাহস করে যা কিছু করব তাই হবে। এ অবস্থায় যেহেতু কোন কর্ম নেই, চঞ্চলতার অবসানে সমস্ত প্রকার কর্ম সঙ্কুচিত হয়ে বীজাকারে

স্থিরত্বের সঙ্গে মিশে গেছে, তাই এ অবস্থায় বাহ্যভাবে কোন কর্ম না করলেও আপনা হতে সমস্ত কর্ম সাধিত হয়। এ অবস্থায় আর কোন চেষ্টা থাকে না, অতএব কর্ম থাকে না, যা কিছু হয় আপনা থেকেই হয়। এই প্রকার অনিচ্ছায় ইচ্ছায় বুঝতে পারলাম যে স্ত্রী-মাতা পুরুষরূপ হলেন, কন্যা মায়ের রূপ এবং পুত্র পিতার রূপ হলেন। কারণ আজ যিনি স্ত্রী কাল তিনি মাতা, আজ যিনি কন্যা কাল তিনি মাতা এবং আজ যিনি পুত্র কাল তিনি পিতা এই প্রকার পরিবর্তন কাল বিবর্তনে জাগতিক ভাবেও দেখা যায়। অধ্যাত্মভাবে সূক্ষ্ম করেও এই প্রকার যে পরিবর্তন হয় তার রহস্য পুরোপুরি বুঝতে পারলাম। জাগতিকভাবে এইভাবে যে পরিবর্তন হয় তা দেহের পরিবর্তন, কিন্তু অধ্যাত্মভাবে যে পরিবর্তন হয় তা আত্মিক পরিবর্তন। সব দেহে একই আত্মা বিরাজমান। কাজেই একই আত্মা কখনও স্ত্রী কখনও মাতা, কখনও কন্যা কখনও মাতা, কখনও পুত্র কখনও পিতা; অতএব সবার ভেতর একই মূল আত্মসত্তা অধিষ্ঠিত, এই গুহ্যরহস্য পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলাম। আরও বুঝলাম যে সকলেরই উৎপত্তিস্থল যেহেতু সেই স্থির ব্রহ্ম অতএব সকলকেই ঘুরে ফিরে সেখানেই মিশে যেতে হবে। তাই দেখলাম মাতা পিতা পুত্র কন্যা সহ সকলেই সেই মহাশূন্যে মিশে গেলেন, এমন কি এই অবস্থায় আসার আগে নিজেকে যে স্বতন্ত্র বলে জানতাম, এক আলাদা সত্তারূপে দেখতাম তাও স্তব্ধ হয়ে একাকার হয়ে গেল। তখন পুরুষ-প্রকৃতি বলে আর আলাদা কিছু থাকল না, সেই পুরুষ-প্রকৃতিই অনাদি। সেই অনাদি পুরুষই প্রকৃতির উৎসস্থল; পুরুষ ব্যতীত প্রকৃতি কোথায়? স্থির ব্রহ্মই পুরুষ, সেই পুরুষ চঞ্চল হলেই প্রকৃতি। আবার চঞ্চলতার অবসানে সবই পুরুষ অতএব অদ্বৈত। কিন্তু যখনই চঞ্চল তখনই দ্বৈত। সেই দ্বৈতই বহুরূপ ধারণ করেন, কারণ চঞ্চল হতেই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়। সেজন্য তাঁর অনন্তরূপ, কিন্তু ব্রহ্মের সেই স্থির স্বরূপ একরূপ হতে সব কিছু প্রসারিত বা বিস্তারিত দেখছি, কারণ সেই স্থিরত্বই সবকিছুর মূল বা আদি কারণ। তাই যতক্ষণ দুই থাকে ততক্ষণ দ্বন্দ্ব কিন্তু ব্রহ্ম অর্থাৎ স্থিরাবস্থা দ্বন্দ্বাতীত। সেই দ্বন্দ্বাতীত স্থির ব্রহ্ম চঞ্চলতা প্রাপ্ত হলেই দ্বৈত। এই চঞ্চলতা ক্রমান্বয়ে যতই বাড়তে থাকে ততই আরও অধিক উৎপন্ন হয়, এই প্রকারেই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। অতএব এখন পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে ঐ স্থির ব্রহ্ম হতেই সবকিছু বিস্তারিত আবার ঘুরে ফিরে সবকিছুর সেখানেই মিশে যাওয়া।

———

"আখ বন্দ করকে দেখা চিৎমে প্রাণবাউ হেয় আউর প্রাণবাউমে
চিৎ হেয় চিৎ ঠেকানে রাখেত কোভি না মরে" ॥ ৭৬ ॥

এই দুই চোখ বন্ধ করে যখন কূটস্থে স্থির ভাবে অবস্থান করলাম তখন কূটস্থে দেখতে পেলাম যে চেতনেই অর্থাৎ প্রাণের চঞ্চল অবস্থাতেই প্রাণবায়ু বর্তমান এবং ঐ প্রাণবায়ুতেই চেতন বর্তমান অর্থাৎ যা প্রাণবায়ু তাই চেতন এবং যা শ্বাস-প্রশ্বাস তাই প্রাণ। প্রাণ চঞ্চল হলেই প্রাণবায়ুরূপে প্রথমে সুষুম্নায় গতি হয় এবং ভূমিষ্ঠ হবার পর ইড়া পিঙ্গলায় গতি হয়। এই সমস্ত গতিই নির্ভর করে প্রাণের চঞ্চল অবস্থার ওপর। কিন্তু যখন প্রাণ স্থির তখন কোন গতি নেই অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না নেই। সুষুম্না না থাকায় মাতৃজঠর নেই, ইড়া-পিঙ্গলা না থাকায় জন্মমৃত্যু নেই। তাই যোগিরাজ বলছেন সেই চেতনকে অর্থাৎ প্রাণবায়ুকে বা প্রাণের চঞ্চল অবস্থাকে যদি ঠিক জায়গায় রাখা যায় তাহলে কেউ কখনও মরবে না অর্থাৎ চঞ্চল প্রাণকে প্রাণকর্মের দ্বারা স্থির করে যদি স্থিরাবস্থায় রাখা যায় তাহলে কেউ কখনও মরবে না। এখানে মৃত্যু বলতে দেহত্যাগ করাকে বোঝায় না। এখানে 'মরবে না' অর্থে জন্মও হবে না অতএব মৃত্যুও হবে না, সমস্ত প্রবাহের বা তিন গুণের অতীতে অবস্থান করা। এই রকম অগতি অবস্থায় জন্ম মৃত্যু কোথায়? তাই যোগীর লক্ষ্য হল কূটস্থ বা তার ঊর্ধ্বে চলে যাওয়া, যেখানে গেলে তিন গুণ নেই, কোন প্রকার গতি নেই, সম্পূর্ণরূপে অগতি অতএব 'নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্যতে'। কেবল নিশ্চল শূন্যব্রহ্মই আছেন, আর কিছু নেই। তখন জ্ঞান নেই অজ্ঞান নেই, সৎ নেই অসৎ নেই, চেতন নেই অচেতন নেই, আনন্দ নেই নিরানন্দ নেই, দ্বৈত নেই অদ্বৈত নেই কারণ অদ্বৈত বলারও কেউ নেই, অতএব সৎ চিৎ আনন্দও নেই।

"দাহিনা শ্বাসা যবতক চলে তবতক সব কুছ দেখে ফির বিনাস
হোয়—লেকন পহেলে দহিনা চলনেকেবাদ ফির বায় চলতা
হয় য়ানে বাঁওয়া যো কি স্থির কালরূপ হয়" ॥ ৭৭ ॥

প্রতিটি জীবের শ্বাসের গতি দুই নাসিকায় প্রবাহিত হয় এবং এই গতিময় অবস্থাতেই জীব বেঁচে থাকে। অতএব শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে প্রাণের এই চঞ্চল গতিই জীবের বর্তমান অস্তিত্ব। কিন্তু জীব যখন মাতৃজঠরে থাকে তখন তার পক্ষে বাইরের বায়ু হতে শ্বাস নেওয়া সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় জীবের শ্বাসের গতি ইড়া-পিঙ্গলায় থাকে না, অভ্যন্তর গতিতে সুষুম্নায় থাকে। এর থেকে বোঝা গেল যে ইড়া-পিঙ্গলায়

গতি না থাকলেও জীব বেঁচে থাকতে পারে যদি তার শ্বাসের গতি সুষুম্নায় থাকে। জাগতিকভাবে সকল জীবই ইড়া-পিঙ্গলায় গতি বিশিষ্ট হয়েই বেঁচে থাকে, সুষুম্নায় গতি বিশিষ্ট জীব দেখা যায় না, একমাত্র দেখা যায় মাতৃজঠরে। ভূমিষ্ঠ হবার পর জীবের এক অবস্থা, আর তার পূর্ব্বে মাতৃজঠরে থাকাকালীন আর এক অবস্থা। একই জীবের এই দুই অবস্থা পরিষ্কার দেখা যায়। কিন্তু জীব মাতৃজঠরে থাকাকালীন অবস্থাটাকে জানে না, তাই সে ভূমিষ্ঠ হবার পর মৃত্যু পর্যন্ত প্রাণের গতিময় এই অবস্থাকেই আপন এবং একমাত্র অবস্থা বলে জানে। মাতৃজঠরে থাকাকালীন যখন সুষুম্নায় গতি থাকে তখন জীব সত্ত্বগুণে থাকে। ভূমিষ্ঠ হবার পর দুই নাসিকায় গতিপ্রাপ্ত হওয়া মাত্র জীব রজ অথবা তম গুণে আসতে বাধ্য হয়। তাই জীব যতক্ষণ ইড়া-পিঙ্গলায় থাকে ততক্ষণ তম বা রজগুণে থাকতে বাধ্য হয়, সত্ত্বগুণে কিছুতেই যেতে পারে না। সাধারণ প্রচলিত যৌগিক মতে যদিও বলা হয় যে এক নাসিকা হতে শ্বাসের গতি যখন অপর নাসিকায় পরিবর্তন হয় সে সময় সুষুম্নায় খুব অল্প সময়ের জন্য গতি আসে। এই প্রকার সুষুম্নায় গতি প্রাকৃতিক কারণে হয়ে থাকে এবং যেহেতু অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী তাই যোগীর কাছে এই প্রকার সুষুম্নান্তরগত গতি কাম্য নয় কারণ তখনও প্রকৃতি বর্তমান থাকে। যোগীর কাম্য হল ইড়া-পিঙ্গলার গতিকে পুরোপুরি অতিক্রম করে সর্বদার জন্য সুষুম্নায় থাকা। যোগী এও জানেন যে সুষুম্নাও যেহেতু সত্ত্বগুণ তাই তিনি সুষুম্নাকেও অতিক্রম করে গুণাতীত অবস্থায় যেতে চান। যোগী জানেন যে জীব মাতৃজঠর হতে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত তিন গুণের অন্তর্গত থাকে। আবার মৃত্যুর পর দেহ না থাকায় ইড়া-পিঙ্গলায় গতি থাকে না, কিন্তু সুষুম্নায় গতি থাকে। তাই জীব মৃত্যুর পর সুষুম্নায় থাকতে বাধ্য হয়। এই তিনগুণে থাকায় জীব সুখ দুঃখ ভোগ করতেও বাধ্য হয়। তাই যোগীর লক্ষ্য হল ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনের মধ্যে যে গতি তাতে না থেকে এদের অতীতে চলে যাওয়া অর্থাৎ যেখানে গেলে মাতৃজঠরকালীন অবস্থা, ভূমিষ্ঠ থেকে মৃত্যুকালীন যে অবস্থা এবং মৃত্যুর পর যে অবস্থা, এই তিন অবস্থা থাকে না। এই তিন অবস্থা যতক্ষণ বর্তমান ততক্ষণ তিন গুণের কোন না কোন গুণ অবশ্যই থাকে, কারণ এই তিন অবস্থায় গুণ ভেদে প্রাণের চঞ্চল গতি থাকে। প্রাণের চঞ্চল গতি থাকায় অগতি অবস্থা অর্থাৎ নিশ্চল অবস্থা লাভ হয় না। এ কারণেই শ্রীভগবান্ অর্জুনকে তিন গুণের অতীতে যেতে উপদেশ দিয়েছেন।

দক্ষিণ নাসিকায় অর্থাৎ পিঙ্গলায় যতক্ষণ শ্বাসের গতি থাকে ততক্ষণ রজগুণ। এই রজগুণ সমস্ত কর্মের প্রেরণা জোগায়, তাই জীব সব কর্ম করে। জীব যখন এই রজগুণে থাকে তখন তার অবিরাম গতি থাকায় শেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আবার

যখন বাম নাসিকায় অর্থাৎ ইড়াতে গতি হয়, তখন জীব তমগুণে থাকে। জীব যখন তমগুণে থাকে তখনও গতি থাকায় শেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আবার যখন সুষুম্নায় গতি থাকে তখনও অগতি অবস্থা লাভ না হওয়ায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়, যদিও ঐ সুষুম্নাকেই বিষ্ণুধাম বলা হয়। যদি জীবের দীর্ঘ সময় সুষুম্নায় গতি থাকে তাহলে জীব বিষ্ণু ধামে থেকে অনন্ত এবং দীর্ঘ মেয়াদী সুখ ভোগ করে বটে তথাপি সেখানেও অর্থাৎ সে অবস্থাতেও গতি বর্তমান থাকায় দীর্ঘ সুখ ভোগের পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এ অবস্থাতেও জীবের পুনরাগমন রহিত হয় না। তাই যোগীর গন্তব্যস্থল হল ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার অতীত, যেখানে তম রজ এবং সত্বগুণ থাকে না, সেই ত্রিগুণাতীত, কালাতীত এবং দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা, সেই স্বচ্ছ মহাশূন্যে লীন হয়ে যাওয়া, মিলে মিশে এক হয়ে যাওয়া। এই অবস্থায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নেই অতএব জন্ম, পরমায়ু বা স্থিতি এবং মৃত্যুও নেই তাই কালাকাল প্রকৃতি কিছুই নেই। সে এক চিরগম্ভীর অচঞ্চল অবস্থা। এই অবস্থার কথা বলতে গিয়ে যোগিরাজ বলেছেন—"ওঁকার আউর স্থির বড়া গম্ভীর। স্থির ঘর বড়া সুখ।"

"শরীরের কষ্ট হলেই বুঝবে সাধনা বা ক্রিয়া ঠিক হচ্ছে না" ॥ ৭৮ ॥

সাধারণ মানুষের মধ্যে এরকম একটা ধারণা আছে যে যোগকর্ম অতি কঠিন এবং যোগকর্ম সকলের পক্ষে করা সম্ভব নয়। দেশবাসীর মনে এ ধারণা একদিনে জন্মায়নি। যারা অযোগী, যারা আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যুক্ততম অবস্থাকে জানে না, যারা নিজেরাই যোগকর্ম করে না বা জানে না, তারাই সাধারণতঃ নিজেদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এ ধরণের প্রচার করে থাকে। তারা বলে সাধনার মাধ্যমে আপন আপন ইষ্ট দেব-দেবী দর্শনই মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য। যোগী বলেন পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার মিলনই যোগ অর্থাৎ উৎসস্থলে মিলে গিয়ে যুক্ততম অবস্থাই যোগ। শাস্ত্র বলেছেন—'নিশ্চিন্ত যোগ উচ্যতে'। চিন্তাশূন্য অবস্থাকেই যোগ বলে। কোনো সাধক যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো না কোনো দেব-দেবী দর্শন করেন ততক্ষণও চিন্তা অবশ্যই বর্তমান থাকে। চিন্তা হোলো মনের ধর্ম, অতএব মন যতক্ষণ কর্মক্ষম থাকে ততক্ষণ চিন্তা থাকবেই। কারণ মনই দেখে, মন না থাকলে দর্শন কোথায়? তাই যতক্ষণ ইষ্টমূর্তি দেখা বা কোনো দেব-দেবী দেখা হয় ততক্ষণ চিন্তাশূন্য অবস্থা বলা যায় না, অতএব যুক্ততম অবস্থা লাভ হয় না, যুক্ততম অবস্থা না হওয়ায় যোগ হয় না বা যোগী হওয়া যায় না। তাই চিন্তাশূন্য অবস্থায় সবই শূন্য হয়। অতএব

যোগীর মতে ইষ্টমূর্তি, কোনো দেব-দেবী ইত্যাদি দর্শন করাটা মানব জীবনের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হোলো স্থির শূন্য ব্রহ্মে অর্থাৎ উৎসস্থলে মিশে যাওয়া।

গীতায় সর্বত্র যোগের কথা এবং যোগীর নানান অবস্থার কথা বলা হয়েছে। যোগের প্রশংসা করে শ্রীভগবান্ বলেছেন—'বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে। তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগকর্ম সুকৌশলম্॥ (২/৫০)"। যে ব্যক্তি আত্মবিষয়িণী বুদ্ধিরূপ যুক্ত বুদ্ধি দ্বারা পরমাত্মরূপ ব্রহ্মে যুক্ত অর্থাৎ যিনি চঞ্চল বুদ্ধিকে স্থির করে স্থির বুদ্ধিতে অবস্থান করেন তিনি সমস্ত প্রকার সুকৃত ও দুষ্কৃতরূপ পাপ ও পুণ্য অনায়াসেই ত্যাগ করতে সক্ষম হন। তখন তিনি ইচ্ছা ও অনিচ্ছা দু'য়েরই অতীতাবস্থা লাভ করেন ; অতএব তুমি আত্মবুদ্ধির অনুকূল যোগ কর্মে (কর্মযোগে) নিযুক্ত হও। কারণ যোগকর্ম অতি সুকৌশল অর্থাৎ এই প্রাণকর্মরূপ যে যোগকর্ম তা সকলে সহজেই করতে পারে। তাই গীতাতে বলা হয়েছে—'সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্ ॥' (৯/২)। সুখে আরামে করা যাবে এবং যতটুকু করবে তা অব্যয় অবিনাশী। এই যোগ যে অক্ষয় এবং তার ফল যে কখনও নষ্ট হয় না, জন্মান্তরে আবার লাভ করবে একথা গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৪১-৪২ শ্লোকে শ্রীভগবান্ নিজেই বলেছেন। শ্রীভগবান্ বলেছেন যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি দেহান্ত সময়ে স্থিতিরূপ অবস্থাকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ উপলব্ধি করেন এবং দেহান্তে সেই স্থিতি অবস্থাতেই বহু বৎসর থাকার পর শুচি ও শ্রীমানের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। আরো উন্নত যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যোগী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রকার যোগী বংশে জন্ম জগতে দুর্লভ। এই দুই প্রকার জন্মেই পূর্ব দেহজাত সেই ব্রহ্মবিষয়ক বুদ্ধিসংযোগ হয় এবং সম্যক্ প্রকারে সিদ্ধি লাভের জন্য অধিক যত্নবান হন।

এর থেকে বোঝা গেল যে যোগ সনাতন ধর্মের এক সনাতন সাধন পদ্ধতি যা সকল মানুষ সুখে আরামে এবং নির্ভয়ে করতে পারে। এতে কোনো হানি বা অনিষ্টের সম্ভাবনা নেই, তবে অবশ্যই যোগী গুরুর নিকট লাভ করতে হবে। এ কারণেই যোগিরাজ বলেছেন ক্রিয়াযোগ সাধনে কোনো রকম কষ্ট যেন না হয়, কষ্ট হলেই বুঝবে কোথাও ভুল হচ্ছে, সাধন ঠিকমত হচ্ছে না। তাই তিনি ভক্তদের বলতেন মাঝে মাঝে গুরুর নিকট উপনীত হয়ে ক্রিয়া সাধন দেখিয়ে নিতে।

———

"তিলুয়ায় গুড় টেনে টেনে হালকা হয় যেমন তেমনি শরীরে শ্বাস টেনে টেনে শরীর হালকা হয়—সে যেমন দুধের উপর ভাসে তেমনি শূন্যের উপর শরীর থাকে। কিছুদিনের পর অনুতে মিলিয়ে যায়" ॥ ৭৯ ॥

সাধারণতঃ দেখা যায় যে বৃহৎ পাত্রের মধ্যে আখের রস বা খেজুর রস জ্বালিয়ে গুড় তৈরী করা হয় তখন গুড়ের রঙ থাকে অনেকটা লাল। তাই গুড় প্রস্তুতকারক একটু একটু করে গুড় ওই পাত্রের গায়ে তুলে ঘষতে থাকে এবং তাতে গুড়ের রঙ পরিষ্কার হয়। এইভাবেই গুড়কে পরিষ্কার করা হয় বটে তবে তাতে গুড়ের ওজন কিছুটা হালকা হয়। যোগিরাজ এই উপমা দিয়ে বলছেন যে শরীরের ভেতর যে শ্বাস সর্বদা যাতায়াত করছে তাকে যদি গুরুপদেশ অনুসারে বিধিপূর্বক টানা ফেলা করা যায় অর্থাৎ বিধিপূর্বক অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করা যায় তাহলে এই স্থূল শরীরও হালকা হয়। যোগিরাজ বলেছেন ওই সাদা গুড় দু ফোঁটা দুধের ওপর ফেলে দিলে যেমন ভাসতে থাকে, তেমনি অন্তর্মুখী প্রাণায়াম করতে থাকলে এই শরীরও শূন্যের ওপর ভেসে থাকতে পারে, শেষে অনুতে মিলে যায়।

এ দুনিয়ায় যত বস্তু আছে সবার ওজন অবশ্যই আছে, কম আর বেশী। একটি ধূলিকণা, এমনকি তুলোর একটি ফুঁপি তারও ওজন আছে। ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চভূত তারও ওজন আছে। ওজন বিহীন কোনো বস্তু হতে পারে না, বাতাস আকাশ তাদেরও ওজন আছে। তাই দেখা যায় এক টুকরো তুলো শূন্যে ভাসছে, কিন্তু যেহেতু তার ওজন আছে তাই মাধ্যাকর্ষনের টানে কোনো এক সময় সে মাটিতে পড়ে যেতে বাধ্য হয়, সর্বদার জন্য শূন্যে থাকতে পারে না। এই দেহেরও ওজন থাকায় জীবের পক্ষে শূন্যে ভেসে থাকা সম্ভব হয় না। যৌগিক মতে এই দেহকে যদি ওজন বিহীন করা যায় তবে শূন্যে ভেসে থাকতে সক্ষম হয়। কিন্তু দেহকে ওজন বিহীন করবার মতো বৈজ্ঞানিক কোনো উপায় নেই বা আজও আবিষ্কৃত হয়নি। এই দেহকে ওজন বিহীন করতে একমাত্র যোগীরাই পারেন যোগকর্মের মাধ্যমে। দেহের ওজন বিহীনতা অষ্টসিদ্ধির অন্তর্গত। অনিমা লঘিমা ব্যাপ্তি বা প্রাপ্তি প্রকাম্য মহিমা ঈশিত্ব বশিত্ব ও কামাবসায়িতা এই আট প্রকার সিদ্ধি বা ঐশ্বর্য যোগী লাভ করে থাকেন, এর মধ্যে লঘিমা ঐশ্বর্য হোলো নিজ শরীরের ভারহীনতা। সঠিক যোগী এই অষ্টসিদ্ধিতে মোহিত না হয়ে এর অতীতে যাবার চেষ্টা করেন, কারণ যোগী জানেন যে এতে মোহিত হলে আত্মরাজ্যে প্রবেশ করা যাবে না। যোগী যখন উত্তমপ্রকারে অন্তর্মুখী প্রাণকর্মে দীর্ঘ রত থাকেন তখন তিনি এই

অষ্টসিদ্ধি আপনাহতেই লাভ করেন বা তাঁর কাছে আপনাহতেই উপস্থিত হয়। যোগিরাজ এই অষ্টসিদ্ধি পুরোপুরি লাভ করেছিলেন এবং তা তাঁর গোপন দিন-লিপিতে নিভৃতে লিখে রেখে গেছেন। এই অষ্টসিদ্ধির মধ্যে লঘিমা সিদ্ধি তিনি যেভাবে একটু একটু করে লাভ করেছিলেন তার ক্রম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কখনো বলেছেন—'আজ জমিনসে চলতে ওক্ত পএর উঠে লগা'—আজ রাস্তা দিয়ে যখন হেঁটে যাচ্ছিলাম তখন জমি থেকে পা দুটো ওপরে উঠে যাচ্ছিল, মাটিতে ঠেকছিল না, মনে হোলো শূন্যের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। তার কয়েকদিন পরে লিখেছেন—'আজ সূর্য্য দেখতে ওক্ত পএর জমিনসে উঠনে লগা।'—আজ যখন আত্মসূর্য দেখছিলাম তখন পা দুটো জমি থেকে উঠতে লাগলো, জমিতে আর পা দুটো ঠেকে নেই। 'উচেপর উঠেনেকা তবিয়ত করতা হয় উচেকা হওনাসে ডব মালুম হোতা হয়—বড়া আনন্দ।' প্রাণায়াম করতে করতে শরীর হালকা হওয়ায়, ওজন বিহীন হওয়ায় শরীর আপনাহতেই উঠতে লাগলো, দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু ঊর্ধ্বে স্থির হওয়ায় এই অবস্থা হোলো; তখন সামান্য ভয় হোলো আবার প্রচুর আনন্দও হতে লাগলো। 'ইহ মালুম হোতা হেয় কি কুম্ভকসে বদন হালকা হোতা হয়।' দীর্ঘ প্রাণায়াম করতে করতে আপনাহতেই যখন কুম্ভক হোলো, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি আপনাহতেই যখন থেমে গেল তখন বুঝলাম যে শরীর হাল্কা হোলো, ওজন শূন্য হোলো। তখন মনে হোলো—'কোই হাত পকড়কে উঠাতা হয়, আব উপর খৈচকে লেজাতা হয়।' কে যেন হাত ধরে ওপর দিকে উঠিয়ে দিচ্ছে। দেহাভ্যন্তরস্থ উনপঞ্চাশ বায়ু একে একে মিলতে মিলতে যখন অনাহত চক্রে এক মুখ্য প্রাণবায়ুতে মিলে যাওয়ার উপক্রম হয় তখন শরীর আপনাহতেই ওপরদিকে উঠতে থাকে। তাই তিনি এর পরেই বলেছেন—'আসন আপসে উঠা।' পদ্মাসনে বসে যখন ক্রিয়া করছিলাম তখন ওই পদ্মাসন অবস্থাতেই জমি ছেড়ে দিয়ে আপনাহতেই ওপরে উঠে গেলাম। এই অবস্থায় শূন্যের ওপর দীর্ঘ সময় ভাসতে থাকলে এক গাঢ় নেশার উদয় হয় এবং তখন নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে, আমি আছি কি নেই এসব বোধ তিরোহিত হয়ে, দেহবোধের অতীতে চলে গিয়ে যেন কোথায় হারিয়ে গেলাম। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন—'এক তরহকা ভারি নেসা জিসমে বেখবর হো জানে পড়তা হয়।' তখন মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার সবই হারিয়ে গেল। যখন দেহবোধই থাকলো না তখন এরাও কেউ নেই। যতক্ষণ দেহবোধ থাকে ততক্ষণই এদের অস্তিত্ব, কিন্তু যখন দেহবোধ থাকে না তখন এরা কোথায়? যেমন অজ্ঞান ব্যক্তির দেহবোধ না থাকায় মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার ইত্যাদি কিছুই থাকে না। কিন্তু সেই ব্যক্তির যখন জ্ঞান ফিরে আসে, দেহবোধ জেগে ওঠে তখন এগুলিও আপনাহতেই প্রকাশিত হয়। অতএব দেখা গেল

দেহবোধের ওপর এদের অস্তিত্ব। তাই যোগী যখন দীর্ঘ প্রাণকর্ম করতে থাকেন তখন আপনাহতেই দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু ওপর দিকে উঠতে থাকে এবং যতই ওপরদিকে উঠতে থাকে ততই বায়ুর সংখ্যা কমতে থাকে এবং স্থির হতে থাকে। এই প্রকারে বায়ু যখন মূলাধার সাধিষ্ঠান মনিপুর অনাহত চক্র অতিক্রম করে আরো ওপরদিকে স্থিরাবস্থায় উঠতে থাকে ততই শরীর ভার শূন্য হয়ে শূন্যের ওপর অনায়াসে ভেসে থাকতে পারে। এইভাবে যোগী যতই ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাকেন ততই তিনি শূন্যের সঙ্গে মিশতে থাকেন এবং শেষে যখন পুরোপুরি ক্রিয়ার পরাবস্থায় অবস্থান করেন তখন তিনি শূন্যের সঙ্গে মিশে যান এবং শেষে একেবারেই শূন্যস্বরূপ হয়ে যান অর্থাৎ নিজেই শূন্য হয়ে যান। তাই যোগিরাজ বলেছেন কিছুদিনের পর অম্বুতে মিলে যায়। এই শূন্যই হেলো ব্রহ্ম অর্থাৎ এই শূন্যের ভেতর যে শূন্য, যার অস্তিত্বে এই অনন্ত শূন্যেরও অস্তিত্ব তিনি ব্রহ্ম। শূন্যস্বরূপ সেই ব্রহ্ম আছেন বলেই এই অনন্ত শূন্য বর্তমান। সেই শূন্যব্রহ্ম চিরস্থির, অচঞ্চল, চিরগম্ভীর ও সর্বত্র বিরাজিত। যোগীকে সেই শূন্যব্রহ্মের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিলে যেতে হবে, মিশে যেতে হবে, তখনই পূর্ণ অদ্বৈত অবস্থা হবে, এটাই যোগিরাজের অভিমত।

"ভিস্ম য়ানে ডর—যবতক সিরমে তিন বান অর্থাৎ
ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না নহি মিলা তবতাই উহ স্থির নহি
হোত হয় জোকি অগ্নি য়ানে তেজ কম্রকে ন মারে
পিছে ওঁকার ধ্বনি বর্ণমে সুনাতা হয়" ॥ ৮৩ ॥

ভীষ্ম অর্থে ভয়, সাধন করতে ভয়। মহাভারতে বর্ণিত কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই পিতামহ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ জীব শরীরে সর্বদাই চলছে, প্রবৃত্তি পক্ষ ও নিবৃত্তি পক্ষ। প্রবৃত্তি পক্ষীয়গণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ। ইন্দ্রিয়গণকেই মন আপনার বলে জানে; পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মোট এই দশ ইন্দ্রিয়। দশ ইন্দ্রিয়ই দশ গুণ বিশিষ্ট হওয়ায় দশদিকে ধাবমানশীল। এদের রাজা ধৃতরাষ্ট্র। যিনি দেহরূপ রাজ্যকে ধারণ করে আছেন বা পরিচালিত করছেন তিনিই ধৃতরাষ্ট্র [ধৃতং রাষ্ট্রং যেন স ধৃতরাষ্ট্রঃ]; মনই দেহরূপ রাজ্যের রাজা, ইনিই দেহরূপ রাজ্যকে ধারণ করে আছেন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়দের পরিচালিত করছেন। তাই মনই ধৃতরাষ্ট্র। এই মন অন্ধ; নিজে কিছুই দেখে না। বুদ্ধির দ্বারা ভালমন্দ বিষয় সকল মনের গোচর হয়, তাই মহাভারতে বর্ণিত ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ। এই মনের যে দশ ইন্দ্রিয়রূপী দশ সেনা

তারা প্রত্যেকেই দশদিকে গমনাগমনশীল হওয়ায় দশ গুণ দশ হওয়ায় ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র, এরা সবাই মনের প্রবৃত্তিপক্ষীয়। এই প্রবৃত্তিপক্ষীয়গণ সর্বদাই সাধককে আত্মসাধনে বাধা দেয়। প্রাণের চঞ্চলতায় এদের অস্তিত্ব অর্থাৎ যতক্ষণ দেহে প্রাণ চঞ্চল থাকবে, ততক্ষণ এরাও জীবিত বা কর্মক্ষম থাকবে। প্রাণের স্থিরাবস্থায় এরা কেউ থাকে না। ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চ তত্ত্বই পঞ্চপাণ্ডব; এরা সবাই দেবলোক হতে জাত, কারণ নিশ্চল ব্রহ্ম হতে চঞ্চলতার ক্রমবর্দ্ধমান হেতু আকাশ বাতাস তেজ জল এবং মাটি এই পাঁচ তত্ত্ব আবির্ভূত হয়, তাই এরা দেবলোক হতে জাত। যদি সাধন-সমরে জিততে না পারি এই ভয় উভয়পক্ষেই থাকে, তাই ভীষ্ম উভয়পক্ষেরই পিতামহ। তাই যোগিরাজ বলছেন এই ভয় কতক্ষণ থাকে? যতক্ষণ তিনবাণ অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না মস্তকে গিয়ে অর্থাৎ কূটস্থে গিয়ে না মিলবে ততক্ষণ স্থির হবে না এবং বায়ু স্থির না হওয়া পর্যন্ত ভয় অবশ্যই থাকবে। অতএব শক্তিপূর্বক উত্তম প্রাণকর্ম করতে থাকলে আপনাহতেই যখন বায়ু স্থির হবে তখন ওঁকার ধ্বনি শোনা যাবে এবং সেই ধ্বনিতে মগ্ন হলে স্থিরত্বপদ আসবে। তখন যোগী কূটস্থে স্থায়ী স্থিতিলাভ করে, তিনগুণের অতীতে অবস্থান করে সহস্রার অভিমুখে গমন করবে। তখন যোগী ক্রিয়ার পরাবস্থায় অর্থাৎ সকল কর্মের অতীতাবস্থায় পৌঁছে যাওয়ায় নির্ভয় হবে। এই দেহ ধনুক এবং শ্বাস তীর। এই তীর চালিত করলে অর্থাৎ অন্তর্মুখী প্রাণায়াম করলে তবেই ভয়ের নাশ হয়। এই শর চালনারূপ প্রাণকর্ম এবং পরে উদিত স্থিরাবস্থা এই দুটিকে বোঝানোর জন্য রূপকছলে ভীষ্মের শরশয্যারূপে দেখানো হয়েছে। এই ভয় সাধারণত প্রবৃত্তি পক্ষেই অধিক থাকে, তাই ভয়রূপী পিতামহ ভীষ্ম কুরুপক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। তাই যোগিরাজ বলেছেন এই প্রাণকর্ম উত্তম প্রকারে তেজস্বিতার সঙ্গে করতে থাকলে যখন ঊনপঞ্চাশ বায়ু স্থির হয়ে মুখ্য প্রাণবায়ুতে মিলে গিয়ে সহস্রারে স্থির হবে তখন আপনাহতেই সাধন করতে যে ভয় তার নাশ হবে, যোগী নির্ভয় হবে।

"সূর্য্যনারায়ণ ওঁকারকা রূপ দেখা—শরীর বহুত হলকা হুয়া সফেদ পরদা আঁখকে সামনে মালুম হুয়া ফির সূর্য্যকে ভিতর কিস্নণকা রূপ—ওহি জগৎময়—সত্ত্ব রজ তম রূপ—পাঁচ তত্ত্বমে মিলা পদার্থ আউর সব তত্ত্ব উসসে নিকসা—য়ানে নির্ম্মল ব্রহ্ম" ॥ ৮১ ॥

আত্মসূর্যই নারায়ণ এবং ওঁকারের রূপ, সেই রূপ দেখলাম। অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করতে করতে শরীর খুব হালকা হল এবং চোখের সামনে এক সাদা পর্দা বুঝলাম। বুঝলাম যে এই পর্দাই মায়া। পুনরায় এই মায়া তিরোহিত হওয়ায় স্বচ্ছ আত্মসূর্যের ভেতর কৃষ্ণের রূপ দেখলাম। আরো দেখলাম যে যিনি কৃষ্ণ তিনিই আত্মসূর্য এবং সেই রূপ জগৎময় ব্যাপ্ত। ওই রূপই সত্ত্ব রজ তম এই তিন গুণের আশ্রয়স্থল। আবার দেখলাম যে এ জগতের সমস্ত পদার্থ পাঁচ তত্ত্বে মিলে গেল। ওই পাঁচ তত্ত্ব এবং তিন গুণ সবই ওই আত্মসূর্য থেকে আসছে আবার সেখানেই মিলে যাচ্ছে। ওই আত্মসূর্যই নির্মল স্বচ্ছ ব্রহ্ম। ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পাঁচ তত্ত্বের উৎপত্তিস্থল ওই আত্মসূর্য। এই পাঁচ তত্ত্ব হতে এই দুনিয়ার সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়। আবার সমস্ত পদার্থ ঘুরে ফিরে ওই পাঁচ তত্ত্বেই মিলে যায়। এই পাঁচ তত্ত্ব এবং তার থেকে উৎপন্ন সমস্ত পদার্থের মধ্যে সত্ত্ব রজ তম এই যে তিন গুণ বর্তমান সেই তিন গুণও ওই আত্মসূর্য হতেই উৎপন্ন হয়। অতএব আত্মসাধন করতে করতে যখন কূটস্থে স্থির ভাবে অবস্থান করলাম, তখন পরিষ্কার দেখতে ও জানতে পারলাম যে পাঁচতত্ত্ব, পাঁচতত্ত্ব হতে উৎপন্ন এ দুনিয়ার সমস্ত পদার্থ এবং এই সবকিছুর মধ্যে যে তিন গুণ তা সবই ওই আত্মসূর্য হতে উৎপন্ন হয় এবং ঘুরে ফিরে আত্মসূর্যতেই লয় হয়। আত্মসূর্যই সবকিছুর মূল বা আদি কারণ, তাই ওই আত্মসূর্যই নিশ্চল নির্মল স্বচ্ছ ব্রহ্ম।

—————

"অব স্বরূপ দর্শন হুয়া—উহ রূপ ত্রিকুটিকে ভিতর হয়—হংস উস্কো কহে জব সংসয় জায় আউর সফেদ দেখে আউর সুদ্ধ ভিতর ভিতর আওএ আউর যায় যো আজ হুয়া—বড়া মজা" ॥ ৮২ ॥

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ১৯/২০ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলেছেন যেমন বাতাসহীন স্থানে প্রদীপ শিখা স্থির থাকে, তেমনি আত্মবিষয়ক যোগের অভ্যাসকারী সংযতাত্মা যোগীর চিত্ত অচঞ্চল থাকে। দীর্ঘ প্রাণকর্মের দ্বারা যোগীর দেহাভ্যন্তরস্থ চঞ্চল উনপঞ্চাশ বায়ু স্থির হয়ে মুখ্য এক প্রাণবায়ুতে মিশে যাওয়ায় বায়ু স্থিরের অবস্থা হয়। তখন আগম নিগমরূপ গতি রহিত হওয়ায় চিত্ত চঞ্চল হয় না। চিত্তবৃত্তির স্বতঃ নিরোধরূপ প্রাণের চঞ্চলতা রহিত এই যে স্থিরাবস্থা যখন উদিত হয় তখন যোগী আজ্ঞাচক্রে এবং তারও ঊর্ধ্বে পরমাত্মপদে অবস্থিতি লাভ করেন। তখন তাঁর আত্মা আত্মাতেই থাকে অর্থাৎ চিৎস্বরূপ আত্মা পরমাত্মায় লীন হয়ে চাঞ্চল্যরহিত হয়ে স্থির থাকে। সে অবস্থায় যোগীর আত্মদর্শন হয় অর্থাৎ আপনাকেই আপনি দেখে আপনি সন্তুষ্ট হন।

যোগিরাজও সাধন করতে করতে যখন এরকম অবস্থায় উপনীত হলেন তখন তাঁরও স্বরূপ দর্শন হোলো। তাঁর এই মহান্ উপলব্ধির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে এই স্বরূপ দর্শন ত্রিকুটীর ভেতর হয়। অর্থাৎ যখন যোগী প্রাণকর্মের মাধ্যমে কূটস্থে নিশ্চলভাবে অবস্থান করেন তখন অত্যন্ত তেজপূর্ণ এক ত্রিভুজাকৃতি দর্শন হয়; সেই ত্রিভুজের মধ্যে স্বরূপ দর্শন হয়। এই ত্রিকোন সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—'ত্রিকোন তেজ রূপকি বলিহারি জাই।' এই ত্রিকোনের মধ্যে যখন স্বরূপ দর্শন হয় তখন যোগীর সকল প্রকার সংশয় দ্বন্দ্ব ইত্যাদি চলে যায়। তখন যোগী প্রকৃত শুদ্ধাবস্থা লাভ করেন। এ অবস্থা অত্যন্ত আনন্দদায়ক। ওই ত্রিকুটীকেই হংস বলে, কারণ ওখান থেকেই শ্বাসের উৎপত্তি হয়। তাই শ্বাসের উৎপত্তিস্থলরূপ ওই ত্রিকুটীকে যিনি জানতে পারেন অর্থাৎ যে যোগী ওই ত্রিকুটিতে স্থিরভাবে অবস্থান করেন তাঁকেই পরমহংস বলে। শ্বাসই হংস এবং শ্বাসের উৎপত্তিস্থল ওই ত্রিকুটিই পরমহংস। ওই ত্রিকুটিকেই আবার ব্রহ্মযোনি বলে। এখানেই চিৎবায়ু অবস্থিত। মনের ধর্মই হোলো কোনো কিছুকে যতক্ষণ সঠিকভাবে জানা না যায় ততক্ষণ সংশয় দ্বন্দ্ব ইত্যাদি অবশ্যই থাকে। প্রাণ চঞ্চল বলেই মন চঞ্চল হয়। এই চঞ্চল মনের দ্বারা আত্মবিষয়ক জ্ঞান হয় না এবং জানা যায় না। আত্মাকে জানতে হলে প্রাণবায়ুকে অবশ্যই স্থির করতে হবে। এই স্থির করবার একমাত্র উপায় হোলো অন্তর্মুখী প্রাণায়াম। এই প্রাণায়ামের মাধ্যমে যোগী যখন স্থিরত্ব লাভ করেন তখন তিনি সহজেই কূটস্থে স্থিতিলাভ করতে পারেন এবং তখন তাঁর কাছে সবকিছু আপনাহতেই

প্রকাশ হয়। এটাই যোগীর মূল কথা এবং মূল কর্ম। তাই যোগিরাজ এই কর্মই দ্বিধাহীনচিত্তে সকলকে করতে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন এই কর্ম যে করবে, আপনাহতেই তার সকল সংশয় দূর হবে এবং মনুষ্য জন্ম সফল হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

"কেহ পাপী নয়, কেহ পুণ্যাত্মাও নয়। কূটস্থে মন রাখিলে পাপ নাই, মন না রাখিলেই পাপ" ॥ ৮৩ ॥

পাপ এবং পুণ্য উভয়েই মনোধর্ম এবং কর্মের ফলমাত্র। মন কাকে বলে? প্রাণের চঞ্চল অবস্থার নাম মন। প্রাণের দুটো অবস্থা—স্থির ও চঞ্চল। স্থির অবস্থাটাই ব্রহ্ম এবং চঞ্চল অবস্থাটাই জীব মহামায়া ইত্যাদি। এই চঞ্চল অবস্থা হতেই সবকিছুর উৎপত্তি। তাই চঞ্চল অবস্থাহতেই এই দেহ মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণ ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। অতএব যতক্ষণ প্রাণ চঞ্চল ততক্ষণই মনের অস্তিত্ব, কিন্তু প্রাণ স্থির হলে আর এরা কেউ থাকে না। যতকিছু কর্ম তাও ওই প্রাণের চঞ্চল অবস্থা হতে জাত। অতএব বোঝা গেল যে প্রাণ যতক্ষণ চঞ্চল থাকবে ততক্ষণ দেহ মন বুদ্ধি এবং কর্ম অবশ্যই থাকবে। তাই জীব কর্মহীন হয়ে কখনই থাকতে পারে না, কর্ম করতে বাধ্য হয়, কারণ তার বর্তমান অস্তিত্ব চঞ্চল। আবার কর্ম করলে ফল উৎপন্ন হবেই, এটাই কর্মের ধর্ম। এ সবই প্রাণের চঞ্চল অবস্থার শৃঙ্খলা (Discipline) বা নিয়ম (Rules)। এই শৃঙ্খলা বা নিয়ম কখনই লঙ্ঘিত হয় না। প্রাণের এই যে শৃঙ্খলা বা নিয়ম তার ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড। এই শিশাল শৃঙ্খলা বা নিয়মের মধ্যে কোনো প্রকার দয়া মায়া প্রেম ইত্যাদির প্রশ্ন ওঠে না। যেখানে শৃঙ্খলা এবং নিয়মই একমাত্র বিষয়। তাই দেখা যায় সূর্য ঠিক সময়ে ওঠে এবং অস্ত যায়, পৃথিবী তার নিজের আবর্তে ঘুরতে বাধ্য হয়, যথা সময়ে শীত গ্রীষ্ম ইত্যাদি ঋতু পরিবর্তন হয়, জীব কুল ঠিক সময়ে জন্মায় ও মরে, মাতার শত ক্রন্দনেও শিশু বাঁচে না ইত্যাদি। এ সবই প্রাণের চঞ্চল অবস্থার যে শৃঙ্খলা ও নিয়ম তারই অন্তর্গত, এর ব্যাতিক্রম হবার উপায় নেই। যেহেতু কর্মও এই শৃঙ্খলা ও নিয়মের অন্তর্গত তাই জীব কর্ম করতে বাধ্য হয় এবং স্বভাবতই কর্মের ফলভাগী হয়। এই কর্ম দুই প্রকার—ভাল এবং মন্দ। উভয়ই কর্ম এবং উভয় কর্মই ফল উৎপাদন করে। ভাল কর্মের ভাল ফল, যাকে পুণ্য বলে এবং মন্দ কর্মের মন্দ ফল, যাকে পাপ বলে। অতএব পাপ পুণ্য আর কিছুই নয়, কেবল কর্মের ফল মাত্র।

যতক্ষণ এই দেহ, দেহবোধ বা শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি আছে ততক্ষণ কর্ম অবশ্যই আছে; অতএব পাপ পুণ্যও আছে। এই শৃঙ্খলা বা নিয়মের ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। তবে বিবেক বলে একটি সূক্ষ্ম বিষয় আছে, যা চোখে দেখা যায় না কিন্তু তার অস্তিত্বকে অনুভব করা যায়; সেই বিবেক ঠিক করে, ভাল কর্ম করব কি মন্দ কর্ম করব। তা হলে মন্দ কর্ম থেকে দূরে থাকা যায় এবং মন্দ কর্মের যে ফলভোগ তা না করে পুণ্য কর্মের ফলভোগ করা যায়। পুণ্য কর্মের ফলভোগ স্বর্গলাভ, সুখভোগ, আনন্দ-লাভ ইত্যাদি; তেমনি মন্দ কর্মের ফলভোগ নরক লাভ, দুঃখভোগ, নিরানন্দ ইত্যাদি। কর্ম যখন সকলকেই করতে হবে এবং তা অবশ্যম্ভাবী, না করে উপায় নেই তখন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পন্থা হোলো বিবেকের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কর্ম করা, তাহলে মন্দ কর্মের যেসব ফল তার থেকে অনায়াসে দূরে থাকা যায়। দেহ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, আলস্য, সংসার, কামিনী, কাঞ্চন ইত্যাদি অবশ্যই আছে, একে অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই। আবার এই দেহকে বাঁচিয়ে রাখাও প্রয়োজন এবং বাঁচিয়ে রাখতে গেলেও যেসব কর্ম তাও প্রয়োজন। অতএব দেখা যায় কর্মের বিনাশ করতে হলে প্রাণকে স্থিরত্বের দিকে নিয়ে যাওয়াটাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু প্রাণতো কিছুতেই স্থির হতে চায় না এবং এমন কোনো বৈজ্ঞানিক পন্থা আজও আবিষ্কৃত হয়নি যার মাধ্যমে প্রাণকে দীর্ঘ সময় স্থির করে রাখা যায় অথচ জ্ঞান বা চেতনভাব বর্তমান থাকে যা সমাধি অবস্থায় হয়। তাই প্রাণকে স্থির করবার শ্রেষ্ঠ উপায় হোলো অন্তর্মুখী প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম একমাত্র মানুষের পক্ষেই সম্ভব। তাই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম হোলো এই প্রাণায়াম করা। যে মানুষ এই অন্তর্মুখী প্রাণায়ামে রত থাকে তার প্রাণ আপনা হতেই ধীরে ধীরে স্থিরত্ব অভিমুখে এগিয়ে যায়। যখন স্থিরত্বে উপনীত হয় তখন আপনাহতেই সমস্ত কর্ম হতে নিষ্কৃতি পায়, কারণ প্রাণের এই স্থিরাবস্থায় আর কোনো প্রকার পূর্বোক্ত শৃঙ্খলা বা নিয়ম থাকে না। ওই শৃঙ্খলা বা নিয়ম কেবলমাত্র প্রাণের চঞ্চল অবস্থাতেই বর্তমান থাকে, কিন্তু যখন স্থির তখন কিছু নেই। তাই এই স্থিরাবস্থায় চঞ্চলতার যে শৃঙ্খলা ও নিয়ম তা না থাকায় দেহবোধ মন বুদ্ধি বিবেক ধর্ম কর্ম পাপ পুণ্য ইত্যাদি কিছুই থাকে না। প্রাণের এই প্রকার স্থিরাবস্থায় সবই মহাশূন্যরূপী স্থির ব্রহ্মে মিশে যায়, তখন কেবল একমাত্র আমিই আছে অথচ আমি বলার কেউ নেই।

যোগিরাজ বলেছেন কূটস্থে মন রাখলে পাপ নেই, মন না রাখলেই পাপ। এই দেহ অনিত্য এবং বিনাশী, কিন্তু এই দেহের মধ্যে যে কূটস্থ তা নিত্য এবং অবিনাশী। দেহের জন্ম মৃত্যু, হ্রাস বৃদ্ধি আছে কিন্তু কূটস্থের তা নেই। এই দেহ, প্রাণের চঞ্চল অবস্থার যে শৃঙ্খলা ও নিয়ম (Discipline and Rules) তার অন্তর্গত, কিন্তু কূটস্থ

এর অতীত। তাই কূটস্থে মন রাখলে মন নিরুদ্ধ ও কর্মহীন হওয়ায় প্রাণের চঞ্চল অবস্থার শৃঙ্খলা ও নিয়মের অতীতে অবস্থান করা যায়। তখন আপনাহতেই পাপ-পুণ্যরূপ কর্মের যে ফল তার অতীতে অবস্থান করা যায়। অতএব সকলের উচিত প্রাণকর্মের মাধ্যমে প্রাণকে স্থির ক'রে অবিনাশী কূটস্থে অবস্থান করা, তাহলে পাপ, পুণ্য, কর্মফল, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি কোনো কিছুই স্পর্শ করতে পারে না। কারণ কূটস্থরূপী স্থির ব্রহ্ম সকল প্রকার কালাকাল, শৃঙ্খলা ও নিয়মের অতীত।

"জো কিস্তুন সো বুড়ুয়া বাবা" ॥ ৮৪ ॥

ভারতবর্ষে সাধারণতঃ সাধু মহাত্মাদের বাবাজী বলা হয়। যোগিরাজও তাঁর গুরুদেবকে বাবাজী সম্বোধন করতেন। আরো দেখা যাচ্ছে যে তিনি তাঁর গুরুদেবকে বুড়ুয়া বাবা বলেও সম্বোধন করেছেন। পরবর্তীকালে যোগিরাজের অনেক ভক্ত এই অদৃশ্য মহাপুরুষকে ত্র্যম্বক বাবা বলতেন। যে যাই বলুক না কেন এই মহাপুরুষ চিরকালই লোকচক্ষের অন্তরালে রয়ে গেছেন। এই বাবাজী সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী শোনা যায়। এই সব কিংবদন্তীর কারণও আছে। ভারতের আধ্যাত্ম জগতে এঁর নাম সুবিদীত। যিনি চিরকালই লোকচক্ষের অন্তরালে, অথচ অধ্যাত্ম জগতের স্তম্ভ স্বরূপ, তাঁর বিষয়ে কিংবদন্তী হওয়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাই অনেকে বলেন যে এই মহাপুরুষ জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর অতীত। এমন মহাপুরুষের মৃত্যুঞ্জয় হওয়াটা অসম্ভব নয়। তাই দেখা যায় এই মহাপুরুষকে কেন্দ্র করে বহু ভক্ত অনেক কাহিনী গল্প ইত্যাদি রচনা করেছেন। ভাবের আতিশয্যে কত ভক্ত বলেছেন বাবাজীকে ওখানে দেখলাম, সেখানে দেখলাম ইত্যাদি। বাবাজী মহারাজকে স্থূল শরীরে দর্শন পাওয়াকে নিয়ে যেসব কাহিনী ইতিপূর্বে রচিত হয়েছে তা কতখানি সত্য তা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই না, এগুলি গবেষণার বিষয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো যে বাবাজী সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্য মহাত্মা শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় নিজে কি বলেছেন। যিনি সরাসরি তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং তিনি নিজে যা বলেছেন সেটাকেই আমরা তাঁর গুরুর বিষয়ে প্রামাণিক তথ্য বলে মনে করি। পরবর্তীকালে যোগিরাজের কোনো কোনো ভক্ত অথবা ভক্তের ভক্ত বা শিষ্যের শিষ্য; যাঁদের বাবাজীর সান্নিধ্যে আসার কোন প্রশ্ন আসে না বা সম্ভব নয়, তাঁরা এই অলক্ষ্য মহাপুরুষ সম্বন্ধে যা যা বলেছেন সে সব অপেক্ষা লাহিড়ী মহাশয়ের নিজস্ব বক্তব্য-গুলোকে অবশ্যই সঠিক এবং প্রামাণিক বলা উচিত। যোগিরাজ তাঁর গুরুদেবের রূপ

বর্ণনা করতে গিয়ে গোপন দিনলিপিতে একটি মনুষ্য মুখাকৃতি অঙ্কন করে বলেছেন—'বাবাজীকে রূপ, এহি জম ও ধর্ম্ম'। অর্থাৎ এই যে বাবাজীর রূপ আঁকলাম এটাই জীব জগৎ তথা সকল সৃষ্টির নিধন কর্তা, আবার অপর দিকে ইনিই একাধারে ধর্ম অর্থাৎ পালনকর্তা। এতে বোঝা গেল যে তাঁর গুরুদেব কোনো সাধারণ যোগী বা কেবল সাধু মহাপুরুষ মাত্র নন। কারণ যিনি একাধারে পালনকর্তা ও নিধনকর্তা তাঁকে কখনই মানব আখ্যা দেওয়া চলে না। এমন আখ্যা ভগবানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই যোগিরাজ দিনলিপিতে অপর জায়গায় লিখেছেন—'খোদ বাবাজী কালদণ্ড লিএউপর সূর্য্য চন্দ্রমাকে ভিতর দেখলাই দিয়া'। স্বয়ং বাবাজী কালদণ্ড সহ ওপরে অর্থাৎ কূটস্থে সূর্য-চন্দ্রের মধ্যে অর্থাৎ আত্মসূর্যের মধ্যে অবস্থিত দেখা গেল। আত্মকর্ম ব্যতীত কোনো যোগী কখনও কূটস্থে অবস্থান করতে পারেন না। অতএব যোগিরাজও আত্মকর্ম করতে করতে যখন সাধনার পীঠভূমি কূটস্থে অবস্থান করলেন তখন আপনা-হতে যে আত্মসূর্য দর্শন হোলো, সেই আত্মসূর্যের মধ্যে তাঁর গুরুদেব বাবাজীর দর্শন লাভ করলেন। এখানে যে সূর্য-চন্দ্রের কথা যোগিরাজ বলেছেন তা আকাশে উদীয়মান চন্দ্র-সূর্য নয়। এ হোলো আত্মচন্দ্র, যাকে কালাচাঁদ বলা হয় এবং আত্মসূর্য যার কথা বলতে গিয়ে গীতাতে অর্জুন বলেছেন আকাশে উদীয়মান সূর্যের মতো সহস্রসূর্য যদি একসঙ্গে উদিত হয় তবে হয়ত ওই মহান্ আত্মসূর্যের মতো হতে পারে। নারায়ণের প্রণাম মন্ত্রেও এই কথাই বলা আছে—সবিতৃ মণ্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণ ইত্যাদি। অর্থাৎ আত্মসূর্যের মধ্যে যিনি অবস্থিত সেই নারায়ণকে প্রণাম করি। যোগিরাজও সাধনার মাধ্যমে এটাই দেখছেন যে ওই আত্মসূর্যের মধ্যে কালদণ্ডসহ বাবাজী বিরাজিত। এর থেকে বোঝা গেল যে ওই আত্মসূর্যের মধ্যে যিনি বিরাজিত তিনিই নারায়ণ এবং তিনিই বাবাজী স্বয়ং। অর্থাৎ যিনি নারায়ণ তিনিই বাবাজী। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ যোগিরাজ নিজেই বলে দিয়েছেন—'যো কিস্তন সো বুড়্ঢা বাবা'। অর্থাৎ ওই আত্মসূর্যের মধ্যে যিনি অবস্থিত, যাঁর কথা নারায়ণের প্রণাম মন্ত্রে বলা আছে তিনিই কৃষ্ণ বা নারায়ণ এবং তিনিই স্বয়ং বাবাজী। অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণ তিনিই বাবাজী। এমন বাবাজীকে কি কখনো বিনা সাধনায়, সাধনার পীঠভূমি যে কূটস্থ সেখানে স্থায়ী স্থিতিলাভ না করা পর্যন্ত স্থূলভাবে যেখানে সেখানে মনুষ্য মূর্তিতে দর্শন পাওয়া কি-করে সম্ভব? বিনা সাধনায় কি কেউ কখনো কৃষ্ণ দর্শন করতে পারে? অতএব কৃষ্ণ এবং বাবাজী যখন একই, তখন তিনিই ভগবান্। বিনা সাধনায় যখন ভগবান্ দর্শন সম্ভব নয় তখন বাবাজীকেও দর্শন পাওয়া সম্ভব নয়। এর আরো প্রমাণ যোগিরাজ নিজেই দিনলিপিতে রেখে গেছেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর যখন তিনি দানাপুরে ছিলেন অর্থাৎ সাধন শুরু করার মাত্র চার বছর আড়াই মাস পরে

তিনি দিনলিপিতে লিখেছেন—'জব প্রাণবায়ু সিরকে উপর চঢ়া তব বাবাজিসে মিলা, জব বাবাজিসে মিলা তব কেয়া নহি কর সকতা হয়'। এটা তাঁর স্থূল চক্ষে স্থূল দর্শনের কথা নয়। আত্মসাধন বিনা প্রাণবায়ু মাথায় উঠতে পারে না। তাই যোগিরাজ আত্মসাধন করতে করতে যখন প্রাণবায়ু তাঁর মাথায় উঠল অর্থাৎ কূটস্থে স্থিতিলাভ করল তখনই তিনি তাঁর প্রিয় গুরুদেব বাবাজীর সহিত মিলিত হলেন। যখন এই অবস্থায় বাবাজী অর্থাৎ কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হলেন তখন তাঁর অনন্ত শক্তি লাভ হোলো, তখন তাঁর অসাধ্য আর কিছু থাকল না। অতএব এসবের দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় যে দীক্ষালাভের পরবর্তীকালে যোগিরাজ সাধনার মাধ্যমেই তাঁর গুরুদেব বাবাজী অর্থাৎ কৃষ্ণের সঙ্গে বারবার মিলিত হতেন, দর্শন হত ; কিন্তু কখনই স্থূল চক্ষে এবং স্থূল শরীরে দর্শন হয়নি। যদি হত তবে তিনি সেকথা নিশ্চয়ই গোপন দিনলিপিতে লিখে রাখতেন। অথবা তাঁর প্রিয় গুরুদেব যদি কখনো স্থূল শরীরে তাঁর গৃহে পদার্পণ করতেন তবে নিশ্চয়ই তাঁর পরিবারের লোকেরা অবশ্যই জানতে পারতেন। তাঁর স্ত্রী কাশীমণি দেবী অথবা পুত্র কন্যাগণ কখনই এমন সাক্ষ্য দেননি। অতএব রক্ত মাংসের দেহ ধারণ করে বাবাজী অর্থাৎ কৃষ্ণ কাউকে দর্শন দেবেন একথা ভ্রান্ত।

তাঁর জীবনে ব্যতিক্রম কেবল একবারই ঘটেছিল এবং তা যোগিরাজের মতো মহাপুরুষের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। সেটা হল হিমালয়ের রাণীক্ষেত অঞ্চলে তাঁর গুরুলাভ। যিনি শাশ্বত অনাদি পুরুষ সেই কৃষ্ণই মানুষের পরম মুক্তিলাভের জন্য তাঁরই প্রিয় শিষ্য অর্জুনরূপী শ্যামাচরণকে কৌশলে রাণীক্ষেত অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে যোগদীক্ষা প্রদান করেন। যেহেতু অর্জুনরূপী শ্যামাচরণ তখন মানবরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ, তখন তাঁকে যোগদীক্ষা দিতে গেলে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণকেও অবশ্যই মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হতে হয়, এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। তাই এক্ষেত্রেও ওই একবার মাত্রই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাবাজীরূপে মনুষ্যদেহ ধারণ করে শ্যামাচরণকে যোগদীক্ষা প্রদান করেছিলেন। কারণ মানুষ ছাড়া তো কখনই মানুষকে বোঝানো যায় না, কোনো কিছু প্রদান করা যায় না। তাই তাঁকেও মানুষরূপে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ গীতাতে ভগবান্ নিজেই বলে গেছেন। তিনি অর্জুনকে বলেছেন এই যোগ তিনি পূর্বে মনুকে দিয়েছিলেন ইত্যাদি। পরে কালবশে এই সনাতন যোগের যখন অবক্ষয় হোলো তখন তিনি আবার অবতীর্ণ হলেন তাঁর পরম ভক্ত অর্জুনকে সাথে নিয়ে। পুনরায় তিনি অর্জুনের মাধ্যমে এই যোগকে আবার স্থাপন করলেন। পুনরায় কালবশে যখন অবক্ষয় হোলো তখন সেই ভগবান্ কৃষ্ণই বাবাজীরূপে আবির্ভূত হলেন লোকচক্ষের অন্তরালে এবং সাথে নিয়ে এলেন অর্জুনরূপী

শ্যামাচরণকে। এই শ্যামাচরণের মাধ্যমে মানুষের মুক্তির পথ সুগম করতে তিনি সেই সনাতন অমর যোগসাধনকে বর্তমান বিশ্বে পুণঃস্থাপনা করে গেলেন। এইভাবে যুগে যুগে যখনই যোগধর্মের প্রতি মানুষের অবসাদ বা অনীহা আসে তখনই ভগবান্ তাঁর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ স্বীয় শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে আবির্ভূত হন মানব কল্যাণের জন্য। এই উদ্দেশ্যেই শ্যামাচরণের আগমন। অতএব যিনি ভগবান্ কৃষ্ণ তিনিই বাবাজী এবং যিনি মনু তিনিই অর্জুন আবার তিনিই শ্যামাচরণ। এই হোলো বাবাজী এবং শ্যামাচরণের সঠিক পরিচয়।

"এক ওক্ত হররোজ যত্তা সকে এক আসন বইঠে" ॥ ৮১ ॥

এখানে যোগিরাজ বলছেন প্রতিদিন যতক্ষণ পার অন্তত একবার একাসনে বসে আত্মক্রিয়া কর, তা হলে সব পাবে। এই ক্রিয়াযোগকে শাস্ত্রমতে বলা হয় অধ্যাত্ম-বিদ্যা আত্মবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা ইত্যাদি। এই সাধনার মূল উদ্দেশ্যই হল আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। পৃথিবীতে যত প্রকার জ্ঞান আছে তার মধ্যে এই আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। অতএব যে কর্মের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয় তাই শ্রেষ্ঠকর্ম। ক্রিয়াযোগের দ্বারা আত্মজ্ঞান অচিরে হয়। এ কারণে বর্তমান বিশ্বে যোগিরাজ প্রদর্শিত এই ক্রিয়াযোগ মানব সমাজের কাছে অত্যন্ত সুবিদিত এবং শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানরূপে পরিগণিত। যদিও এই ক্রিয়াযোগ চিরকালই ছিল তথাপি যোগিরাজ এই বিজ্ঞানকে মানব সমাজের কাছে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সহজলভ্য করে গেছেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে এই আত্মবিদ্যা ছাড়া মানুষের জীবন কখনই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এই ক্রিয়াযোগের মধ্যে কোন রকম ফাঁকিবাজির স্থান নেই। যেমন একজন ভাত খেলে অপরের পেট ভরে না, তেমনি একজনের হয়ে অপরে সাধন করলে কিছুই হবে না। ভাত যেমন নিজেকে খেতে হবে, তবেই ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে, তেমনি এই আত্মসাধন নিজেকেই করতে হবে। এই যোগসাধনের জন্য চাই ধৈর্য এবং দীর্ঘ যোগাভ্যাস। আত্মজ্ঞান সহজে হয় না, তবে এর জন্য ভীত বা দুর্বলহৃদয় না হয়ে প্রতিদিন যদি ক্রিয়াযোগ অভ্যাস করা যায় তবে আত্মজ্ঞান অচিরে হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। আমরা জ্ঞানের কথা অনেক বলি, কিন্তু সে সবই জাগতিক জ্ঞান, আত্মজ্ঞান নয়। তাই এই সব জাগতিক জ্ঞান আত্মজ্ঞান না হওয়ায় শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হতে পারে না। তাই যোগিরাজ বলেছেন জ্ঞান জ্ঞান ধ্যান ধ্যান অনেক কর কিন্তু তাতে কোনো লাভ নেই, যতক্ষণ আত্মজ্ঞান না হয়। এই আত্মধর্মরূপ যে ক্রিয়াযোগ তাই প্রকৃত ধর্ম, কারণ এর দ্বারা ইচ্ছারহিত অবস্থা লাভ হয়। যে ব্যক্তি গুরুবাক্যের

দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে এই আত্মকর্ম করে সে আপনাহতেই ইচ্ছারহিত হয়ে ব্রহ্মানন্দে নিশ্চিত স্থির হয়ে থাকে। তাই তিনি উদাত্তভাবে সকল মানুষকে আহ্বান করে বললেন যদি কোনো মানুষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি এই ক্রিয়াযোগ সাধন করুন। শাস্ত্রকারও অনুরূপ কথাই বলেছেন—'নিশ্চিন্ত যোগ উচ্যতে'। ইচ্ছা থেকেই চিন্তার উৎপত্তি হয়, আর সেই চিন্তাই মানুষকে নিশ্চিন্ত হতে দেয় না, ফলে সে যোগী হতে পাবে না, যুক্ততম অবস্থা হয় না। ক্রিয়াযোগের মাধ্যমে যখন প্রাণের চঞ্চল অবস্থা থেমে যায় তখন মন নিরুদ্ধ হওয়ায় আপনাহতেই ইচ্ছারহিত অবস্থা হয়। যখন ইচ্ছারহিত অবস্থা হয় তখন চিন্তাশূন্য অবস্থা আপনাহতে হয়। যখন চিন্তাশূন্য হয় তখন আত্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় অর্থাৎ আত্মানন্দে বিভোর হওয়ায় চিন্তামণি অবস্থা হয়। এই রকম অবস্থাপন্ন যিনি তিনিই যোগী। আর এই অবস্থা লাভের জন্য যিনি সচেষ্ট অর্থাৎ যিনি প্রতিদিন যোগাভ্যাসে রত তিনি যোগাভ্যাসী, কারণ তিনি তখনও যোগারূঢ় অবস্থা লাভ করতে পারেননি। তাই সকলেরই আপন জীবনকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আত্মক্রিয়া করা উচিত। তাই যোগিরাজ বলেছেন—'ক্রিয়া করলে মঙ্গল, না করলে অমঙ্গল'।

"অন্তরভেদ খুলা য়ানে ভিতর ভিতর শ্বাসা চলনেকা
রাহ মিলা মন ধ্যান শব্দ এহী অসল হয়—ইসিকো
যোগিলোগ গহব কহতে হয়" ॥ ৮৬ ॥

যেখানে মানুষের সমাগম বেশী, নানাপ্রকার শব্দ বা বিরক্তিকর পরিবেশ সেখানে ঈশ্বর সাধন উত্তমরূপে হয় না। তাই দেখা যায় সাধু সন্ত বা ঈশ্বর পিপাসু মানুষ ধ্যান ধারণা করার জন্য পর্বতগুহা, গভীর জঙ্গল অথবা কোনো নিরিবিলি জায়গায় বসে ঈশ্বর সাধন করেন। লোকালয়ের বাইরে এই সমস্ত নিরিবিলি জায়গার মধ্যে পর্বতগুহাই সাধনার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান বলে সাধু-সন্তেরা মনে করেন এবং সেই পর্বতগুহার নিস্তব্ধ পরিবেশে তাঁরা ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। এই রকম শান্ত বাহ্য পরিবেশ ব্রহ্মসাধনার জন্য যথেষ্ট অনুকূল এতে কোনো সন্দেহ নেই। যান্ত্রিক সভ্যতার জন্য বর্তমানে শান্ত পরিবেশ পাওয়া খুবই কঠিন, আবার ব্রহ্মধ্যান করতে চায়ই বা কজন? শাস্ত্রকার বলেছেন 'ধর্মস্যতত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং' ধর্মতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে গুহার মধ্যে অবস্থিত। এর থেকে বোঝা গেল যে শাস্ত্রকারেরা গুহায় প্রবেশ করতে বলেছেন এবং সেই গুহায় প্রবেশ করতে পারলে ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানা যাবে, কারণ ধর্মতত্ত্ব গুহায় নিহিত। এই বিশ্বে পর্বতগাত্রেই গুহা দেখা যায়। তাই অনেকে সেই

গুহায় গিয়ে সাধন করেন। আবাব অনেকে মাটিব তলায ছোট ঘর বানিয়ে বাহ্য কোলাহল থেকে দূরে অবস্থান ক'বে সাধন করেন। কিন্তু এসব পর্বতগুহায় কি ধর্মতত্ত্ব আছে? যদি থাকতো তাহলে সকলেই ওইসব পর্বতগুহা থেকে ধর্মতত্ত্ব আহরণ করতে পারত। বাস্তবে কিন্তু তা দেখা যায় না। আবার অপরদিকে শাস্ত্র বা ঋষিবাক্য মিথ্যা হবার নয়, কারণ তাঁবা যা কিছু বলেছেন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েই বলেছেন। এসব গুহায় সাধন করাব উদ্দেশ্য হোলো উপদ্রবহীন পরিবেশ নির্বাচন। পর্বতগুহা কখনোই উপদ্রবহীন স্থান হতে পাবে না। কারণ সেখানে হিংস্র জন্তুর ভয় আছে, লোকালযেব বাইবে হওযায় খাদ্য, পানীয়, চিকিৎসা ইত্যাদির অভাব আছে। এসব কথা ছেড়ে দিলেও তথাপি পর্বতগুহাকে উপদ্রবহীন বলা যায় না যদিও সেখানে লোক সমাগম নেই। আসলে সাধনার অন্তবায় সম্পূর্ণরূপে বাহ্য পরিবেশ নয়। বাহ্য পরিবেশ যতখানি বাধা দেয় তাব চেয়ে বেশী বাধা দেয় নিজেরই মন, রিপু এবং ইন্দ্রিয়গণ। এবা যদি সাধনার অনুকূল হয় বা এদেব যদি সাধনার অনুকূলে রাখা যায় তাহলে যেখানেই থাক না কেন সাধনাব ব্যাঘাত হয় না। প্রকৃত পক্ষে এরাই সাধনার সবচেয়ে বড শত্রু। এই মন, ইন্দ্রিয ও বিপুগণ কিভাবে বিরুদ্ধাচারণ করে সে বিষয়ে পূর্বে আলোকপাত করা হযেছে। এরা নিজেরই দেহের মধ্যে অবস্থান ক'রে সর্বদা শত্রুতা করে যাতে মানুষ ঈশ্বর সাধন না ক'রে পার্থিব সুখ-ভোগের দিকে আকৃষ্ট হয়। জীব যতক্ষণ পার্থিব সুখ-ভোগের দিকে আকৃষ্ট থাকে ততক্ষণ তাব পক্ষে ব্রহ্মসাধন কবা সম্ভব নয। তাই যোগিরাজ বলেছেন 'মনই ম্লেচ্ছ'। এই দেহেব মধ্যে প্রাণ যতক্ষণ চঞ্চল ততক্ষণই মনেব অস্তিত্ব। আবার এই মন যতক্ষণ চঞ্চল ততক্ষণ ইন্দ্রিয ও রিপুদেব অস্তিত্ব। অতএব যোগিরাজের মতে অন্তর্মুখী ভাবে উত্তম প্রাণকর্ম করতে থাকলে বহির্মুখী শ্বাস-প্রশ্বাসেব গতি যতই স্থিব হবে ততই মন ইন্দ্রিয রিপু সকলেই স্থির হবে ততই কূটস্থে স্থাযী স্থিতিলাভ কববে। যতই কূটস্থে স্থিতিলাভ করবে ততই ধর্মতত্ত্বকে জানা যাবে। এই কূটস্থই হোলো সাধনার পীঠভূমি; এখানে অবস্থান করলে তবেই ধর্মের মূল ও গুহ্য রহস্যকে জানা যায়। পর্বতগুহায় অবস্থান করলে লোকালয় থেকে দূরে থাকা যায় বটে, কিন্তু মন, ইন্দ্রিয় ও রিপুদের থেকে দূরে থাকা যায় না, এরা সর্বদাই সঙ্গে থাকে। পর্বতগুহার শান্ত পরিবেশ ব্রহ্মসাধনার সহায়কারী নিশ্চয়ই কিন্তু সেই গুহায় অবস্থান করলে কূটস্থে অবস্থান করা যায় না। কূটস্থে অবস্থান করতে হলে অবশ্যই অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করা প্রয়োজন, বিনা প্রাণকর্মে কূটস্থরূপী গুহায় অবস্থান করা অসম্ভব। এই কূটস্থই প্রকৃত গুহা যেখানে অবস্থান কবলে তবেই ধর্মতত্ত্বকে জানা যায়। গুহা শব্দের প্রকৃত অর্থ হোলো—গু=অন্ধকাব, হা=পরি-

ত্যাগ বা অভাব। যেখানে গেলে জীবনের চির অন্ধকারের দিক্ অর্থাৎ অজ্ঞানের দিক্ ঘুচে গিয়ে চির আলো বা জ্ঞানের প্রকাশ হয় সেটাই গুহা। প্রাণকর্মের মাধ্যমে যোগী যখন কূটস্থে অবস্থান করেন তখন তিনি আত্মজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে চিরনির্মল অবস্থায় অবস্থান করতে পারেন। তখন যারা সবচেয়ে নিকটের শত্রু এবং সর্বক্ষণের শত্রু সেই চঞ্চল মন ইন্দ্রিয় রিপু সকলেই আপনাহতে বশীভূত হয়, কর্মহীন হয় এবং থেমে যায়। তাদের আর বিরুদ্ধাচারণ করবার ক্ষমতা থাকে না। এই গুহায় যেতে গেলে কোনো প্রকার বাহ্য ত্যাগ, বাহ্যাড়ম্বরের প্রয়োজন করে না, পর্বতগুহারও আবশ্যক নেই। তাই যোগিরাজ তাঁর সাধনার প্রত্যক্ষ উপলব্ধির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করবার রাস্তা খুলে গেল অর্থাৎ ভেতরে ভেতরে সুষুম্নাপথে শ্বাস চলবার মতো অবস্থা পেলাম। অন্তর্মুখী উত্তম প্রাণকর্ম করতে করতে যখন এই রকম স্থিরাবস্থায় পৌঁছে কূটস্থে অবস্থান করলাম তখন বুঝলাম যে স্থির মনের দরুন যে ধ্যানাবস্থা লাভ হোলো এবং তখন যে ওঁকারধ্বনি শোনা গেল তাই আসল। যোগিগণ এই প্রকারে কূটস্থে অবস্থান করাকেই গুহাতে অবস্থান করা বলেন। যে যোগী এই কূটস্থরূপী গুহায় অবস্থান করেন তিনিই প্রকৃত ধর্মতত্ত্ববেত্তা এবং গুহাবাসী।

"আজ আউর বড়া স্থির ঘরকা হাল মিলা আখ আপ বন্দ হুয়া জাতা হয় আউর ব্রহ্ম সাফ দর্শন হোনে লগা—ত্রিকূটা য়ানে জিহ্বামূল—উপর তালুকা ছেদ বন্দ করতা হুয় আউর জিহ্বাকা অগ্রভাগ তালু মধ্যমে লগতা হয় আউর জিহ্বাকা মূল তালুকে নিচে লগতা হয় ইসি তরহসে বিলকুল বাহরকা শ্বাসা বন্দ হোতা হয় ধন্যভাগ উসকা জিসকো ইহ হোয়" ॥ ৮৭ ॥

রাজার ঐশ্বর্যগুলো রাজা নয়, ঐশ্বর্য দেখলে রাজাকে দেখা হয় না। তেমনি ঈশ্বরের ঐশ্বর্য ঈশ্বর নন। রাজা থাকেন রাজবাড়ীর অন্তঃপুরে, সেখানে গেলে তবে রাজাকে দেখা যায়। তেমনি কূটস্থে প্রবেশ করলে তবেই ঈশ্বরকে জানা যায়। রাজবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করতে হলে তিনটি ফটক অবশ্যই অতিক্রম করতে হয়—প্রধান ফটক, তারপর প্রাসাদের ফটক এবং শেষে রাজা যে ঘরে অবস্থান করছেন সেই ঘরের ফটক। তেমনি ঈশ্বর যেখানে বিরাজিত সেই অন্তঃপুররূপী কূটস্থে প্রবেশ করতে হলে যোগীকেও তিনটি ফটক অবশ্যই অতিক্রম করতে হয়—প্রথম ফটক জিহ্বা গ্রন্থি ভেদ, দ্বিতীয় ফটক হৃদয় গ্রন্থি ভেদ এবং তৃতীয় ফটক মূলাধার গ্রন্থি ভেদ। এই তিন গ্রন্থি

ভেদকে যথাক্রমে ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ, বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ এবং রুদ্রগ্রন্থি ভেদ বলে। যে যোগী এই তিন গ্রন্থি অতিক্রম করতে পারেন তিনিই ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করতে পারেন। এই তিন গ্রন্থি ভেদ না হওয়া পর্যন্ত ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করা অসম্ভব এবং যোগকর্ম ব্যতীত এই তিন গ্রন্থি ভেদ কখনই হয় না, তাই যোগকে শাস্ত্রকারগণ সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। এই তিন গ্রন্থির মধ্যে যোগীকে প্রথমে জিহ্বাগ্রন্থি ভেদ করতে হয়। তারপর হৃদয়গ্রন্থি এবং শেষে মূলাধারগ্রন্থি। নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্চতে, নিশ্চল অবস্থাটাই যেহেতু ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মকে লাভ করতে হলে জীবকেও নিশ্চল হতে হবে। যেহেতু জীবের বর্তমান অস্তিত্ব চঞ্চল তাই তার প্রাণবায়ুও চঞ্চল। একারণে জীব কিছুতেই নিশ্চল হতে পারে না বা নিশ্চল অবস্থার হদিস পায় না। অতএব সর্বাগ্রে প্রাণবায়ুকে তথা দেহস্থ উনপঞ্চাশ বায়ুকে স্থির করা প্রযোজন। স্থির করতে পারলে শূন্যতাকে লাভ করা যায়, সেই শূন্যতাই ব্রহ্ম। বলপূর্বক দেহস্থ এই বায়ুগুলোকে বোধ করা যায় না বা রোধ করলেও ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তাই যোগী বিজ্ঞানসম্মত উপাযে দেহস্থ এই বায়ু সকলকে, বিশেষ করে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিকে রুদ্ধ করবার জন্য বিশেষ উপায অবলম্বন করেন, যা কবলে কোনো প্রকার হানি হয় না বরং উপকার হয়। তাই যোগী জিহ্বাগ্রন্থি ভেদের মাধ্যমে জিহ্বাকে তালুমূলে প্রবেশ করান। জিহ্বাকে তালুমূলে প্রবেশ করাতে পারলে আপনাহতেই এক শূন্যস্থান (vacuum) সৃষ্টি হয়। তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের বহির্মুখী গতি আপনাহতেই অবরুদ্ধ হয়। এ অবস্থায় কোনো কষ্ট হয় না। তখন যা অল্পস্বল্প শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বহির্মুখী অবশিষ্ট থাকে প্রাণকর্মের মাধ্যমে যোগী সেটুকুও অবরুদ্ধ করে শূন্যপদে নিশ্চল ব্রহ্মের সঙ্গে অনায়াসে যুক্ত হন। সাধনার এইরকম প্রত্যক্ষ উপলব্ধির কথা বলতে গিয়ে যোগিরাজ বলেছেন যে আজ আরো অধিক স্থির ঘরের হদিস পেলাম কারণ শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি অবরুদ্ধ হয়েছে। এ অবস্থায় চক্ষুদ্বয় আপনাহতেই বন্ধ হয়ে গেল এবং স্থির শূন্যব্রহ্ম আরো পরিষ্কার দর্শন হতে লাগলো। ত্রিকূট অর্থাৎ জিহ্বামূল বা জিভের গোড়া। মুখের মধ্যে অবস্থিত যে জিভ (Tongue) তা যখন ওপরে উঠে তালুকুহরের ছিদ্র বন্ধ করে তখন জিভের ডগা তালুর মধ্যভাগে প্রবেশ করে এবং জিহ্বামূল বা জিভের গোড়া তালুর নিচে লেগে থাকে। যখন এই অবস্থা হয় তখন আপনাহতেই ভেতরে শূন্যস্থান (Vacuum) নির্মিত হয়। এই অবস্থাকেই খেচরী বলে। এই প্রকার খেচরী অবস্থায় রেচক পূরকরূপ প্রাণকর্ম করতে থাকলে যেটুকু অভ্যন্তর গতি বজায় থাকে তাও নিশ্চল হয়ে বাইরের আগম-নিগমরূপ শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে 'কেবল কুম্ভক' প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অবস্থা সহজলভ্য নয় অর্থাৎ সকলের চট্ করে হয় না। এই অবস্থা লাভ করতে হলে যথেষ্ট অধ্যাবসায়

বা অনুশীলন প্রয়োজন। তাই তিনি বলেছেন ধন্য ভাগ্য তার যার এইরকম বা এই প্রকারে 'কেবল কুম্ভক' হয়। তাঁর বলার উদ্দেশ্য হোলো এইপ্রকার 'কেবল কুম্ভক' অবস্থা লাভ না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চল ব্রহ্মে অবস্থান করা যায় না। যোগী যখন এইরকম কেবল কুম্ভক অবস্থা লাভ করেন তখন তিনি আপনাহতেই অনন্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অনন্ত শক্তি সম্পন্ন হন। জিহ্বাগ্রন্থি ভেদ করলেই যে এই অবস্থা লাভ হবে তা নয়। জিহ্বাকে তালুকুহরে স্থাপন করে যোগীকে অন্তর্মুখী বহু প্রাণকর্ম করতে হবে, তবেই কেবল কুম্ভক সিদ্ধ হবে। এর এক নিখুঁত হিসাব দিয়ে যোগিবাজ বলেছেন—'দশলাখ একষট হাজার প্রাণাযাম মে কেবল কুম্ভক সিদ্ধ হোতা হয়'।

"বৃষাকারকে উপর মহাদেব চঢ়নে গএ আউর ক্যা বাহন প্রথিবি নহিথা—বৃষাকার য়ানে ইহ শরীবরূপি বৃষ ইসকা দুই সিং প্রাণায়ামকে হওয়া সে নিকসতা হয়—আউর কাম বর্জিত হোতা হয় ইসলিএ ইহ শরীবকো বএল কহতে হয় ইসিকে উপর মহাদেব হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম" ॥ ৮৮ ॥

মহাদেবের বাহন বৃষ। বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম। ধর্ম অর্থে যিনি সবকিছু ধারণ করে আছেন, প্রাণই সবকিছুর ধারণকর্তা, প্রমাণ—'প্রাণেন ধার্যতে লোকঃ'। ওই বৃষের চারটি পা—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। বৃষের চতুষ্পদ ধর্মের চারপাদের প্রতীক, তাই বৃষকে মহাদেব বাহনরূপে নির্বাচন করেছেন। দিব্ শব্দে আকাশ। তাই মহাদেব অর্থে মহান্ আকাশ অর্থাৎ স্থির মহাশূন্য যা সর্বত্র ব্যাপ্ত। ধর্মের এই চারপাদের গুহ্য রহস্যের কথা বলতে গিয়ে শাস্ত্রকার বলেছেন—'চতুষ্পাৎ সকলো ধর্মঃ সত্যঞ্চৈব কৃতে যুগে। নাধর্মেণাগমঃ কশ্চিন্মনুষ্যান্ প্রতিবর্ত্ততে॥' (মনুরহস্য ১/৮১)। ধর্ম চারিপাদে বিভক্ত—১ম পাদ জিহ্বাগ্রন্থি ভেদ, ২য় পাদ হৃদয়গ্রন্থি ভেদ, ৩য় পাদ নাভিগ্রন্থি ভেদ এবং ৪র্থ পাদ মূলাধারগ্রন্থি ভেদ, ধর্মের এই চার পাদ; সকল, স—সর, দন্ত্যসকারের মত শব্দ করা, ক—মস্তক, ল—ব্রহ্মে জোর অর্থাৎ সশব্দে মস্তক হতে জোর দিয়ে ক্রিয়া করা; সত্য অর্থাৎ কূটস্থ, পরে একাকার, তারপরে বিজ্ঞান এবং সকলের শেষে সমাধি। তখন মনেতে মন মিশে যায়। এই চার প্রকার সত্য যোগে ব্রহ্মস্বরূপ বোধ হয়। না ধর্মে—অধর্মেতে, আগম—স্থিতি, কশ্চিৎ—কখনই হয় না, পুরুষ—শ্রেষ্ঠ কূটস্থদর্শীরা যা দেখছেন। অর্থাৎ অধর্মেতে অর্থাৎ ক্রিয়া ব্যতিরেকে কূটস্থে স্থিতি কখনই হয় না যা শ্রেষ্ঠ ক্রিয়াবানেরা দেখছেন।

শাস্ত্র বর্ণিত যে সব বাহ্য ব্যাখ্যা তাতে দেখা যায় মহাদেব তাঁর বাহন বৃষের ওপরে

চড়ে যাতায়াত করেন। আসলে মহাদেবের এই বৃষ ষাঁড় নয়। তাই যোগিরাজ বলেছেন—বৃষের ওপর মহাদেব চড়তে যাবেন কেন ? তাঁর পৃথিবীরূপী বাহন কি ছিল না ? অর্থাৎ যে মহাদেব সর্বত্র ব্যাপ্ত তিনি সামান্য একটি ষাঁড়ের ওপর চড়তে যাবেন কেন ? এখানে বৃষের দেহ হোলো শরীরের প্রতীক তার চারটে পা হোলো চার গ্রন্থি ভেদের প্রতীক এবং দুটি শিং হোলো ইড়া পিঙ্গলার প্রতীক। এ সবই এই মনুষ্য শরীরে আছে, তাই এই শরীরকে বৃষ বলা হয়। এই শরীরের মধ্যেই মহাদেব আছেন অর্থাৎ স্থিরপ্রাণরূপী ব্রহ্ম। যোগী অন্তর্মুখী প্রাণকর্মের মাধ্যমে যতই স্থিরত্বের দিকে এগিয়ে যান ততই কামবিবর্জিত অবস্থা লাভ হয়। তাই যোগিরাজ বলছেন তোমার ভেতরে সকল তত্ত্ব নিহিত আছে যা বিভিন্ন দেব-দেবীর মাধ্যমে রূপকের ছলে শাস্ত্রকারগণ বোঝাতে চেয়েছেন, তা সদ্গুরুর নিকট উপদিষ্ট হয়ে এই সনাতন যোগ সাধন করতে থাক, তাহলে ধর্মতত্ত্বের সকল রহস্য জানতে পারবে। বিনা যোগসাধনায় এই সব গুহ্য তত্ত্ব কেউ কোনদিন জানতে পারেনি, পারবে না। সকল দেব-দেবীর বাহন এই যোগ সাধনারই প্রতীক জেনো, যা তোমার ভেতরেই আছে। আত্মক্রিয়া করতে করতে স্থূল পঞ্চ ভৌতিক দ্রব্যের লোপ হয়ে সূক্ষ্ম ব্রহ্মস্বরূপ সকলেতে দেখে, আত্মার এই প্রথম পাদ। তারপর সকল হতে পৃথক নির্জনে অর্থাৎ কেবল আত্মাতেই থাকতে ইচ্ছা, এই দ্বিতীয় পাদ। পরে সুষুপ্তি, ক্রিয়ার পরাবস্থায় যখন কোনো প্রকার কামনা-বাসনা থাকে না, যখন এক হয়ে যাওয়ায় প্রকৃত জ্ঞান, যখন কিছুই নেই এরকম নিশ্চিত বোধ হয়, যখন আনন্দেতে ছিলাম এরকম বোধ হয়, সর্বদা ব্রহ্মে যুক্ত এরকম জানা, তখন তৃতীয় পাদ। কিন্তু যখন জানাজানি নেই, দেখাদেখি নেই, ব্রহ্মে আছি কি নেই কিছুই জানা যায় না যখন সর্বত্র এক, তখন শিবস্বরূপ অদ্বৈত, তখন চতুর্থ পাদ। এই হোলো সাধন চতুষ্টয়। অতএব সকল ইন্দ্রিয় ও রূপের অধিষ্ঠাতা আত্মাকে জান এই হোলো পূজা ও ধ্যান।

"মন জাসনে মন জাসনে জাসনেরে কোথা।
মন দিয়ে মনকে দেখলে হবে সকল বৃথা।" ॥ ৮৯ ॥

মনই সব। এই মনের দ্বারাতেই সুকাজ এবং কুকাজ উভয়ই করা যায়। মন যদি স্ববশে না থাকে তাহলে জঘন্যতম কাজও মানুষ করতে পারে, আবার যদি অধীনে থাকে তাহলে চরম মঙ্গল কাজও করা যায়। মনের ক্ষমতা অসীম। এই মন মানুষকে নরকেও নিয়ে যেতে পারে আবার আত্মসাধন করিয়ে নিশ্চল অনন্ত

ব্রহ্মে লয় ঘটাতেও পারে। ঈশ্বর এই একটা বিষয়েই মানুষকে কিছুটা স্বাধীনতা দিয়েছেন যে সে কোনদিকে মনটাকে পরিচালিত করবে। মানুষ যদি মনকে আত্মসাধনে নিয়োজিত করে তবে সে অনন্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে অনন্ত শক্তি লাভ করতে পারে এবং নিজেও অনন্ত হতে পারে এতে কোনো সন্দেহ নেই। কেবল কোনদিকে নিয়োজিত করবে সেটা মানুষের নিজের সিদ্ধান্ত। সুচতুর মানুষ, আত্মজ্ঞান পিপাসু মানুষ এই পথেই নিজেকে নিয়োজিত করার চেষ্টা করে, তাই সে সদাই আত্মসাধনে (প্রাণকর্মে) রত থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এরকম সুচতুর মানুষ বড় কম দেখা যায়। মনের ধর্মই হোলো এটা চাই ওটা চাইরূপ আসক্তির দিকে টেনে রাখা। যেহেতু চঞ্চল প্রাণই হোলো চঞ্চল মন এবং প্রাণের চঞ্চলতা থেকেই এই জগতের উৎপত্তি তাই চঞ্চল প্রাণ এবং চঞ্চল মনের জগতের বস্তুর দিকে টান থাকাটা স্বাভাবিক। তাই মন সর্বদাই স্থূলত্বের দিকে আকর্ষিত হয়। তাই যোগিরাজ বলেছেন মন যেন কখনো পার্থিব সুখের দিকে আকর্ষিত না হয়। মন দিয়ে যদি মনকে দেখা যায় অর্থাৎ চঞ্চল মনকে প্রাণকর্মের দ্বারা থামিয়ে স্থির মনে রূপান্তর করা যায় তাহলে সবই বৃথা হয় কারণ যে মন জাগতিক সুখ ভোগের দিকে আকর্ষিত হত তার সেই আকর্ষণ রহিত হওয়ায় এই সব সুখ ভোগ বৃথা হয়। মনের বিষয়ে ৫৭ এবং ৫৮ শ্লোকে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

"ইন্দির কর্ম্ম ইন্দ্রি করে,
মন কেন কেঁদে মরে ;
আছাড় খেয়ে পড়ে মরে,
মধ্যে মধ্যে নকল করে" ॥ ৯০ ॥

আয়নার সামনে যা কিছু রাখা যায় তার প্রতিচ্ছবি প্রতিভাসিত হয়। মনও ঠিক আয়নার মত। পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় এবং পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মন দশ দিকে অর্থাৎ সকল দিকে ধাবিত হয় এবং ওই দশ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই মন সবকিছু দেখে, করে ও প্রতিভাসিত হয়। ওই দশ ইন্দ্রিয়ই হোলো মনরূপী প্রধান ইন্দ্রিয়ের প্রকাশের পথ। ওই দশ ইন্দ্রিয় না থাকলে মনের একক কিছু করবার ক্ষমতা নেই। মন এবং ইন্দ্রিয়দের মধ্যে বড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মন যেমন ইন্দ্রিয়গণ ছাড়া প্রকাশ হতে পারে না, তেমনি ইন্দ্রিয়গণও মনকে ছাড়া বাঁচতে পারে না। যে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ নেই সে ইন্দ্রিয় মৃতবৎ হয়। তাই মন সকল ইন্দ্রিয়ের অধিপতি এবং ইন্দ্রিয়গণ মনের প্রকাশের স্থান। এইভাবে উভয়ে উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে

অবস্থান করে। এই মনের ভালো-মন্দ বিচারবোধ নেই, তাই সে সদাই অন্ধ অর্থাৎ জন্মান্ধ। তাই মনই হোলো ধৃতরাষ্ট্র। এই মন বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়। বুদ্ধি তাকে নির্দেশ করে কখন কি করতে হবে। এই বুদ্ধির আবার দুটো দিক আছে— সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি। সুচতুর যোগী সুবুদ্ধিকে আশ্রয় করেন, কারণ সুবুদ্ধির অধীনে মন ইন্দ্রিয় সকলেই থাকে। যখন যোগী সুবুদ্ধিকে আশ্রয় করেন তখন মন ইন্দ্রিয় সকলেই বশীভূত হয়। এ অবস্থায় যোগীর মন এবং ইন্দ্রিয়গণ কর্মরত থাকলেও তাদের দিকে আর খেয়াল থাকে না। তখন যোগীর চক্ষু দেখেও দেখে না, কান শুনেও শোনে না, নাসিকা ঘ্রাণ নিয়েও নেয় না, রসনা স্বাদ গ্রহণ করেও করে না ইত্যাদি এমন এক অবস্থা আপনাহতেই হয়। এ অবস্থা লাভ করাটা সম্পূর্ণরূপে প্রাণকর্মসাপেক্ষ। উত্তম প্রাণকর্ম করতে থাকলে দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু সকল আপনাহতেই স্থিরত্ব অভিমুখে যায় এবং যোগী অনায়াসে বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন। যখন যোগী বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করেন তখন তাঁর মন ও ইন্দ্রিয়গুলো আপনাহতেই উদাস ভাবগ্রস্থ হয়। তখন ইন্দ্রিয়দের কাজ ইন্দ্রিয়রা করছে, আমি কিছু করছি না, আমি তাতে জড়িত নই এরকম একটা উদাস অবস্থা আপনাহতেই উদিত হয়। কারণ যোগী তখন এক প্রগাঢ় নেশার মধ্যে অবস্থান করেন। নেশাখোর ব্যক্তি কিছু করেও যেমন তার মনে থাকে না, যোগীরও এরকম অবস্থা হয়। প্রাণ চঞ্চল হলেই বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয় সকলেই উদিত হয়। এ অবস্থায় মন চঞ্চল থাকে। এই চঞ্চল মনের ধর্মই হোলো সে ইন্দ্রিয়দের মাধ্যমে যা দেখবে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দের মাধ্যমে যা কিছু তার সামনে উপস্থিত হবে তাকেই সে নকল করবে। এইভাবে চঞ্চল মন নিজের ভাবসাম্য হারিয়ে এদিক থেকে ওদিক আছাড় খেয়ে মরে। কিন্তু উত্তম প্রাণকর্ম করতে থাকলে ওই চঞ্চল মন যখন স্থির হয় তখন আর কিছু থাকে না। এই কিছু না থাকা অবস্থাটাই ব্রহ্ম, কারণ স্থির বুদ্ধির পর একমাত্র নিশ্চল ব্রহ্মই আছে, আর কিছু নেই। তাই যোগিরাজ বলছেন ইন্দ্রিয়দের কর্ম ইন্দ্রিয়গণ করুক, সেদিকে কখনো লক্ষ্য কোরো না; তোমার কাজ একমাত্র ক্রিয়া করা, তাই তুমি করতে থাক তাহলে সব বশীভূত হবে।

"উলট পবনকা ঠোকর মারে খোলে দরওয়াজা" ॥ ৯১ ॥

কোন রাজবাড়ী, গৃহ অথবা মন্দিরে প্রবেশ করতে হলে অবশ্যই কয়েকটি ফটক বা দরজা অতিক্রম করতে হয়, তবেই রাজা গৃহস্বামী অথবা বিগ্রহের দর্শন লাভ হয়। তেমনি দেহরূপ মন্দিরের যিনি অধিষ্ঠাতা দেহী (আত্মা) তাঁকে দর্শন করতে হলে

এই দেহরূপ মন্দিরের যে প্রধান তিনটি ফটক আছে সেই ফটকগুলো খুলে তবেই প্রবেশ করতে হয়। এই ফটকগুলোই প্রধান বাধা, এদের না খোলা পর্যন্ত অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করা যায় না এবং প্রবেশ না করা পর্যন্ত দেহী বা আত্মার সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। এই প্রধান তিন ফটক হোলো—জিহ্বা গ্রন্থি, হৃদয় গ্রন্থি এবং মূলাধার গ্রন্থি ; এছাড়া আরো কয়েকটি ছোটো ছোটো গ্রন্থি আছে কিন্তু এই তিনটিই প্রধান। তাই যোগী গুরুপদেশ অনুসারে এই তিন গ্রন্থিকে ভেদ করবার চেষ্টা করেন। যোগীকে প্রথমে জিহ্বাগ্রন্থি ভেদ করতে হয়, তারপর হৃদয়গ্রন্থি এবং শেষে মূলাধারগ্রন্থি। এই গ্রন্থি ভেদ সম্বন্ধে (৮৯) নম্বর শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। জিহ্বাগ্রন্থি ভেদ হলে দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু স্থির হয় এবং খেচরী সিদ্ধ হয়। হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হলে জ্ঞানের প্রকাশ হয়, এটাই মহিষাসুর বধের ক্রিয়া। সকলের ভেতরে এই মহিষাসুর বর্তমান, যে ঈশ্বর সাধন পথে চলতে দেয় না। এই মহিষাসুর হোলো ক্রোধ হিংসা অহংভাব ইত্যাদির প্রতীক। যোগী যখন গুরুপদেশে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করতে পারেন তখন আপনাহতেই এইসব আসুরিক বৃত্তি সকল নিধন হয়। কিন্তু এই হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হবে কেমন করে? এ বিষয়ে যোগিরাজ সাধনার গুহ্যতম রহস্যপূর্ণ কয়েকটি কথা বলেছেন, যা এখানে কিছুটা আলোচনা করা হোলো, তথাপি এগুলি সম্পূর্ণরূপে সদ্‌গুরুর নিকট লাভ করতে হয়, কেউ যেন কখনো বই পড়ে বা আন্দাজে এ কর্ম না করেন। জিহ্বাগ্রন্থি ভেদের পর যখন শূন্যে অবস্থান করার পদ্ধতি (Vacuum) বা স্থির বায়ুতে থাকার উপায় দীর্ঘ প্রাণায়ামের মাধ্যমে যোগী অর্জন করেন তখনই তিনি সদ্‌গুরুর নিকট হৃদয়গ্রন্থি ভেদের সাধন লাভ করতে সমর্থ হন। এরপর সদ্‌গুরু প্রদর্শিত এই সাধন করে যোগী যখন হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করতে পারেন তখন তিনি জ্ঞানের পূর্ণ পরাকাষ্ঠা হন! এই অবস্থাপন্ন যোগী তখন যা কিছু বলেন সবই সত্য হয়, কারণ তিনি তখন নিজেই পূর্ণসত্যে প্রতিষ্ঠিত হন।

দেহের মধ্যে যে স্থির প্রাণ তিনি চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ায় চঞ্চল বায়ুরূপে এই দেহেই অবস্থান করেন। সহস্রার হতে কূটস্থ পর্যন্ত এই প্রাণ স্থিররূপে অবস্থান করেন এবং কূটস্থের নিচে ক্রমান্বয়ে চঞ্চলতা অধিক হয়। তাই জীবের মন সর্বদাই নিচের দিকে থাকতে বাধ্য হয়। আত্মকর্মের দ্বারা নিচের দিক থেকে চঞ্চল বায়ু সকলকে যতই গুটিয়ে নিয়ে স্থিরত্ব অভিমুখে ওপরের দিকে যাওয়া যায় ততই যোগী স্থির হন, নিশ্চল হন। এইপ্রকারে যখন বায়ু সকল স্থিরত্ব লাভ করে তখন যোগী সদ্‌গুরু প্রদর্শিত স্থির বায়ুর ক্রিয়া, যাকে ঠোকর ক্রিয়া বা হৃদয়গ্রন্থি ভেদের ক্রিয়া বলে সেই সাধন করে হৃদয়ে অবস্থিত যে ফটক তা খুলে ফেলতে সক্ষম হন। তাই যোগিরাজ

বলেছেন বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উলটা অর্থাৎ নিচের চঞ্চল বায়ুকে স্থির করে ওপরে উঠিয়ে হৃদয়-গ্রন্থিতে বার বার ঠোকর অর্থাৎ ধীরভাবে আঘাত করতে থাক তা হলেই হৃদয়গ্রন্থিরূপ দরজা আপনাহতেই খুলে যাবে। যোগসাধনার এই প্রকার কৌশল কর্মকেই 'উল্টা জপতি বাম' বলে। এই গুহ্যতম সাধন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তিনি আরো বলেছেন —'ওঁ জোরসে ধক্কা দেনেসে তব দরওয়াজা খুলেগা'। এই স্থির বায়ুর ক্রিয়াকে ওঁকার ক্রিয়া বলে। এই ওঁকার ক্রিয়ার দ্বারা হৃদয়ে জোরে অথচ ধীরে ধাক্কা দিলে তবেই দেহমন্দিরের হৃদয় দরজা খুলে যায়। এ বিষয়ে তিনি আরো পরিষ্কার করে বলেছেন—'ওঁ জেয়াদা জোরসে হৃদয়মে ঠোকর মারনেসে আপসে আপ নেসা হোয় ও ঠহর জেয়াদা হোয়। জোরসে ওমে ঠোকর মারনেসে জেয়াদা স্থির হোতা হয়"। অধিক প্রাণকর্মের মাধ্যমে যখন বায়ু স্থির হয় তখন এই ঠোকর ক্রিয়ারূপ ওঁকার ক্রিয়া বলপূর্বক অথচ ধীরে করতে থাকলে আপনাহতেই হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয় এবং কঠিন মধ্যদরজা খুলে যাওয়ায় সমস্ত প্রকার অজ্ঞান দূরীভূত হয়। এই ঠোকর ক্রিয়া করতে থাকলে আপনাহতেই এমন এক গাঢ় নেশার উদয় হয় যে তখন যোগী সেই নেশার ঘোরে এই কর্ম করতে থাকেন এবং সেই অচিন্ত্য স্থির ঘরে অধিক সময় অবস্থান করতে পারেন। এইরকম অবস্থাপন্ন নেশাখোর যোগী আপনাহতেই পরের দুঃখে কাতর হন এবং সকল জীবের অনন্ত দুঃখ নিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করেন। এই প্রকার অবস্থাপন্ন যোগীই একমাত্র জীবের দুঃখ নাশ করতে সক্ষম হন। যদি কোনো মানুষ সাধনার মাধ্যমে এইপ্রকার অবস্থা লাভ করতে না পারেন তবে তার দ্বারা জীবের অনন্ত দুঃখ লাঘব করা বা দূর করা কখনই সম্ভব নয়। তাই যোগিরাজের আদর্শ হোলো অপরের দুঃখ অবশ্যই নাশ করতে হবে কিন্তু তার পূর্বে নিজের দুঃখ নাশ কর। যতক্ষণ তুমি নিজেই চঞ্চলতার স্রোতে দোদুল্যমান ততক্ষণ তোমার নিজের দুঃখের নাশ হয়নি, অতএব কেমন করে পরের দুঃখ নাশ করবে? তাই তিনি কঠোরভাবে বলেছেন এই আত্মসাধনের মাধ্যমে প্রথমে নিজের চঞ্চলতারূপ অনন্ত দুঃখকে নাশ কর, তারপর অপরের দুঃখ নাশের চেষ্টা কর। কারণ চঞ্চলতাই দুঃখ এবং স্থিরত্বই সুখ। আগে নিজে সুখ লাভ কর তারপর অপরকে সুখ লাভের পথ দেখাও।

———

"সপ্তঋষি ও চারমনু দেখা" ॥ ৯২ ॥

সপ্তঋষি ও চারমনু দেখলাম। সপ্তঋষি—ভৃগু, অত্রি, অঙ্গিরা, মরীচি, পুলস্ত্য, পুলহ এবং ক্রতু। মনু—ব্রহ্মার পুত্র, মনুষ্য জাতির আদি পুরুষ। চতুর্দশ মনুর

কথা জানা যায়—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সার্বণি, দক্ষসার্বণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি। কিন্তু যোগিরাজ চারমনু দেখছেন। এবিষয়ে শ্রীভগবান্ বলেছেন—

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।

মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥ (গীতা ১০/৬)

অর্থাৎ সাত মহর্ষি, তাঁদেরও পূর্ব্ববর্ত্তি চারজন—সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার ; চোদ্দজন মনু এনারা সকলে আমার প্রভাবযুক্ত এবং হিরণ্যগর্ভরূপ আমারই সংকল্প হতে উৎপন্ন হয়েছেন এবং এই জগতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সমস্ত লোক যাঁদের সন্তান। এখানে যোগিরাজ পূর্ব্ববর্ত্তী ঐ চারমনুকে অর্থাৎ সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমারকে দেখছেন।

এখানে ভগবান্ হাত পা বিশিষ্ট মনুষ্য মূর্তি ঋষির কথা বলেননি। এই সব ঋষিরা হলেন প্রাণেরই উপাধি মাত্র। মুখ্য প্রাণ বায়ু সাতপ্রকার গুণবিশিষ্ট হয়ে সাত প্রকার কার্যকারীতারূপে সাতবায়ু আকারে দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত। এই সাত প্রধান বায়ু× সাত কার্যকারীতা (৭ × ৭ = ৪৯) রূপে ৪৯ বায়ুর প্রকাশ হয়। এই সাত বায়ুগণ হোলো—প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান, গান্ধারী নাড়ীস্থ স্থিরবায়ু এবং হস্তিনী নাড়ীস্থ স্থিরবায়ু। এই সাত বায়ু প্রত্যেকেই সাতগুণ বিশিষ্ট বা সাত উপাধি বিশিষ্ট হন যথা সংবহ, সমীর, অজগৎ, সকম্পন, আবক, চঞ্চল, পৃষতাংপতি। অতএব মূল এই সাত বায়ুই সাত মহর্ষি - মহৎ + ঋষি = মহর্ষি। শাস্ত্রমতে প্রাণই মহৎ, প্রাণ অপেক্ষা মহৎ আর কিছু নেই ; একারণে মূল প্রাণ হতে স্বয়ং বা সরাসরি উৎপন্ন যে প্রধান সাত বায়ু তাই সাত মহর্ষি পদবাচ্য, কোনো মনুষ্য বিশিষ্ট নয়। অতএব প্রাণই সাত বায়ুরূপে সাত মহর্ষি পদবাচ্য এবং প্রাণই চার মনু। এই সাত বায়ু মূলতঃ স্থির কিন্তু যখন কার্যকারীরূপে ব্যক্ত তখন চঞ্চল। সাধারণ মানুষ একটু চেষ্টা করলে এই কার্যকারী ব্যক্ত রূপটাকে জানতে পারে কিন্তু এদের স্থির অবস্থাটাকে জানতে পারেনা। যোগী প্রাণকর্মের মাধ্যমে যতই স্থিরত্ব অভিমুখে অগ্রসর হন ততই এই সাতবায়ুর কার্যকারী অবস্থার অতীতে এদের স্থিরাবস্থার উপলব্ধি হয় অর্থাৎ যোগী যখন নিশ্চল হন কেবল মাত্র তখনই এই সাত প্রধান বায়ুর স্থিরাবস্থাকে জানতে দেখতে বা উপলব্ধি করতে পারেন। অতএব মুখ্য প্রাণই সাত বায়ুরূপে সাত মহর্ষি।

মনু অর্থাৎ মন, চঞ্চল মন। এই মনও স্বয়ম্ভু ; কারণ মনের উৎপত্তি ওই মুখ্য প্রাণ হতেই। প্রাণের চঞ্চলাবস্থায় চঞ্চল মনের উৎপত্তি হয় এবং প্রাণ স্থির হলে বর্তমান এই চঞ্চল মন স্থির হয়। এই মনের প্রকাশ এবং সাতবায়ুর বিস্তার কর্তৃক

দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে সকল সৃষ্টি ব্যক্ত হয়; আবার বায়ু স্থির হলে সবই লয় প্রাপ্ত হয়। তাই বলা হয়েছে সাত মহর্ষি ও চার মনু আমার ভাব হতে মনেতে জাত অর্থাৎ আমারই প্রভাব বিশিষ্ট এবং আমারই সঙ্কল্প মাত্র হতে জাত। এই মনোরূপ মনু চার যুগেই উৎপন্ন হন, তাই বলা হয়েছে 'চত্বারঃ মনবঃ' অর্থাৎ অজপারূপ কাল যা অবিচ্ছেদ্যভাবে চলছে তা কখনো সত্ত্ব গুণে, কখনো রজঃ গুণে, কখনো তম গুণে এবং কখনো রজস্তম গুণে থাকে; এই সব কালের মিলন অবস্থার নাম যুগ। সেই চার যুগে অর্থাৎ ওই চার গুণের প্রত্যেক গুণেতেই যে চঞ্চল মনের উদয় হয় তাই চার মনু। মনের এই চারপ্রকার গুণভেদ এবং সাত বায়ু স্ব স্ব গুণ দ্বারাই দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের সকল সৃষ্টি সাধিত হয় বা বজায় থাকে এবং এরা সকলে মূল প্রাণ হতে জাত বলে সকলেই মূল প্রাণের প্রভাব বিশিষ্ট। অতএব যোগিরাজ যে সাত মহর্ষি ও চার মনুর কথা বলেছেন তা হোলো ওই সাত বায়ু এবং চার চঞ্চল মনের গুণগত তত্ত্ব বা কার্য্যকরী অবস্থা। এরা সকলেই এই দেহে অবস্থিত। এঁরা এই দেহে আছেন বলেই এই দেহ বজায় থাকে এবং পরবর্তী সকল সৃষ্টি হয়। দেহের মধ্যে প্রাণের এই বিভাগগুলো আছে বলেই পিতা-মাতা হতে সন্তান উৎপন্ন হয়। যদিও মূলকর্তা প্রাণ তথাপি এই বিভাগগুলো না থাকলে সন্তান উৎপন্ন হয় না। তাই এই বিভাগগুলোকে মনুষ্যজাতিব পূর্বপুরুষ বলা হয় অর্থাৎ এই জগতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সমস্ত লোক এঁদের সন্তান। যোগিরাজের এই যে সাত মহর্ষি ও চার মনু দর্শন এ বিষয়ে গীতায় দশ অধ্যায়ের সাত শ্লোকে ভগবান্ পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে আমার এই বিভূতি অর্থাৎ উনপঞ্চাশ বায়ুব বিস্তাররূপে যে প্রকাশ অবস্থা এবং তার স্থিরাবস্থারূপ লয়ের অবস্থা যিনি তত্ত্বতঃ জানেন তিনি অচল সমাধিতে যুক্ত হন অর্থাৎ প্রাণের মূল তত্ত্বকে জ্ঞাত হয়ে প্রাণের স্থিরাবস্থায় সমাধিতে অবস্থিত হন এতে কোনো সন্দেহ নেই। যোগিরাজ এই মূল তত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁকে বর্তমান কালের অন্যতম ঋষি বলা হয়।

> "ক্রিয়া স্বরূপ নৌকায় আরোহণ করিতে করিতে চঞ্চল মন স্থির হইয়া যায় এবং ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় যত পাপ আছে সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায়" ॥ ৯৩ ॥

জীবন নদীর ন্যায়; নদী যেমন বয়ে যায়, জীবনও তেমনি বয়ে যায়। নদীব বয়ে যাওয়ার মূলে যেমন স্রোত, তেমনি জীবন বয়ে যাওয়ার মূলে প্রাণের অনন্ত প্রবাহ। প্রাণের এই প্রবাহটাই জীবন এবং সমস্ত কর্মের মূল। ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাণের এই প্রবাহ যখন চলে যায় তখন প্রাণ স্থির হয়। এই স্থিরাবস্থায় আর কোনো কর্ম থাকে না,

এই অবস্থাটাই ব্রহ্ম। যতক্ষণ প্রাণ চঞ্চল থাকে ততক্ষণ কর্ম বর্তমান থাকায় জীব পাপ-পুণ্যে লিপ্ত হয়। কিন্তু স্থিরাবস্থায় কর্ম না থাকায় পাপ-পুণ্য কিছুই থাকে না। পাপ-পুণ্য আর কিছুই নয়, কেবল কর্মের ফলভোগ মাত্র। কুকর্মে পাপ এবং সুকর্মে পুণ্যফল ভোগ হয়, আবার ভোগের অন্তে পুনরাবর্তন হয়। বিষ্ণুলোক ব্রহ্মলোক ইত্যাদিতে অবস্থান এও পুণ্যফলের ভোগমাত্র। পুণ্যফল ভোগান্তে এখান থেকেও পুনরাবর্তন অবশ্যম্ভাবী, কারণ এসব ফলভোগের অন্তর্গত। তাই যোগী এইসব লোকের প্রত্যাশা না করে কেবল প্রাণকে নিশ্চল করার চেষ্টা করেন, কারণ যোগী জানেন যে প্রাণের ওই নিশ্চলাবস্থায় আর কোনো কর্ম বা ফল থাকে না, তাই ওই অবস্থা হতে আর প্রত্যাহৃত হতে হয় না। তাই যোগীর একমাত্র চেষ্টা হোলো প্রাণকে স্থির করা, বাহ্য কোনো সাধনা তার প্রয়োজন হয় না। একারণেই যোগিরাজ বলেছেন উত্তম নৌকায় চড়ে যেমন উত্তাল বিশাল নদীকে অনায়াসে অতিক্রম করা যায়, তেমনি ক্রিয়াস্বরূপ নৌকায় আরোহণ করতে পারলে প্রাণের এই অনন্ত প্রবাহকে অতিক্রম করা যায় এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই সকলেরই উচিত এই ক্রিয়া-স্বরূপ নৌকায় আরোহণ করা। অর্থাৎ মানুষ যদি প্রতিদিন এই আত্মক্রিয়া নিয়মিত উত্তম প্রকারে গুরুপনির্দেশে করতে থাকে তবে সে অনায়াসে এই জীবনেই জীবন-নদীর পরপারে অবশ্যই যেতে পারে। তাই যোগিরাজ বলেছেন পূর্বে কৃত যে কর্ম তা দৈব এবং বর্তমানে যে কর্ম তা পুরুষকার। দৈব ও পুরুষকার জনিত যে ক্লেশ তা নিবারণের জন্য গুরুপদেশানুসারে সকলেরই ক্রিয়ায় মনোনিবেশ করা উচিত। এর এক বিজ্ঞান-সম্মত হিসাব দিয়ে তিনি বলেছেন যে যোগী একাসনে বসে ১৭২৮ বার উত্তম প্রাণায়াম করতে পারেন তিনি তখন যা কিছু কামনা করেন তা সিদ্ধ হয়। ক্রিয়া করলেই সিদ্ধি হয় ও শান্তিপদ পাওয়া যায়। প্রথম ক্রিয়ায় যে পাঁচটি অঙ্গের কথা পূর্বে বলা হয়েছে তার মধ্যে প্রাণায়ামরূপ অঙ্গ হোলো ভাত অর্থাৎ প্রধান এবং বাকী অঙ্গগুলো ডাল-তরকারীর মত। কেবল ভাত যেমন খাওয়া যায় না তেমনি ক্রিয়ার অন্যান্য অঙ্গগুলো না করে শুধুমাত্র প্রাণায়াম করা উচিত নয়, এতে শারীরিক ক্ষতি হতে পারে। পুষ্টি সাধন ও রসনার তৃপ্তির জন্য যেমন ডাল-তরকারী প্রয়োজন, তেমনি ক্রিয়ার বাকী অঙ্গগুলোও অবশ্যই প্রয়োজন। শারীরিক ক্ষতি হতে পারে এই কারণে যে দীর্ঘ সময় অন্তর্মুখী প্রাণায়াম করলে আপনাহতেই দেহাভ্যন্তরস্থ সকল বায়ু স্থির হয়। ক্রিয়ার অন্যান্য অঙ্গগুলোর দ্বারা বিশেষ প্রক্রিয়ায় সেই স্থির বায়ুকে পুনরায় চঞ্চল না করে শরীরের নড়া চড়া করা বা জাগতিক কর্ম করা উচিত নয়, তাহলে বায়ুর বিরুদ্ধাচারণ করা হয়। চঞ্চল বায়ুর দ্বারায় সব কর্ম সাধিত হয়। অতএব প্রথম ক্রিয়ার ওই পাঁচটি অঙ্গ-প্রত্যেকেরই যথাযথ করা উচিত। এর বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে

ওই পাঁচটি অঙ্গের কোন্ কর্মটি ক্রিয়াবানকে কতটা করতে হবে তা তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়ে গেছেন যাতে পরবর্তী সাধকদের ভুলভ্রান্তি না হয়। অতএব গুরুর উচিত পরবর্তী ভক্তদের যোগিরাজ নির্দিষ্ট ক্রিয়ার ওই পাঁচটি অঙ্গ যথাযথ প্রদান করা। তাই যোগিরাজের সমস্ত উপদেশের মধ্যে তাঁর সার কথা হোলো—ক্রিয়া কর এবং ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাকো। ক্রিয়া করলে সব পাওয়া যায়। তিনি আরো বলতেন—ক্রিয়াই আসল কর্ম, ক্রিয়া ব্যতীত এ জীবনের সব কর্মই অকর্ম।

"প্রাণকে ভালবাস, প্রাণেরই সেবা কর, প্রাণেরই উপাসনা কর, প্রাণেরই শরণাপন্ন হও। তাহা হইলেই জগতের প্রাণকে ভালবাসিতে পারিবে, সর্ব জীবে প্রেম আসিবে" ॥ ৯৪ ॥

সাধারণতঃ দুই প্রকারের মানুষ দেখা যায়—কেউ আস্তিক, কেউ নাস্তিক। যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, ঈশ্বর আছেন বলে স্বীকার করে, ঈশ্বরের মহিমা জানতে চায় তারা আস্তিক এবং যাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই, ঈশ্বরকে স্বীকার করে না তারা নাস্তিক। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর সম্বন্ধে তাদের সঠিক জ্ঞান না থাকায় তারা নাস্তিক বলে পরিচয় দেয়। ঈশ্বরে অজ্ঞানতাই নাস্তিকের কারণ। আবার যারা আস্তিক তাদেরও সকলের যে ঈশ্বর সম্বন্ধে সঠিক ধারণা আছে এমন বলা যায় না। আস্তিকের মধ্যে বেশীর ভাগই বিভিন্ন দেব-দেবীতে ঈশ্বর বোধ দেখা যায়। ঈশ্বর এবং ভগবান্ প্রায় একই কথা। ঈ=শক্তি, শ্বর=শ্বাস। শক্তিপূর্বক শ্বাস-প্রশ্বাসকে অন্তর্মুখীভাবে টানাফেলারূপ কর্ম করতে থাকলে যে স্থিরাবস্থার উদয় হয় তিনিই ঈশ্বর। ভগ=যোনি, বান=শ্বাস। শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ বানকে অন্তর্মুখীভাবে চালনা করতে করতে কূটস্থরূপী যোনিতে অবস্থান করায় যে স্থিরাবস্থার উদয় হয় এবং যখন ষড়ৈশ্বর্যের অতীতে অবস্থান হয় তাই ভগবান্। যদি দেব-দেবীরা সঠিক ঈশ্বর হতেন তবে তাঁরা ধ্যানমগ্ন কেন? তাঁরাও যখন ধ্যানমগ্ন তখন তাঁদের ওপরে কেউ একটা নিশ্চয় আছেন। এমনকি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই প্রধান তিন দেবতা তাঁরাও ধ্যানমগ্ন, অতএব তাঁদেরও ঊর্ধ্বে কেউ আছেন। তিনি হলেন প্রাণরূপী ঈশ্বর। এই প্রাণ কোথায় নেই? সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ—সবই প্রাণময়। এই প্রাণের উপাসনাই যোগীর ধর্ম এবং প্রাণের কর্মই যোগীর একমাত্র কর্ম। প্রাণ ও অপানের কর্ম এটাই ক্রিয়া এবং এটাই একমাত্র কর্ম; এই ক্রিয়াতেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। এই প্রাণকর্মই যখন একমাত্র কর্ম তখন এই প্রাণকর্ম ছাড়া আর সবই অকর্ম। সাধারণ লোকে এই অকর্ম করে কিন্তু ফল চায় কর্মের, তাই তারা সঠিক ফল (ব্রহ্মপদ) পায় না। এই প্রাণ যখন সর্বত্রে আছেন তখন আমার

দেহেও আছেন। তিনি এই দেহে আছেন বলে দেহ নড়াচড়া করে, সব কর্ম করে, ইন্দ্রিয় রিপু সবই কর্মক্ষম থাকে, দেহ বেঁচে থাকে। তিনি নেই তো কেউ নেই। অতএব তিনি সর্বময় কর্তা। তিনি যখন এই দেহকে লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করেন তখন সকল দেব-দেবী মিলিত হয়ে চেষ্টা করলে ক্ষণকাল মাত্রও তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারেন না, কারণ তাঁর চেয়ে শক্তিশালী এবং তাঁর ওপরে আর কেউ নেই। দেহের পতনে তাঁর নাশ হয় না, তিনি অবিনাশী। সাধারণ মানুষ ভাবে দেহের সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়। তাই তারা দেহের পরিচর্য্যায় সদা ব্যস্ত। কেউ অন্নহীনকে অন্ন দেয়, কেউ দুঃখী রোগীর সেবা করে ইত্যাদি নানাপ্রকারে সকলেই এই দেহের সেবায় ব্যস্ত। তারা একবারও ভাবে না যে এই দেহ তিনি নয় এবং এই দেহের সেবা করলে তাঁর সেবা করা হয় না। আস্তিকদের মধ্যেও বেশীরভাগই এইপ্রকার দেহসেবায় রত থাকে এবং মনে করে এই প্রকার সাধনার মাধ্যমে তারা প্রাণরূপী ঈশ্বরকে লাভ করবে; কিন্তু তা কখনই সম্ভব নয়। এই প্রকার দেব-দেবী সেবা বা দেহসেবার মাধ্যমে প্রাণকে ভালবাসা যায় না, লাভ করা যায় না। আবার যে ব্যক্তি নিজের প্রাণকে জানে না, সে কখনই প্রাণকে ভালবাসতে পারেনা। যে নিজের প্রাণকে ভালবাসতে পারেনি সে কখনই বিশ্বপ্রাণকে ভালবাসতে সমর্থ নয়। তাই যোগিরাজ বলছেন প্রথমে নিজের প্রাণকে জানো, ভালবাস, তবেই বিশ্বপ্রাণকে জানতে পারবে এবং ভালবাসতে পারবে। প্রথমে যদি নিজ প্রাণকে জানতে না পার তাহলে বিশ্বপ্রাণকে জানতে পারবে না। প্রথমে যদি নিজ প্রাণকে ভালবাসতে না পারো, বিশ্বপ্রাণকেও পারবে না। তোমার ভেতর যে প্রাণ ঘটাকাশরূপে অবস্থিত তিনিই মহাকাশরূপে সর্বত্রে বিরাজিত। ঘটাকাশকে জানলে তবেই মহাকাশকে জানা যায়, এর ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। তাই তিনি সকল মানুষকে আহ্বান করে বললেন প্রাণকে ভালবাস, প্রাণেরই সেবা করো, প্রাণেরই উপাসনা করো, প্রাণেরই শরণাপন্ন হও। যদি তা করতে পারো তবেই জগতের প্রাণকে ভালবাসতে পারবে, সর্বজীবে আপনা হতেই প্রেম আসবে, কারণ তখন তুমি সর্বত্রে সেই প্রাণকে দেখবে এবং জানতে পারবে যে প্রাণ ছাড়া আর কিছু নেই। এই প্রাণই সকল প্রেমের উৎসস্থল, তিনিই সকলের পতি, তাই তিনি বিশ্বপতি, তাঁরই প্রতি প্রেম কর। কিন্তু এই প্রাণের সেবা করবে কেমন করে? বাহ্য কোনো বস্তু বা উপকরণের দ্বারা এই প্রাণের সেবা সম্ভব নয়। এমন কি বর্তমান যে চঞ্চল মন বুদ্ধি বিবেক ইত্যাদি তাদের দ্বারাও সম্ভব নয়। প্রাণের সেবা প্রাণের দ্বারাতেই করতে হবে; যেহেতু প্রাণ বর্তমান দেহে চঞ্চল তাই প্রাণের বর্তমান এই চঞ্চলতাকে ধরেই প্রাণের সেবা করতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাসই হল চঞ্চল প্রাণের বহিঃপ্রকাশ। এই বহিঃপ্রকাশকে

গুরুপদিষ্ট উপায়রূপ যোগ কৌশলের দ্বারা এই প্রাণের সেবা করা সম্ভব। আর এই সেবাই হল ক্রিয়া। তাই তিনি সকলকে বলতেন এই ক্রিয়ারূপ কৌশলই হল প্রাণের সেবা, প্রাণকে ভালবাসা এবং প্রাণকে লাভ করবার শ্রেষ্ঠ উপায়। এই প্রাণই তুমি এবং তুমিই প্রাণ, অতএব তুমিই অবিনাশী। এই প্রকারে নিজেকে জানাই ব্রহ্মজ্ঞান, যে জ্ঞান সকলের লাভ করা উচিত এবং চেষ্টা করলে সকলেই এই জ্ঞান অনায়াসে লাভ করতে পারে এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই তোমাদের বলছি ক্রিয়ারূপ সুন্দর নৌকায় আরোহণ করে চঞ্চল প্রাণের বৈতরণী পার হও, এটাই তোমাদের একমাত্র কাজ।

দুখ দুসরেখা দেখ কর দয়া কর হৃদয়,
তবই পায়গে চৈতন্যরূপ জস চন্দ্রোদয়।
আপনে সামর্থ কোশিশ করো হোমত নিঠুর,
পরমাত্মা সন্তুষ্ট হুয়েসে মন হোত মধুর।
তরজাও আপ অমরপদ ওঁহা করো বাসা,
চলো রাহ সদ্‌গুরুকা করো ওহি উপদেশা॥

এই ক্রিয়া করতে থাকলে যখন হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয় তখন কঠিন দরজা খুলে যাওয়ায় সমস্ত অজ্ঞান দূরীভূত হয়। অতএব ক্রিয়ারূপ কৌশলযুক্ত চাবিকাঠি দ্বারা আপন আপন হৃদয় মন্দিরের প্রধান ফটক খুলে ফেলো তাহলেই সত্যকারের পরের দুঃখ অনুভব করবে এবং তোমার হৃদয় সেই দুঃখে গলে যাবে এবং জীবের সেই অনন্ত দুঃখ নাশের জন্য সচেষ্ট হবে। এই পৃথিবীতে জীবের আসা যাওয়াটাই প্রকৃত দুঃখ, সেই দুঃখ লাঘবের জন্য তখন তুমি অধিকারী হবে এবং সচেষ্ট হবে। যদি তুমি সত্যই জীবের দুঃখ লাঘব করতে চাও তাহলে তোমার যে সামর্থ আছে তাকে কখন অবহেলা কোরো না অর্থাৎ নিজের চেষ্টার দ্বারায় গুরুপদেশরূপ ক্রিয়া কৌশলের দ্বারায় প্রথমে নিজের দুঃখকে নাশ কর, নিজের প্রাণকে জান, তাহলে জগতের প্রাণকে আপনাহতেই জানতে পারবে এবং প্রাণের অনন্ত চঞ্চলতার গতিকে কেমন করে রুদ্ধ করতে হয় তার পথ দেখাতে পারবে। তখনই পরমাত্মা প্রকৃত সন্তুষ্ট হবেন এবং অমরপদে স্থায়ী স্থিতিলাভ করবে, যেখান থেকে আর তোমায় কখনো ফিরে আসতে হবে না। তাই তোমাদের মিনতি করে বলছি, কারণ তোমাদের দুঃখটা কোথায় তা আমি জেনেছি এবং সেই দুঃখ কেমন করে লাঘব করতে হয় তাও আমি জেনেছি; এসব জেনেশুনেই বলছি এই পাগলা মাতালের কথাটা শোনো, ক্রিয়া কর এবং ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাক, এটাই তোমাদের একমাত্র কাজ হোক, তোমাদের অনন্ত চলার পথ থেমে যাক, তোমরা শান্ত হও, স্থির হও।

"প্রাণ প্রাণ ক'রে হ'লাম খুন প্রাণ যেখানকার
সেখানেতো গেলোনা স্থিরভাবে স্থির হই এ মনতো
এখন স্থির হলো না, লেগে থাক হরিপদে হবে অবশ্য
তাঁহার করুণা। জেনে শুনে তুমি হরি
বলিতে কখন আলস্য করো না" ॥ ৯৫ ॥

এটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি যে প্রাণই হলেন প্রকৃত ঈশ্বর, এই ঈশ্বর আমার ভেতরে আছেন, তোমার ভেতরে আছেন, সবার ভেতরে আছেন। সেই প্রাণকে জানার জন্য সকলেই ব্যস্ত কিন্তু কিছুতেই আর সেই প্রাণকে জানা যাচ্ছে না এটাই বড় আশ্চর্য। যে প্রাণ না থাকলে কিছুই থাকে না আবার সেই প্রাণই প্রকৃত আমি অথচ সেই প্রাণকে জানতে পারছি না এর চেয়ে আর দুঃখ কি হতে পারে? পাছে প্রাণ চলে যায় এই ভয়ে সর্বদাই ভীত, প্রাণকে রক্ষা করবার জন্য কত না সচেষ্ট, তবুও প্রাণ থাকে না, প্রাণকে জানা যায় না। প্রাণের এই যে চঞ্চলতা এই চঞ্চলতাই স্থির প্রাণকে জানতে দেয় না, তাই যেখানকার প্রাণ সেখানে যায় না, স্থির ঘরে থাকে না। যতক্ষণ স্থির ঘরে না থাকে ততক্ষণ সুখ কোথায়? প্রাণ চঞ্চল বলেই মনও চঞ্চল, তাই মন কিছুতেই স্থির হয় না। মনকে স্থির করার জন্য কত না চেষ্টা করি কিন্তু কিছুতেই স্থির হতে চায় না। তাই আমার এখন একমাত্র কাজ হল যত পারি অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম করি। এই প্রাণকর্ম করাই হল প্রকৃত পক্ষে হরিপদে লেগে থাকা। এটা যখন বুঝতে পারলাম যে এইভাবে হরিপদে লেগে থাকাটাই জীবনের একমাত্র কাজ তখন আর বৃথা আলস্য করে সময় নষ্ট না করে করতে থাকি, তাহলে প্রাণ সন্তুষ্ট হবেন এবং তাঁর করুণা অবশ্যই পাব। প্রাণের স্থিরাবস্থাটাই তাঁর করুণা, স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁর করুণা পাওয়া যায় না। অতএব জাগতিক জীবনে কি পেলাম, কি পেলাম না, সেদিকে অনেক দৃষ্টি করেছি, আর সেদিকে দৃষ্টি না করে এই প্রাণকর্ম করে যাই, তাহলে সব পাব। জাগতিক জীবনটা যতই রমণীয় হোক না কেন বাস্তবিক পক্ষে কিছুই নয় কারণ অনিত্য। এবার অনিত্যের মায়া কাটিয়ে সর্বদার জন্য প্রাণকর্মে রত থাকি, যত পারি ক্রিয়া করি।

"অনন্ত গুণ সম্পন্ন যে নারায়ণ উত্তম পুরুষ, যাঁহার মূর্ত্তি তোমার আমার সকলের মধ্যে আছেন তাঁহাকে জানিলেই সত্য নারায়ণ নতুবা মিথ্যা নারায়ণ" ॥ ৯৬

আমরা ঘরে ঘরে নারায়ণ পূজা করি, সত্য নারায়ণ পূজা করি এবং বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্ত্তি পূজা করি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সত্য নারায়ণ যে কি তা অনেকের জানা নেই অথবা সঠিক জ্ঞান নেই। আমরা এইভাবে উপাস্য দেব-দেবীর মূর্ত্তি পূজা করি বলেই পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা ভারতীয়দের মূর্ত্তি পূজক বা পুতুল পূজক বলে থাকে। আসলে ভারতীয় বেদান্তবাদীদের সম্বন্ধে তাদের সঠিক জ্ঞান না থাকায় তারা একথা বলে। ভারতীয়রা মূলত বেদান্তবাদী বা বৈদান্তিক। তাই ভারতীয়দের মূল উপাস্য ঈশ্বর হলেন আত্মা এবং আত্মজ্ঞানই বৈদান্তিকের প্রধান জ্ঞান, দেব-দেবী জ্ঞান নয়। বেদান্ত প্রতিপাদ্য এই আত্মজ্ঞানের সঙ্গে দেব-দেবী জ্ঞানের বিশেষ সম্পর্ক নেই ; এমন কি দেব-দেবী জ্ঞান বৈদান্তিকের কাছে তুচ্ছ। ভারতীয় ঋষিগণ প্রায় সকলেই বৈদান্তিক ছিলেন এবং তাঁরা সকলকে আত্মানুসন্ধানের উপদেশ দিয়েছেন। পরবর্তী কালে কাল প্রভাবে দুষ্ট ক্ষীয়মান মানুষ উচ্চকোটীর এই আত্মসাধন সঠিক ভাবে করতে না পারায় এবং আত্মজ্ঞান সম্পন্ন উপযুক্ত যোগী গুরুর অভাবে বহু সাধক নিম্নতর সাধনে আকৃষ্ট হয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে মাতা পিতা সখা ইত্যাদি ভাবে সম্পর্ক পাতিয়ে সাধনে ব্রতী হোলো। এর জন্য বৈদান্তিক ঋষিদের দায়ী করা যায় না। দায়ী পরবর্তী সাধকগণ যারা ঋষিদের উচ্চ আদর্শগুলিকে উপযুক্ত মর্যাদায় বজায় রাখতে পারে নি। পরবর্তী এই সব সাধকগণের প্রভাব ভারতীয় সমাজে কিছু কম ছিল না। তাই এইসব সাধকদের নির্দেশিত পথে বহু মানুষ আকৃষ্ট হয়ে মূর্ত্তি পূজায় ব্রতী হয়। এইসব সাধকগণ দেখে ছিলেন যে চূড়ান্ত আত্মজ্ঞান লাভ করা যেমন তাঁদের পক্ষেও সম্ভব হয়নি তেমনি অগণিত সাধারণ মানুষও পারবে না। তাই তাঁরা সাধনার ধারাকে কিছুটা নিম্নাভিমুখী করে সকলে যাতে ঈশ্বরে আকৃষ্ট হয় তার উপায় নিরূপনের জন্যই এইসব মূর্ত্তি পূজা, নানান তীর্থ ইত্যাদির প্রবর্তন করেন। কিন্তু তাঁরা ভালভাবেই জানতেন যে এইসব সাধনের কোনোটাই চূড়ান্ত নয়, চূড়ান্ত হল আত্মজ্ঞান, আত্মার সঙ্গে মিশে যাওয়া। আত্মা বা ব্রহ্মের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার না হওয়া পর্যন্ত মনুষ্য জীবন সফল হয় না, তাই তাঁরা চূড়ান্ত সত্য অদ্বৈতের কথা বলতে ভোলেন নি। পরবর্তী মানুষ ঋষি প্রদর্শিত এই চূড়ান্ত আত্মজ্ঞানের ধারাকে বজায় রাখতে পারল না। ম্রিয়মান মানুষের এই ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য এবং চূড়ান্ত আত্মজ্ঞানের দিকে প্রবল বেগে আকৃষ্ট করার জন্য আর্বিভূত

হলেন মহাপুরুষ পুরুষোত্তম যোগিশ্রেষ্ঠ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়। তিনি মানুষকে মুক্ত কণ্ঠে শোনালেন যে বিভিন্ন দেব-দেবী জ্ঞানের ঊর্ধ্বে যে চূড়ান্ত আত্মজ্ঞান তা তোমাদের লাভ করতে হবে এবং এটাই তোমাদের মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। দেব-দেবী জ্ঞান সামান্য জ্ঞান, আত্মজ্ঞান চূড়ান্ত জ্ঞান। যোগধর্ম ব্যতীত আত্মজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। কিন্তু যোগধর্মের প্রতি দীর্ঘকালের অপপ্রচারে তোমরা ভীত হয়ে পড়েছ, কারণ সঠিক উন্নত ও সহজ যোগধর্মের কথা তোমাদের সামনে সুদীর্ঘ কাল তুলে ধরা হয় নি, বরং এই পথে নানা প্রকার অনিষ্ট হতে পারে একথাই তোমাদের সামনে পরিবেশিত হয়েছে। এতে তোমাদের কোনো দোষ নেই, তোমরা যোগের প্রতি বিরুদ্ধ কথা শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছ। তাই বলছি কোনো ব্যক্তিতে ব্যক্তিগুণ থাকায় তাকে মূর্তি বল। এই যে কৃষ্ণের মূর্তি বা কোনো দেব-দেবীর মূর্তি পূজা কর, সেই কৃষ্ণতে যে বিশেষ গুণ আছে, তাঁর মূর্তি যা পূজা করছ, তাতে ওই বিশেষ গুণ থাকা দূরে থাক, সামান্য যে সত্ত্ব রজ তম তাও নেই। বিশেষ গুণ অর্থাৎ সর্বব্যাপী অনন্ত গুণসম্পন্ন যে নারায়ণ উত্তম পুরুষ, যাঁর মূর্তি তোমার আমার সবার ভেতর আছেন তাঁকে জানাটাই সত্যনারায়ণ নতুবা মিথ্যানারায়ণ। এই সত্যনারায়ণই হলেন আত্মা এবং সেই জ্ঞানই হল আত্মজ্ঞান। এই জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি কোথায়? যতক্ষণ মূর্তির মধ্যে সত্যস্বরূপ অনন্ত নারায়ণকে খোঁজো ততক্ষণ আত্মজ্ঞান বহু দূরে। তাঁকে খুঁজতে হবে তোমার নিজের ভেতর এবং নিজের ভেতর যখন তাঁকে জানতে পারবে তখন তুমি অনন্ত এবং সত্য নারায়ণকে জানতে পারবে, আর যদি ওই মূর্তির ভেতর খোঁজো তবে মিথ্যা নারায়ণকে পাবে। মীরাবাই সে কথাই বলেছেন—'পাথর পূজে সে হরি মিলে তো ম্যায় পূজি পাহাড় ··'। অনন্ত নারায়ণ সর্বত্র বিরাজিত হওয়ায় ওই মূর্তির ভেতরেও আছেন সত্য কিন্তু যদি তুমি তাঁকে বাইরের দিক্ থেকে খুঁজতে থাক তাহলে তাঁকে তুমি পাবে না, কারণ তোমারও তখন বাইরে থাকা হোলো। তিনি সর্বত্রে থাকায় তোমার ভেতরেও তিনি আছেন যা তোমার সবচেয়ে নিকটে। তোমার ভেতরে সেই সত্যনারায়ণ থাকায় তুমিই সত্যনারায়ণ হলে, অতএব তুমি নিজেই যখন সত্যনারায়ণ তখন নিজের মধ্যে থেকে খোঁজা শুরু করাটা উচিত, বাইরে খোঁজার প্রয়োজন নেই। যখন নিজের ভেতর সত্যনারায়ণকে পাবে তখন তুমি নিজেই সত্যনারায়ণ হবে এবং জগতের সব বস্তুতে সত্যনারায়ণকে জানতে পারবে, কারণ তোমার ভেতরে যিনি সর্বত্রে তিনিই বর্তমান।

"যে ব্যক্তি নিশ্চিতরূপে সর্বদাই ক্রিয়া সাধনে রত রহিয়াছে আর যে বুদ্ধি সর্বদাই ব্রহ্মে রহিয়াছে, সে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতেছে, ইহার অন্যথা হয় না। অতএব ক্রিয়া না করিলে যখন ওই অবস্থার অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার উৎপত্তি হয় না, যা একমাত্র কাম্য, তখন সকলেরই ক্রিয়া করা কর্তব্য" ॥ ৯৭ ॥

এই দেহে প্রাণ যতক্ষণ চঞ্চল ততক্ষণ মনও চঞ্চল। সেই চঞ্চল মন সব কিছু কর্ম করায়। সেই মন যত পায় তত চায়, ওর চাওয়ার শেষ নেই। এটাই হোলো প্রবৃত্তি। এই ভাবে সে জীবকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। সে নিজেও স্থির হয় না, জীবকেও স্থির হতে দেয় না, অথচ স্থির না হওয়া পর্যন্ত জীবের জীবত্ব নাশ হয় না, ব্রহ্ম লাভ হয় না। প্রাণের স্থিরাবস্থাটাই ক্রিয়ার পরাবস্থা ; এই ক্রিয়ার পরাবস্থাই জীবের একমাত্র কাম্য। পূর্ব সংস্কার বশতঃ অথবা গুরু কৃপা বশতঃ জীবের যখন এই ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভের আকাঙ্খা জাগে তখনই জীব এ জগতের সবকিছু হতে মায়া কাটিয়ে, কামিনী কাঞ্চন আসক্তি এমন কি নিজ দেহের প্রতি নিরাসক্ত হয়ে আত্মক্রিয়ায় রত হয়। তখন সে বুঝতে পারে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কাছে অন্ন যতখানি প্রয়োজন, এই প্রকার মুমুক্ষু ব্যক্তির কাছেও ক্রিয়া ততখানি প্রয়োজন। এরকম ব্যক্তি তখন ক্রিয়াকেই জীবনের ধ্যান-জ্ঞানরূপে গ্রহণ করে। সে তখন পরিষ্কার বুঝতে পাবে যে ক্রিয়াই উদ্ধার কর্তা, মুক্তি দাতা এবং ক্রিয়ার পরাবস্থার একমাত্র কারক। তখন যোগী 'ক্রিয়া' ছাড়া আর কিছু জানে না, আর কিছু শুনতেও চায় না ; সে তখন ক্রিয়াতেই নিজেকে সমর্পণ করে। সম+অর্পণ অর্থাৎ সমানভাবে নিজেকে রাখা এটাই সমর্পণ। প্রাণ যতক্ষণ চঞ্চল ততক্ষণ অসমান কিন্তু যখন স্থির তখন সমান। এই সমান অবস্থায় অর্থাৎ স্থিরাবস্থায় সে তখন থাকে। স্থিরাবস্থা লাভের পূর্বে যতই সমর্পণ করার চেষ্টা কর তা কখনই হয় না। ভাত খেলে ক্ষুধার নিবৃত্তির যে আনন্দ তা নিজেই জানা যায়, অপরের কাছে জিজ্ঞাসা কবার দরকার হয় না, তেমনি ক্রিয়া করলে যে সমতা লাভ হয়, ক্রিয়ার পরাবস্থা হয় তা নিজেই জানা যায়। কোনো কিছু দেখা তাও প্রবৃত্তি। যেমন কৃষ্ণ অথবা কোন দেব-দেবীকে দেখছ তাও প্রবৃত্তি। ক্রিয়া করতে করতে যতক্ষণ এই প্রকারে আত্মজ্যোতি দেখা, কৃষ্ণ কালী শিব দুর্গা ইত্যাদি দেখাদেখি যতক্ষণ থাকে ততক্ষণও প্রবৃত্তি বর্তমান। প্রবৃত্তি আছে বলেই দেখাদেখি। প্র+বৃত্তি—প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রকৃষ্ট ভাবে যতক্ষণ কোনো না কোনো বৃত্তি থাকে ততক্ষণ প্রবৃত্তি। কিন্তু এই আত্মক্রিয়া করতে করতে যখন সম্পূর্ণরূপে নিশ্চল হয়ে শূন্যব্রহ্মে অবস্থান হয় তখন নিবৃত্তি অর্থাৎ নাই বৃত্তি, বৃত্তি শূন্য অবস্থা। তাই চলার নাম সংসার। প্রাণের এই

যে অনন্ত গতি এই গতিটাই সংসার। এই গতি আছে বলে জন্ম-মৃত্যু আসা-যাওয়া। কিন্তু আত্মক্রিয়া করতে করতে যখন অগতি অর্থাৎ নিশ্চল তখন আব আসা-যাওয়া নেই, সংসার নেই, কৃষ্ণ কালী শিব দুর্গা আত্মজ্যোতি কোনো কিছুই দেখাদেখি নেই, সে এক আশ্চর্য্যবৎ অবস্থা। ক্রিয়ার এই স্থিরাবস্থাই প্রকৃত জ্ঞান, সবকিছুর উৎপত্তি স্থল, সবকিছুর লয়স্থল, চিরশান্তি বিবাজিত কাবণ সেখানে কিছু নেই। ক্রিয়ার এই প্রকার পরাবস্থা লাভের পূর্বে চলার দিকে প্রবৃত্তি থাকায় তাকেই সত্য বলে মনে হয়। এই অনন্ত চলাটি দীর্ঘকাল চলে আসছে তাই তাকে অনাদি মনে হয়; অথচ এই চলাটিও মিথ্যা। কিন্তু ক্রিয়াব পরাবস্থায় যখন আব চলা থাকে না তখন নিবৃত্তি অর্থাৎ বৃত্তি শূন্য। তাই ক্রিয়াব পবাবস্থায় আটকে থাকাকেই ধর্ম বলে এবং আটকে না থাকাকেই অধর্ম বলে। কারণ ক্রিয়াব পরাবস্থায় আটকে থাকলে কোনো প্রকার প্রবৃত্তি মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার রাগ দ্বেষ মোহ দেহবোধ কিছুই থাকে না, তখন সবই একভাব এবং সেই একভাব অবস্থাটাই ব্রহ্ম। যিনি এই অবস্থায় সর্বদা থাকেন তাঁরই শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা। এজন্য ক্রিয়ার পবাবস্থাকে সবের নাশক বা সবের হবণকর্তা হরি বলা হয়, কাবণ এই অবস্থায় পৌঁছতে পাবলে সবকিছু আপনা হতে হরণ হয়। ক্রিয়ার পরাবস্থায় আব কোনো কিছুরই উৎপত্তি হয় না, তখন একভাবে থাকায়, সমতাতে থাকায় কোনো দিকে মন যায় না, আব অন্যদিকে মন না যাওয়ায় পুনরায় জন্ম হয় না। জন্ম অর্থাৎ ক্রিয়াব পরাবস্থা ব্যতীত অন্যদিকে মন দিয়ে তাতে স্থিতি। যখন অন্যদিকে মন তখন ক্রিয়ার পবাবস্থার অভাব হওয়ায় জন্ম-মৃত্যু এবং সুখ-দুঃখ অবশ্যই থাকে। ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভের পূর্বে চঞ্চলতারূপ যে অসৎ বর্তমান ছিল, ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভের পর যখন সেই অসৎ আর থাকলো না তখনই সৎ। যখন একমাত্র এই সৎ বর্তমান তখন দুই নেই অর্থাৎ দুই না থাকায় সবই এক। যেখানে দুই সেখানে ঈশ্বর নেই। ঈশ্ববকে দেখা তাও দুই, ঈশ্বরকে জানা তাও দুই, এই দুই যতক্ষণ বর্তমান ততক্ষণ সুখ-দুঃখ। কারণ যখন ঈশ্বরকে দেখছি তখন সুখ কিন্তু যখন দেখছি না তখন দুঃখ উদিত হয়। একারণে সমতা বজায় থাকে না। কারণ কখনও দেখছি, কখনও দেখছি না, এই দুই থাকায় সুখ দুঃখ; অতএব এ অবস্থায় ঈশ্বর নেই। তাই যে ব্যক্তি সর্বদাই আত্মক্রিয়ায় রত হয়ে মন বুদ্ধি ইত্যাদি সকলকে স্থির করে ব্রহ্মে যুক্ত হয়ে ক্রিয়ার পরাবস্থায় অবস্থিত তিনিই প্রাজ্ঞ। ক্রিয়া না করলে যখন এই চিরসুন্দর, চিরস্থির ক্রিয়ার পরাবস্থাকে লাভ করা যায় না তখন সকলেরই এই ক্রিয়া করা অবশ্য কর্তব্য এবং এটাই একমাত্র কাম্য। অতএব হে জগৎবাসী তোমাদের দুঃখে বড় কাতর হয়ে, জোড়হাত করে, মিনতি করে প্রতিজ্ঞা করে বলছি- তোমরা অন্য সকল দিক্ থেকে মনকে ঘোরাও এবং এই

আত্মক্রিয়া কর, তাহলে তোমাদের মঙ্গল নিশ্চয় হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভের পূর্বে যে অন্যদিকে মন, যাকে দ্বৈত বলে, আমি তাও জেনেছি এবং ক্রিয়ার পরাবস্থায় যখন আর অন্যদিকে মন নেই, কেবল একভাব হওয়ায় অদ্বৈত তাও জেনেছি। এই উভয় দিককে সম্পূর্ণরূপে জেনে শুনে তোমাদের বলছি দ্বৈতই মহাদুঃখের মূল, অতএব তোমরা সদাই ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাক এটাই তোমাদের একমাত্র কাম্য হোক।

"পৃথিবীর বস্তু দেখিতে উত্তম কিন্তু ভিতরে বিষের তুল্য, উপরে উপরে দেখিলেই মন আকৃষ্ট করে আর ভিতরে দেখিলেই ত্যাগ হয়, ইহাই মায়া, ইহা চঞ্চলতার প্রকাশ" ॥ ৯৮ ॥

কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য কামিনী কাঞ্চন সংসার ইত্যাদি সহ জগতের সকল বস্তু মনকে আকৃষ্ট করে, এগুলি সবই উত্তম বলে মনে হয়। জীব ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে প্রাণ চঞ্চল হয় এবং যতক্ষণ জীব জীবিত থাকে ততক্ষণ প্রাণও চঞ্চল থাকে। প্রাণের এই চঞ্চলতা হতে যেমন তোমার আমার উৎপত্তি, তেমনি এই জগতের উৎপত্তি। অতএব এই জগতের উৎপত্তিস্থল যেমন ওই চঞ্চল প্রাণ, তেমনি তুমি এবং তোমার মন বুদ্ধি ইত্যাদিরও উৎপত্তিস্থল ওই চঞ্চল প্রাণ। অতএব জগৎ, আমি এবং আমি বোধ এসবই যখন চঞ্চল প্রাণ হতে জাত তখন সবই চঞ্চল প্রাণে অবস্থিত। এই প্রকারে চঞ্চল প্রাণে সর্বদা থাকায় চঞ্চল প্রাণের লীলা খেলাকেই জানা যায়, স্থির প্রাণকে জানা যায় না। স্থির প্রাণকে জানতে হলে প্রাণের এই বর্তমান চঞ্চল অবস্থার অবসান প্রয়োজন। জীব সদাই চঞ্চলতায় থাকায় স্থির প্রাণ থেকে অযুক্ত থাকতে বাধ্য হয়। আবার স্থির প্রাণকে না জানা পর্যন্ত সঠিক প্রাণকে জানা যায় না কারণ প্রাণের ওই স্থিরাবস্থাই সবকিছু এমনকি প্রাণের ওই চঞ্চলতারও উৎসস্থল। তাই স্থিরাবস্থারূপ সেই উৎসস্থলকে জানাই মনুষ্য জীবনের একমাত্র কাম্য এবং এটাই যোগীর গন্তব্য স্থল।

যেহেতু জীব চঞ্চলতায় আবদ্ধ এবং এ জগতের সবকিছু সেই একই চঞ্চলতায় গ্রথিত, তাই জীব চঞ্চলতার মোহে আকৃষ্ট হয়ে জগতের ভোগকে জীবনের পরম লাভ মনে করে। এই প্রকারে জীব জন্ম জন্মান্তর ধরে চঞ্চলতার আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকে। এই যে চঞ্চলতা বা চলা তাই সংসার, সেই সংসারে জীব মোহিত হতে বাধ্য হয়। কিছুতেই সে আর চঞ্চলতার অতীতে যেতে পারে না। এই চঞ্চলতাই মায়া, সেই মায়া তাকে ঘিরে থাকে। এটাই তার বন্ধন অবস্থা। কাল প্রভাবে

জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতি বশতঃ যখন জীব তার এই বন্ধন অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে এবং কেমন করে এই বন্ধন অবস্থার অর্থাৎ এই চঞ্চলতার অতীতে যাওয়া যায় এই অনুপ্রেরণা যখন জাগে তখনই তার সদ্‌গুরু লাভ হয় এবং সেই সদ্‌গুরু দেখিয়ে দেন কেমন করে জন্ম জন্মান্তরের চঞ্চলতার অতীতে যাওয়া যায়। এই কর্মই হল ক্রিয়া। জীব তখন সবকিছু ভুলে গিয়ে এই ক্রিয়ায় মনোনিবেশ করে এবং অচিরে সমস্ত চঞ্চলতার অতীতে ক্রিয়ার পরাবস্থায় কূটস্থ ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করে। তখন তার মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার ইত্যাদি কিছুই আর জগতের দিকে আকৃষ্ট হয় না, কারণ এরা তখন আর কেউ থাকে না। যখন এরা আর কেউ নেই তখন আমি একা, এই একা আমিই সত্য আমি, নিশ্চল আমি, তখন সবই আমিময়। এই আমিই ব্রহ্ম, আমি ছাড়া আর কেউ নেই।

অহেতুকী আনন্দে
সৃষ্টি করি আমি,
সৃষ্টির অনিত্য ছন্দে
নিজে আমি ভ্রমি।
মোহেতে দেখায় দেহ
দেহ আমি নয়,
এক আমি বহু আমি
অব্যক্ত অব্যয়।
কর্মফল ধরে দেহ
আমি নির্বিকার,
এদেহ থাক যাক
কি হবে আমার।
আমি ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডে
কিছু নাই আর,
আমিই আমার দেব
ধ্বংস নাহি যার।
আমি নিত্য, আমি সত্য
আমি চির সুন্দর,
আমার আমিকে হেরি
সমাধিস্থ শঙ্কর।
তুরীয় আনন্দ আমি

আমি নিরাকার,
এ হেন আমার আমি
করি নমস্কার ॥

"বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা বা ক্রিয়ার পর অবস্থা এবং অবিদ্যা অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্যতীত অন্য সমস্ত অর্থাৎ অন্য দিকে মন" ॥ ৯৯ ॥

অনেক লেখাপড়া শেখাকে বিদ্যা বলে, আবার জগতের যে কোনো বস্তু বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানাকেও বিদ্যা বলে। এইসব বিদ্যার দ্বারা জাগতিক সবকিছু জানা যেতে পারে কিন্তু নিজেকে জানা যায় না। নিজেকে জানাটাই ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মবিদ্যা এবং সকল বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যদি কেউ বলে কৃষ্ণকে জেনেছি, কালীকে জেনেছি, তবে তার কৃষ্ণকে জানা হল, কালীকে জানা হল, কিন্তু নিজেকে জানা হল না। আর যতক্ষণ নিজেকে জানা না হয় ততক্ষণ ব্রহ্মকে জানা হল না বা ব্রহ্মবিদ্যা হল না। ব্রহ্মকে জানাই শেষ জানা, ব্রহ্মজ্ঞানই শেষ জ্ঞান বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এই জ্ঞান বা এই বিদ্যা ক্রিয়ার পরাবস্থায় হয় যখন প্রাণের চঞ্চলতার পুরোপুরি অবসান। ক্রিয়ার পরাবস্থায় পৌঁছবার একমাত্র উপায় এই ক্রিয়া, তাই এই ক্রিয়াকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা হয়, কারণ ক্রিয়াই ক্রিয়ার পরাবস্থার কারক। কারক ব্যতীত কারণকে লাভ করা যায় না, অতএব ক্রিয়া ব্যতীত ক্রিয়ার পরাবস্থাকে লাভ করা অসম্ভব। যতই তোমার পৃথিবীর বস্তুর জ্ঞান হোক, যতই তোমার দেব-দেবী জ্ঞান হোক ক্রিয়ার পরাবস্থার তুল্য কেউ নয়। ক্রিয়ার পরাবস্থায় না থাকার দরুনই এইসব জ্ঞান হয় কিন্তু যখন ক্রিয়ার পরাবস্থা তখন এসব জ্ঞান থাকে না, তখন সব মিলে মিশে একাকার। ক্রিয়ার পরাবস্থা উদিত হওয়ার সাথে সাথে সবই নিরবয়ব, মহাশূন্য। তাহলে ক্রিয়ার পরাবস্থায় না থাকাটাই অবিদ্যা অর্থাৎ প্রাণের চঞ্চল অবস্থায়, যা জীবের বর্তমান অস্তিত্ব, এতে থাকাটাই অবিদ্যা এবং এর অতীতে ক্রিয়ার পরাবস্থায় নিশ্চল ব্রহ্মে যুক্ত থাকাটাই বিদ্যা, এই বিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যা যা সকলের কাম্য। এই ক্রিয়ার পরাবস্থা ব্যতীত সংসারে আর কিছুই হিতকারী নয়। এই অবস্থাই অভয় পদ, বিভু, পবিত্র ও মহান্। এই অবস্থাই সকলের আদি তাই তিনি অনাদি। এই অবস্থাই হরিহর, সকল জীবের উৎপত্তিস্থল ও গন্তব্যস্থল। এই অবস্থায় সকলকেই যেতে হবে, তাই কালবিলম্ব না করে ক্রিয়াতে মনোনিবেশ কর এবং উত্তম ক্রিয়া করে যত সত্বর পার ক্রিয়ার পরাবস্থায় উপনীত হও, এটাই তোমাদের একমাত্র কাজ হোক।

"স্বয়ং ভগবান" ॥ ১০০ ॥

সাধক চান ভগবানকে দেখতে, তাঁর সঙ্গে লীলা ও রসাস্বাদন করতে। কিন্তু যোগী চান নিজেই ভগবান্ হতে। যেমন নদী চায় তার উৎসস্থলরূপ সমুদ্রকে জানতে, কিন্তু যখন সমুদ্রে গিয়ে মেলে তখন সে নিজেই সমুদ্র হয়ে যায়, তার আর সমুদ্রকে জানা হয় না। যোগীও তেমনি নিশ্চল ব্রহ্মকে জানবার চেষ্টা করেন, কিন্তু যখন তিনি ব্রহ্মে উপনীত হন তখন তিনি নিজেই ব্রহ্ম হয়ে যান, জানা আর হয় না। এখানেই সমস্ত সাধনার শেষ হয়। নিশ্চল অনন্ত অপরিবর্তনীয় চিরশান্ত অবস্থাই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম কাকে বলে এ বিষয়ে যোগিরাজ বলেছেন—'শূন্যের ভেতর যে শূন্য তাই ব্রহ্ম'। এই মহাশূন্যরূপী ব্রহ্ম নিশ্চল—'নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্চতে'। সেই অনন্ত নিশ্চল ব্রহ্মের একাংশ চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ায় সেই চঞ্চলতা থেকেই এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং সবকিছুর উৎপত্তি হয়। তাই গীতা বলেছেন 'একাংশেন স্থিতো জগৎ'। অতএব সকলেরই বর্তমান অস্তিত্ব এই একাংশের চঞ্চলতা। এই চঞ্চলতাকেই প্রাণসত্তা বলে। সকল দেব-দেবীগণও এই চঞ্চতার অন্তর্গত, তাই তাঁরাও চেষ্টা করছেন এই চঞ্চলতার অতীতে যাওয়ার জন্য। এ কারণেই শাস্ত্রকার বলেছেন, যে পদকে পাওয়ার জন্য সকল দেব-দেবী দীনভাবে অপেক্ষা করেন, ধীর যোগিগণ সেই পদকে সহজে লাভ করে হর্ষ প্রাপ্ত হন না। অর্থাৎ যোগী সুকৌশলরূপ যোগক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাণের জন্ম জন্মান্তরের অনন্ত চঞ্চলতাকে অতিক্রম করে স্থির ব্রহ্মে মিলে যান, লয় হয়ে যান। যোগী তখন সমস্ত প্রকার দ্বৈত সত্তার অবলুপ্তি ঘটিয়ে 'আমি'হারা অবস্থায় নিজেই ব্রহ্ম হয়ে যান। এই অবস্থাটাই যোগ সাধনার শেষ কথা বা শেষ অবস্থা কারণ এর পরে আর কিছু নেই। যোগিরাজও তাঁর দীর্ঘ সাতাশ বছরের সাধন জীবনে এই অবস্থাতেই পৌঁছতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই অবস্থাতে পৌঁছতে গিয়ে যে সমস্ত সাধনার স্তর বা অবস্থাগুলি অতিক্রম করেছেন সেসব সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা খুব অল্প কথায় প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বিভিন্নভাবে প্রায় সকল দেব-দেবীকে দেখেছেন, আত্মসূর্য দেখেছেন, পরিশেষে নিজেই সেই সব দেব-দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন, আত্মসূর্যে রূপান্তরিত হয়েছেন। তাঁর এই সব ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তাঁর জীবন কাহিনী "পুরাণ পুরুষ যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী" গ্রন্থে এবং এই গ্রন্থেও আলোচনা করা হয়েছে। সাধনার এক উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করে তিনি লিখেছেন—'অলখ নিরঞ্জনকা জব কমল বিকসিত হোয় তব আপহি আপ দেখে—ফির আপরূপি ভগবান হোনা বাঁকি হয়—তব গুরু সমান দাতা নহি মালুম হোয়'. প্রাণকর্ম করতে করতে যখন মূলাধার হতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত ষট্‌চক্ররূপী কমলদলগুলি বিকশিত হয়ে যখন অবিনাশী কূটস্থে নিশ্চল ভাবে অবস্থান হয় তখন নিরাকার,

নিরবয়ব, অমূল্য ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশিত হয় এবং তখন নিজেই নিজেকে দেখা যায়। এই অবস্থায় আরোহণ করে তিনি বলেছেন—'হমারেই রূপ সব জগই—হম ছোড়ায় কোই নহি, উহ রূপ হয় শূন্য মে। হমহি হম হয়। হমহি ব্রহ্ম সর্ব্ব ব্রহ্ম'। এ জগতের সবকিছুতেই আমার রূপ, আমি ছাড়া এ জগতে আর কিছু নেই, সবই আমিময়। এই সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎরূপ মহাশূন্যে অবস্থিত অর্থাৎ এই শূন্যের ভেতর যে মহাশূন্য তাতে অবস্থিত। এখন সবকিছুই ব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্ম। এখন আমাতেই আমি আছি। এই চিরগম্ভীর, চিরঅচঞ্চল অবস্থাই ভগবান্। যখন আমি আমার চঞ্চল অবস্থা হতে জাত যত প্রকার আমিবোধ ছিল তার অবলুপ্তি ঘটিয়ে যখন স্থির ব্রহ্মের মধ্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে, বেদান্ত মতে অদ্বৈতে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারলাম, যখন এক হয়ে গেলাম তখন আমিই স্বয়ং ভগবান্ হলাম। অর্থাৎ এখন আমি আর শ্যামাচরণ নই, স্বয়ংই ভগবান্ হলাম। যোগীর এই অবস্থার কথা বলতে গিয়ে গীতাতে শ্রীভগবান্ বলেছেন—'বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে· · · (গীতা ১৮/৫৩)। যোগী এই অবস্থায় 'আমি' 'আমার' ভাব শূন্যরূপ নির্মম হয়ে (মমত্ব শূন্য) শান্ত হন (প্রাণের স্থিরাবস্থারূপ সাম্যভাব) এবং ব্রহ্মই হয়ে যান অর্থাৎ স্থির ব্রহ্মে লয় হয়ে তাঁতেই মিশে যান ; আমাকে ব্রহ্মময়রূপে জেনে আমাতেই প্রবেশ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হয়ে আমি হয়ে যান। এ বিষয়ে বাজসনেয় উপনিষদের ১ম সূত্রে আছে 'ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"। তখন স্বয়ং ঈশ হন, সেই ঈশ ব্রহ্ম, সমুদয় জগৎ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় 'আমিও' ব্রহ্ম হয়ে যায়, তখন আর কিছু থাকে না। এই কিছু না থাকা অবস্থাই স্বয়ং ঈশ। যোগিরাজও এইপ্রকারে ব্রহ্ম হয়ে গেছেন। ব্রহ্ম যেমন শাশ্বত, চিরবিরাজমান এবং সর্বত্র অবস্থিত তেমনি যোগিরাজও শাশ্বত, চিরবিরাজমান এবং সর্বত্র অবস্থিত।

—: সমাপ্ত :—

অন্যান্য বই—

১। পুরাণ পুরুষ যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী।
(বাংলা—৩৬ টাকা, হিন্দী ও ইংরাজী)
সঙ্কলন—তৎপৌত্র শ্রীসত্যচরণ লাহিড়ী
গ্রন্থন—অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়

২। প্রাণময়ং জগৎ—পাঁচ টাকা
—অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়

৩। যোগিরাজ শ্যামাচরণ গ্রন্থাবলী (পাঁচ খণ্ড)
—অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

—প্রাপ্তিস্থান—

১। মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলি—১৩

২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলি—৬

৩। নাথ ব্রাদার্স
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলি—১৩

৪। দে বুক ষ্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলি—১৩

৫। গ্লোব লাইব্রেরী
২,শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলি—১৩

৬। জয়গুরু পুস্তকালয়
১২/১ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলি—১৩

৭। বিশ্বাস বুক ষ্টল
৪৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি—৯

৮। সর্বোদয় বুকষ্টল,
হাওড়া রেল ষ্টেশন।